প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৬৬

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯
প্রচ্ছদশিল্পী
গৌতম রায়
মুদ্রক
এন. গোস্বামী
নিউ নারায়ণী প্রেস
১/২ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন
কলকাতা ৭০০০১২

সব হাওয়ায় দরজা খোলে না।
কিন্তু এক-এক দিন একটা দমকা বাতাস এসে
বন্ধ ঘরের সব কটা জানলা-দরজা খুলে দিয়ে যায়।

—সু-বান্ধবী দেবযানী ও রাণাকে

It was a room on the outskirts of the town
with two windows open out onto the street.
Till then, it had seen nothing except
wretchedness and very ordinary episodes.

But the time came and one lovely evening
it did live its own historic moment.
Hereafter, the remainder of its life may fail
to experience any other significant event.

But every evening when the sun sets yonder
spreading over its window-panes,
its tepid atmosphere will remember
the two great lovers it once received.

—Nikos Kranidiotis
(Cyprus)



সূচীপত্র

আমাদের প্রকাশিত অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থ

ও হেনরীর গল্প

মমের শ্রেষ্ঠ গল্প

মপাসাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প

মপাসাঁর বাছাই গল্প

আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ গল্প

মোরাভিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প

তৃতীয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প

লরেন্সের সেরা প্রেমের গল্প

হিচকক নির্বাচিত এক ডজন

ক্রীতদাস / এরিক করডার

রেবেকা / দাফন দ্যু ম্যরিয়া

আনা কারেনিনা / লেভ তলস্তয়

স্বপ্ন নিয়ে / এরিথ মারিয়া রেমার্ক

ভ্যালি অফ দ্য ডলস / জ্যাকলিন সুশান

দ্য আইলাণ্ড অফ ডক্টর মোরো / এইচ. জি. ওয়েলস

সে এক রূপকথার দেশ। সেই আশ্চর্য দেশের এক অচিন পুরীতে স্বার্থপর এক দৈত্যের প্রহরায় সোনার কাঠির জাদুতে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে থাকে এক কুঁচবরণ রাজকন্যা, মেঘবরণ যার কেশ। তারপর একদিন দুধ-সাদা পক্ষীরাজে চেপে রাঙা ধুলোর মেঘ উড়িয়ে তেপান্তরের মাঠ, ঘুমতি নদী, ধূপছায়া গ্রাম আর ময়নামতির হাট পেরিয়ে আচমকা এসে হাজির হয় অচিন দেশের এক রাজকুমার—যার মাথায় উষ্ণীষ, হাতে খোলা তলোয়ার আর বুকে এক নিদারুণ তৃষ্ণা। সোনার কাঠি রুপোর কাঠি অদল-বদল করে কন্যার ঘুম ভাঙিয়ে দেয় সে। ঘুম ভেঙে শিউরে ওঠে রাজকুমারী, 'কে তুমি? কেন এলে এই জাদু-নগরে? তুমি কি জানো না কতো বিপদ ওত্ পেতে আছে এখানে? তুমি কি জানো না এতে জীবন-সংশয় হতে পারে তোমার?…জানে, যুবক তা সবই জানে। তবু যুগে যুগে রাজকুমাররা বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ছুটে আসে রাজকন্যাদের সন্ধানে। কিন্তু কেন? শুধু কি রোমাঞ্চের আকর্ষণে? অজেয়কে জয় করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায়? রাজকুমারীই বা কেন বরণ করে নেয় দুঃসাহসী সেই যুবককে? শুধু কি কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে? আর কিছু নয়? আর কিচ্ছু নয়?

আছে, আরও কিছু আছে। আছে এক আকুল আর্তি, আছে অন্তরঙ্গ এক সুনিবিড় বেদনাঘন আনন্দ—যার নাম প্রেম। পৃথিবীর প্রতিটি ভাষায় এমন কিছু কিছু শব্দ আছে যার অর্থ অভিধান দেখেও সঠিকভাবে সুস্পষ্ট হয় না। প্রেম বা ভালোবাসাকে অতি সহজেই এই পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। আসলে প্রেম এক আশ্চর্য অনুভূতি, মানুষের দেহ ও মনে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো আচমকা সাড়া জাগিয়ে যা অনায়াসে লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে কোনো সুপরিকল্পিত জীবনের সুবিন্যস্ত রূপরেখা। প্রেমকে কেউ বলেছেন 'লাইফ ফোর্স', কেউ বা বলেছেন 'সুস্থ মনের সাময়িক উন্মত্ততা'। কিন্তু সৃষ্টির সেই আদিম যুগ থেকে মানুষ চালিত হয়ে এসেছে এই সুতীব্র অনুভূতিটির প্রভাবে। প্রেম, কখনও স্বার্থপর, কখনও উদার—কখনও তা কাছে টানে, কখনও দূরে সরিয়ে দেয়। প্লেটো বলেছেন প্রেমের জন্ম দারিদ্র্যের গর্ভে, প্রাচুর্যের ঔরসে। আর খ্রীষ্টীয় পুরাণের মতে আদিম পাপে ঈশ্বরের অভিশাপে মানুষ যেদিন অমরত্ব

হারালো, সেদিনই নারীর হৃদয়ে জন্ম নিলো লজ্জা ও কামনা এবং ঈশ্বর তাকে দিলেন সন্তানধারণের ক্ষমতা—যাতে মৃত্যু এসে জীবনধারাকে স্তব্ধ করে দিতে না পারে, সৃষ্টি যাতে লুপ্ত হয়ে না যায়। তার মানে, নরনারীর প্রেম ঈশ্বরের অভিপ্রেত। কিন্তু প্রেম জন্মের মতো অনিবার্য না হলেও, নিয়তির মতো অমোঘ আর মৃত্যুর মতো চরম। প্রেম চায় নৈকট্য—'near and yet more near/ Till flesh must fade for heaven was here!' কিন্তু জয় করেও যে ভয় যায় না, তাই 'দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'। প্রেম কখনও শান্ত স্নিগ্ধ মধুর, কখনও ক্ষুধার্ত নির্মম লজ্জা-ভয়হীন। প্রেমকে ফ্রয়েড বলেছেন সেক্স বা যৌনতা। তাঁর মতে প্রতিটি মানুষের সত্তার গভীরে রয়ে গেছে যৌনতার খেলা—মানুষের সমস্ত সুকৃতি-বিকৃতি, ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকারের মূলে আছে সেক্স। ফ্রয়েডের এই ব্যাখ্যা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রেমের সংজ্ঞায় এনে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা।

এক সময় সাহিত্যে প্রেম বলতে শৃঙ্গার অথবা মধুর রসকেই বোঝাতো। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই যুগে যুগে দেশে দেশে রচিত হয়েছে হেলেন-প্যারিস, রাধা-কৃষ্ণ, লায়লা-মজনু, হীর-রণঝা বা রোমিও-জুলিয়েটের মতো অমর কাহিনী। কিন্তু তারপর দিন বদলেছে, যুগ বদলেছে আর সেই সঙ্গে তাল রেখে বদলে গেছে প্রেম-কাহিনীর আঙ্গিক ও চরিত্র—দুই-ই। পরিবর্তনটা শুধু বাইরেরই নয়, ভেতরেরও।

এক হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীকে বলা যায় ছোটোগল্পের স্বর্ণযুগ। কাহিনীর বুনোট, চরিত্র চিত্রণ, ভাষা, আঙ্গিক—সমস্ত দিক দিয়েই এ যুগের গল্পগুলি পাঠকের মনে আজও দোলা দিয়ে যায়। রোম্যান্টিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে এ যুগের গল্পে মিশে আছে বাস্তবের প্রভাব—যদিও তা রিপোর্টাজ নয়—তাই এই চরিত্র-গুলিকে অপরিচিত বলে মনে হয় না, কাহিনীগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না অবাস্তব বা অসম্ভব আখ্যা দিয়ে।

'সোনার বালা' শীর্ষক গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই প্রাচীন মূল্যবোধ তথা সংস্কারের সঙ্গে বাস্তবের এক নিদারুণ সংঘাত। প্রেমিকাকে ভালোবাসলেও রক্তের গভীরে মিশে থাকা মূল্যবোধকে অতিক্রম করে যাবার মতো মানসিক দৃঢ়তা (?) ছিলো না নায়কের। প্রেমিকাকে তুষ্ট করতে চেয়ে সে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে এক

অসম্ভবকে সম্ভব করতে গিয়েছিলো। কিন্তু বিবেকের দংশনে, অপরাধবোধে জর্জরিত হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো সে।

মপাসাঁর 'মিলন পিয়াসী' (In the woods) গল্পের নায়িকা নেহাতই রক্তমাংসের এক মানবী। সারাটা যৌবন তার কেটে গেছে অর্থ-চিন্তায়, দেহ বা মনের অন্য কোনো প্রয়োজনের কথা সে ভাবেওনি কোনোদিন। কিন্তু অর্থচিন্তা মিটে যাবার পর আচমকাই একদিন সে অবিষ্কার করে, বৃথাই কেটে গেছে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি। তখন তার মনে হয়, 'বিশটা বছর আমিও তো অন্যান্য মেয়েদের মতো অরণ্য-পরিবেশে পুরুষের চুম্বন উপভোগ করতে পারতাম!' সে ভাবে, 'গাছের নিচে শরীর এলিয়ে প্রেমিকের সোহাগ অনুভব করা না জানি কতোই মনোরম!'···জীবনে অনেক নারীসঙ্গ করেছেন মপাসাঁ, কিন্তু সম্ভবত চিরদিনই তিনি অতৃপ্ত থেকে গেছেন। তাঁর বেশ কয়েকটি ছোটোগল্পে নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের যে নিখুঁত ছবি আমরা দেখতে পাই তা পাঠক হিসেবে আমাদের অভিভূত করে তোলে।

ফ্রান্সে মপাসাঁ যখন একের পর এক তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলি লিখে চলেছেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে লিখছেন এমিল জোলা আর আঁদ্রে জিদ, ফরাসী সাহিত্যের শীর্ষমণি হয়ে বিরাজ করছেন স্বয়ং ফ্লবেয়ার—তখন অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ছোটো-গল্পে নতুন চমক সৃষ্টি করছেন ও. হেনরি, ইংলণ্ডে লিখছেন টমাস হার্ডি, জার্মানিতে টমাস মান। ওদিকে রাশিয়ায় তুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্কির পরে তখন সাহিত্যের আকাশে প্রায় একই সঙ্গে উদিত হয়েছে আরও দুটি নতুন সূর্য—সমাজসচেতন দুই অনন্য কথাশিল্পী। এঁদের একজনের নাম ম্যাক্সিম গর্কি, অন্যজন আন্তন শেখভ।

শেখভের মনস্তত্ত্বমূলক প্রেমের গল্পগুলি এক কথায় অনবদ্য। প্রেম সমাজ-সংসার মানে না, বাধা-নিষেধের পরোয়া করে না, লোকলজ্জাকে গ্রাহ্য করে না—কারণ প্রেম অন্ধ। প্রেমের এই দুর্বার গতির কাছে অসহায় হয়ে ওঠে পুরুষ ও প্রকৃতি, দুজনেই। প্রেম অতীতে ছিলো, আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আজও আপাত-অর্থহীন এক বিবর্ণ যান্ত্রিক বশ্যতার জীবনে সহসা এক বিশেষ নারীর আবির্ভাবে পুরুষের চেতনার গভীরে জেগে ওঠে সেই নিদারুণ দুঃখ, সেই উর্মিল যন্ত্রণা—যাকে ভুলে থাকার মতো দুঃখ-যন্ত্রণা আর কিছু নেই। শেখভের 'ভালোবাসা' (About Love) গল্পের নায়ক আলিয়োখিনও একসময় কেমন

করে যেন ভালোবেসে ফেলেছিলো পরস্ত্রী আন্না অ্যালেক্সিয়েভনাকে। আন্না তা বুঝতে পারে, অথচ নিজেকে প্রতিরোধ করতে পারে না এবং সেও ভালোবেসে ফেলে ওই পরপুরুষকে। তবু দুজনের কেউই পরস্পরের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে না, দুজনেই গুমরে মরে নিদারুণ মর্মযন্ত্রণায়। অবশেষে একদিন বাঁধ ভেঙে যায় উন্মত্ত সমুদ্রের, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। শেষ বিদায়ের নিষ্ঠুর মুহূর্তে ট্রেনের কামরায় প্রথম ও শেষবারের মতো বক্ষলগ্ন হয় ওরা দুজনে এবং গল্পের নায়ক তখনই অনুভব করে, প্রেমের ক্ষেত্রে যথাসময়ে পরস্পরের কাছে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ না করা এবং সংসারের আর পাঁচজনের কথা ভেবে নিজেদের বঞ্চিত করা আসলে অর্থহীন। কারণ প্রকৃত সত্যকে কিছুদিনের জন্যে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু তাকে অস্বীকার করা চলে না, তাকে অস্বীকার করতে চাওয়াটা এক ধরনের মূর্খতা।

এই প্রসঙ্গে মপাসাঁর আর একটি গল্পের কথা (Regret) মনে পড়ছে। গল্পটির মূল চরিত্র মঁ্যসিয় সাভেল কখনও প্রেমে পড়েননি। প্রেমে আত্মহারা হয়ে কোনো নারী কোনোদিনও তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। প্রতীক্ষার মধুর যন্ত্রণা, আলিঙ্গনে বেঁধে রাখা দুটি হাতের স্বর্গীয় শিহরণ, সফল কামনার অধীর আবেশ —কিছুই তিনি জানেন না। একবার একজনকে তিনি ভালোবেসেছিলেন বটে, কিন্তু তা নিতান্তই সংগোপনে। পাত্রী তাঁরই এক পুরনো বন্ধুর স্ত্রী, মাদাম সার্দ। অন্তরঙ্গ মেলামেশা থাকলেও মঁ্যসিয় কোনোদিনই তাঁর মনোভাব মাদামকে জানতে দেননি। কিন্তু বহু বছর পরে, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আচমকা একদিন মঁ্যসিয় কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হলো, নিজের কথা মাদামকে না জানিয়ে হয়তো তিনি ঠিক করেননি, হয়তো আজ তাঁর জীবনটা অন্য রকম হতে পারতো, হয়তো আজ তিনি এমন নিঃসঙ্গ থাকতেন না—কারণ সেদিন মাদামের কিছু কিছু কথায়-আচরণে যেন প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত ছিলো, হয়তো মাদামও ভালোবাসতেন তাঁকে। তৎক্ষণাৎ মাদাম সার্দের কাছে ছুটে গিয়ে অতীতের কোনো এক বনভোজনের কথা উল্লেখ করে মঁ্যসিয় জানতে চাইলেন, 'সেদিন আমি যদি দুঃসাহসী হয়ে উঠতাম, তবে তুমি কি করতে?' মাদাম জবাব দিলেন, 'তাহলে আমি তোমার কাছে ধরা দিতাম, বন্ধু!'···গল্পের শেষে আছে, মঁ্যসিয় সাভেল তখন মাথা নিচু করে এক ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন, যেন তাঁর বিরাট কোনো সর্বনাশ হয়ে গেছে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তিনি সেই বনভোজনের জায়গাটাতে গিয়ে হাজির হলেন এবং: 'সেখানে সেই ক্ষিপ্রতা

গাছগুলোর তলায় বসে ডুকরে কেঁদে উঠলেন ম্যঁসিয় লাভেল।' ম্যঁসিয় লাভেলের ওই কান্না শুধু কান্না নয়—তাঁর প্রেমহীন ব্যর্থ জীবনের রিক্ত হাহাকার।

উইলিয়াম সমারসেট মম তাঁর দীর্ঘ জীবনে ইউরোপ থেকে লাতিন অ্যামেরিকা, বার্মা-মালয় থেকে তাহিতি-নিউগিনি—সর্বত্র অনুসন্ধিৎসু মন. নিয়ে ঘুরে ঘুরে অসংখ্য মানুষ দেখেছেন। তাই তাঁর জীবননিষ্ঠ রচনায় আমরা এমন অনেক চরিত্রের সন্ধান পাই যারা বাসনার বিষে জর্জরিত, ব্যথায় বিধুর, হিংসায় উন্মাদ। মাঝে মাঝে এদের বিকৃত মানসিকতা আমাদের বিমূঢ় করে তোলে। মমের গল্পে আমরা দেখতে পাই আধুনিক জন-জীবনের জটিল মানসিকতা, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের কুটিল প্রভাব, প্রাচীন মূল্যবোধকে ধ্বংস করে ফেলার দানবীয় প্রবৃত্তি, অথচ বাস্তবকে পুরোপুরি মেনে নিতে না পারার নিদারুণ দুঃখবোধ। সংস্কারমুক্ত নির্লিপ্ত ঋষির মতো নির্বিকার মন নিয়ে সমারসেট জীবনকে দেখেছেন। তাই কোনো ভুল বা অন্যায় করলেই কোনো মানুষকে তিনি ঘৃণ্যকীট বলে বর্জন করার পক্ষপাতী নন। দোষে-গুণে মানুষের জীবন—তাই মোহান্ধ, অস্থির, এমন কি (সমসাময়িক আর এক মহান সাহিত্যিক লরেন্সের ভাষায়) অনেক 'morbid' চরিত্রকেও তিনি শাশ্বত করে রেখেছেন তাঁর স্মরণীয় সাহিত্যে। তাঁর কল্পিত মি. ডেভিডসন (Rain) একজন কট্টর মিশনারি। রঙ্গিনী যুবতী মিস টমসনকে তিনি নিষ্ঠুর দৃঢ়তায় সৎপথে ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু একদিন তাঁর স্ত্রীর মুখে শোনা যায়, তিনি নেব্রাস্কার পাহাড়ের স্বপ্ন দেখেছেন, যে পাহাড়গুলোর সঙ্গে নারীবক্ষের আশ্চর্য সাদৃশ্য। মমের আঁকা দারিয়া মনরো (Neil McAdam) বিবাহিতা, বিদুষী, মাঝবয়সী হয়েও অপাপবিদ্ধ নবীন যুবক নীল ম্যাক অ্যাডামের আকর্ষণে আত্মহারা হয়। লসন (The pool) শ্বেতাঙ্গ ও শিক্ষিত—অথচ এক অশিক্ষিতা নেটিভ মেয়ের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে, বহু অপমান সহ্য করেও সে পড়ে থাকে দূর প্রবাসে। অলিভ হার্ডি (The Book-bag) হতাশায় ভেঙে পড়ে নিজের ভাই টিমের আচমকা বিবাহ-সংবাদে।...কখন, কিভাবে এবং কেন ঝলসে ওঠে সেই চকিত-স্ফুলিঙ্গ যার ফলশ্রুতি প্রেম—তা বোধহয় সব সময় কল্পনাও করা যায় না। প্রেম অমোঘ নিয়তির মতো ডেভিডসন, দারিয়া, লসন ও অলিভ—প্রত্যেককে টেনে নিয়ে গেছে চরম পরিণতির দিকে। এদের আমরা ভুলতে পারি না, ভুলতে চাই না। কারণ 'প্রেম জীবনকে করে সুন্দর, মৃত্যুকে করে মহান।' কিন্তু প্রবঞ্চিতকে সে কি দেয়? হয়তো দাহ। শুধু অনিঃশেষ দাহ। 'তৃষ্ণা' (Red) গল্পে স্যালিকে আপন করে পেয়েও নীলসন অনেক কিছুই পায়নি।

গল্পের পরিণতিতে এসে নীলসনও নিজেকে প্রবঞ্চিত বলে মনে করে। কারণ যে সুদর্শন রেড তার দাম্পত্য জীবনের মাধুর্যটুকু কেড়ে নিয়েছিলো, সেই রেডেরই কুৎসিত কদাকার চেহারাটা কেড়ে নিয়ে গেছে তার শেষ সান্ত্বনাটুকু।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ডি. এইচ. লরেন্সকে সব্যসাচী বললে, এতোটুকুও বাড়িয়ে বলা হয় না। তাঁর লেখা আজও পণ্ডিতজনের কাছে বিতর্কের বিষয়। কেউ কেউ বলেন, লরেন্সের সাহিত্যে আদি রসের অহেতুক আধিক্য। অন্য এক দলের মতে, তিনি বুর্জোয়া ক্ষয়িষ্ণুতার প্রতীক। কিন্তু যৌন মনস্তত্ত্বকে ডেভিড লরেন্স তাঁর সাহিত্যে এক অসাধারণ শিল্পিত সুষমায় প্রদীপ্ত করে তুলেছেন। স্থূল দেহবাদ নয় —দেহের সোপান বেয়ে রূপ থেকে অরূপলোকে উত্তরণ সার্থক হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর সাহিত্যে। 'সূর্য' গল্পটি (Sun) তাঁর সেই সূর্য-সাধনারই অকৃত্রিম প্রকাশ।

সমস্ত আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে নগ্ন শরীরে সূর্যস্নান করার সময় একদিন জুলিয়েট অনুভব করলো, সূর্যের আলো যেন ওর দেহের অস্থি অব্দি ঢুকে গেছে—ঢুকে পড়েছে আরও গভীরে, ওর আবেগ আর চিন্তার ভিতরে—শিথিল হতে শুরু করেছে ওর আবেগের ঘন উদ্বেগ, গলতে শুরু করেছে রক্তের মতো জমাট বেঁধে থাকা ওর চিন্তার হিমপিণ্ডগুলি। নিজের মনের গভীরে জুলিয়েট তখন থেকে শুধু ওই সুদীপ্ত সূর্য আর তার সঙ্গে ওর মধুর মিলনের কথা ভাবে। ওর বিদ্রোহী আত্মা আকুল হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে, কেন ওই অপরিচিত কৃষকটির সঙ্গে এক ঘণ্টার জন্যে মিলিত হয়ে ও তার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করবে না? স্ফুলিঙ্গ যখন জ্বলেই উঠেছে তখন কেন একটি মাত্র পুরুষের সঙ্গেই ওর জীবনকে একাত্ম করে রাখতে হবে চিরদিন? ওই কৃষক ওর কাছে এক জন্মদায়ক সূর্যস্নান হতে পারতো, জুলিয়েটও তাই চেয়েছিলো। কিন্তু তা হয় না! জুলিয়েট জানে, ওর পরবর্তী সন্তানটিও হবে মরিসের—ওর স্বামীর—এবং ধারাবাহিকতার নিদারুণ শৃঙ্খলই হবে তার কারণ।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় আলবেয়ার কামুর একটি অসাধারণ (The Adulterous woman) ছোটোগল্পের কথা, যে গল্পের নায়িকা 'জানিন' স্বামীর সঙ্গে মরুভূমির প্রান্তে এসে আবিষ্কার করেছিলো নিজের নিঃসঙ্গতাকে। ধারাবাহিকতার অর্থহীন গ্লানি থেকে মুক্তির বাসনায় তখন আর্তনাদ করে উঠেছিলো তার সমস্ত সত্তা। ঘর ছেড়ে নির্জন নিশীথে এক অলৌকিক প্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আচমকা তার মনে হয়েছিলো, অনন্ত আকাশটা যেন প্রেমিকের অধিকার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার অবারিত, উন্মুখ দেহের ওপরে। অথচ

তারপরেও সেই রাত্রে জানিনকে ফিরে আসতে হয়েছিলো! তার স্বামীর কাছে।

দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্তন ঘটে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এসে বদলে দিয়ে যায় মানুষের জীবনধারা। ইতিহাসের পুরনো প্রস্তর যুগ, নূতন প্রস্তর যুগ, তাম্র ও লৌহ যুগ—ভূগোলের প্রি-ক্যোমব্রিয়ান, ক্যামব্রিয়ান, টার্শিয়ারি যুগ—ইত্যাদির মতো শিল্প ও সাহিত্যের দরবারে একে একে এসে হাজির হয় রিয়ালিজম, ইম্প্রেশনিজম ও আরও অনেক মতবাদ। ইম্প্রেশনিজমের বিরুদ্ধে পরবর্তী কালে ইউরোপে দানা বেঁধে ওঠে বেশ কয়েকটি নতুন আন্দোলন: ফ্রান্সে ফবিজম, স্পেনে কিউবিজম, ইতালিতে ফিউচারিজম এবং জার্মানিতে এক্সপ্রেশনিজম। তারও পরে সুররিয়ালিজম আন্দোলনের মাধ্যমে আঁদ্রে ব্রেত চাইলেন ডাডাইজমের নৈরাজ্যময় তাণ্ডব থেকে সাহিত্যকে মুক্তি দিতে। অনেকের মতে বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-আন্দোলন এই সুররিয়ালিজম। সুররিয়ালিজম শব্দটির অর্থ: সুপার রিয়ালিজম—স্বপ্ন আর বাস্তবের সংমিশ্রণে গড়া প্রকৃত বাস্তবতা, যেখানে বস্তুর চাইতে চিন্তা বড়ো। এই আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন পল এলুয়ার, লুই আরার্গ, সালভাদর দালি ও লুই বুনুয়েলের মতো বরেণ্য সাহিত্যিক, শিল্পী ও চলচ্চিত্রকার। এঁরা বললেন, প্রথাগত স্বাভাবিকতা আর আরোপিত যুক্তির শৃঙ্খল মানুষের স্বাধীনতাকে সীমায়িত করে রেখেছে, খণ্ডিত করে রেখেছে কল্পনার সুষম বিকাশ। তাই আর যুক্তি নয়, আর বাঁধাধরা পথের ঐতিহ্য নয়—এবারে যেতে হবে মগ্ন চৈতন্যে: কারণ সেখানেই আছে পরম আনন্দ, আছে প্রকৃত মুক্তি।

তারপর ১৯১৭ সালে এলো রুশ বিপ্লব আর সেই সঙ্গে এলো কমিউনিজম—যার মূল কথা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, অর্থনৈতিক মুক্তি, তথা সর্বহারার বিপ্লব। দেখতে দেখতে এসে গেলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—মানুষের হিংস্রতার কাছে আবার বিপন্ন হলো মানুষের বিশ্বাস, আশা আর ভালোবাসা—ভেঙে তছনছ হয়ে গেলো প্রাচীন যতো মূল্যবোধ। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'মৃগয়া' (Up In Michigan), এন্দ্রে ইলিজের 'আলোছায়া' (The Lieutenant's Wife) এবং আলবার্তো মোরাভিয়ার 'ইংরেজ অফিসার' অবক্ষয়ে ভরা এই জীর্ণ, নৈতিকতাহীন যুগযন্ত্রণার প্রতীক। এ যন্ত্রণা যেন এক 'প্রাণেশ্বরী যন্ত্রণা', শব্দের অপ্সরীর মতো যা সাড়া জাগায় অনুভূতির সুবেদী নূপুরে নূপুরে, ফুল ফোটায় নিষ্ঠুর বধ্যভূমিতে।

তবু ধ্বংসের বুকেই জন্ম নেয় নতুন সৃষ্টির শতদল। তাই যুদ্ধোত্তর নৈরাজ্যের মধ্যেই বিকশিত হয়ে উঠলো নতুন এক তীব্র আন্দোলন: এক্সিসটেনশিয়ালিজম বা অস্তিত্ববাদ। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা ফরাসী দার্শনিক জঁা পল সার্ত্রে। এঁরা বললেন: আগে অস্তিত্ব, তারপর দায়িত্ব বা কমিটমেণ্ট। দায়িত্ব জীবনের কাছে, সমাজের কাছে। অথচ অস্তিত্ব রক্ষার জন্যেই মানুষের যতো দুশ্চিন্তা, যতো উদ্বেগ। এই দুশ্চিন্তার মূলে আছে মৃত্যুভয়, যা অস্তিত্বকে লুপ্ত করে দেয়। আবার অস্তিত্ব আছে বলেই দায়িত্বের হাত থেকেও নিষ্কৃতি নেই, উপায় নেই দায়িত্ব রক্ষার উদ্বেগ থেকে মুক্তি পাবার। আমরা তাই চিরনিঃসঙ্গ, চিরবিষণ্ণ।

সার্ত্রের 'ঘর' গল্পটি এই অস্তিত্ববাদের এক অসামান্য নিদর্শন।

আধুনিক বিশ্বসাহিত্যে আইজ্যাক সিঙ্গার এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর অনেক গল্পেই প্রেমকে যেন ঠিক প্রেম বলে চেনা যায় না। 'সুখের ঠিকানা' (A Quotation from Klopstock) গল্পের মূল চরিত্রকে আমাদের ঠিক প্রেমিক বলে ভেবে নিতে কষ্ট হয়—বরং তাকে ভণ্ড, মতলববাজ বা লম্পট বলে মেনে নেওয়া যেন অনেক সহজ। অথচ গল্পের পরিণতিতে এসে সে অনুভব করেছে, প্রেমের ক্ষেত্রে দয়া করুণা বা অনুকম্পার কোনো স্থান নেই—প্রেম এক সর্বনাশা স্বার্থপরতা। কিন্তু যাঁকে নিয়ে এই কাহিনী, সেই বয়স্কা বিদূষী অবিবাহিতা নারীর কাছে প্রেম এক স্বর্গীয় আশীর্বাদ। সারাটা জীবন তিনি এই পরম আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছেন। তাই শেষ লগ্নে যার স্পর্শে তাঁর কুমারী-শরীর পুলকিত হয়ে উঠেছে, শিহরণ জেগেছে অন্তরের প্রায় বিশুষ্ক গোপন উদ্যানে, তাকেই তিনি গ্রহণ করেছেন, আঁকড়ে ধরেছেন, বাঁচতে চেয়েছেন নিজেকে উৎসর্গ করে।

উর্দু সাহিত্যের বিতর্কিত লেখক সাদাত মাণ্টোর অনেক গল্পই অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত। কিন্তু নরনারীর পারস্পরিক গোপন সম্পর্কের ছবি তাঁর লেখায় যেন তীব্র ঝঙ্কারের মতো বেজে ওঠে। তাঁর একটি গল্পের মূল চরিত্র রণধীর একদা বৃষ্টির দিনে এক দক্ষিণ ভারতীয় আদিবাসী রমণীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলো। রণধীর একজন তথাকথিত সুরুচিসম্পন্ন সৌখিন ভদ্রলোক, ঘামের গন্ধ তার কাছে পীড়াদায়ক বলে মনে হয়। নারীসঙ্গে তার অরুচি নেই। কিন্তু যাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক, তারা সকলেই হাল-ফ্যাশনের মেয়ে। অথচ ওই নোংরা মেয়েটির নগ্ন উদ্বেল দেহে ভেজা-মাটির সোঁদা গন্ধের মতো যে তীব্র নির্যাস ছিলো, তা

রণধীরের সমস্ত অস্তিত্বকে যেন নেশাগ্রস্ত করে তোলে। মেয়েটির কালো রোমশ বাহু-সন্ধিতে বারবার চুমু খেয়েও সে বিন্দুমাত্র ঘৃণা অনুভব করে না। তার মনে হয় মেয়েটির প্রতিটি রোমকূপ থেকে ঠিকরে বেরুনো ওই ঝাঁঝালো গন্ধ কোনোমতেই আতর বা গোলাপ জলের মতো কৃত্রিম বা সাময়িক নয়—তা আদিম যুগের নারী-পুরুষের সহজ সুস্থ সম্পর্কের মতোই সম্পূর্ণ অকৃত্রিম আর সুচিরস্থায়ী। মাণ্টোর এই ধরনের অকপট ঋজু বক্তব্য এবং তাঁর তীব্র প্রকাশভঙ্গিমা দুর্বল হৃৎপণ্ডে মারাত্মক আঘাত হানার পক্ষে যথেষ্ট। সংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল মানুষ, যাঁরা মাণ্টোর লেখায় নিজেদের স্বরূপ দেখতে পেয়ে ভয়ে চমকে ওঠেন, তাঁরা তাই বারবার অশ্লীল বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন মাণ্টোকে।

'মোজেইল' গল্পের ইহুদি মেয়ে মোজেইল তার শিখ-প্রেমিকটিকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েও কথা রাখেনি, কারণ ও চায় ওর পুরুষমানুষটি হবে উদ্দাম, বেপরোয়া। অথচ তারপরেও শিখ যুবকটির সঙ্গে মোজেইলের অনায়াস ব্যবহারের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি এবং তার নতুন প্রেমিকার প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে মোজেইল অবলীলাক্রমে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, অবহেলায় আত্মবিসর্জন দিয়েছে নিজের শরীরে এতোটুকুও আবরণ না রেখে—যা ওর অকপট আত্মার প্রতীক। একি শুধুই পরার্থপরতা? কাউকে প্রাণ দিয়ে ভালো না বাসলে তার প্রেমিকার জন্যে, তার ভবিষ্যৎ সুখের জন্যে কেউ কি নিজেকে অমন করে উৎসর্গ করতে পারে? প্রশ্নটির জবাব কিন্তু অনুক্তই থেকে যায়।

'মোজেইল' যেমন এক অসাধারণ মেয়ের আত্মবিসর্জনের কাহিনী, 'নাচুনি মেয়ে' তেমনি এক সাধারণ মেয়ের স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস। সেদিক দিয়ে 'পথে যেতে' (The Hitchhiking Game) অনেক বেশি জটিল গল্প।

শুধু চেখ সাহিত্য কেন, সম্ভবত এই মুহূর্তে পুরো ইউরোপেই মিলান কুন্দেরার কোনো জুড়ি নেই। শ্লেষ, বিদ্রূপ ও নির্মম রসিকতায় হয়তো স্পেনের সেণ্টো হোসে সেলা (জন্ম ১৯১৬) তাঁর অনেকটা কাছাকাছি। পথে যেতে যেতে আচমকা যে খেলার শুরু হয়েছিলো, প্রথমে সেটা নিছক খেলাই ছিলো—বলা যেতে পারে, খেলার খেলা অথবা মজার খেলা। কিন্তু তার পরেই হঠাৎ সবকিছু কেমন যেন অন্য রকম হয়ে যায়। বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যে অচেনা হিচহাইকার (হিচহাইকারের কোনো সঠিক ও শ্রুতিমধুর বাংলা প্রতিশব্দ আছে বলে আমার জানা নেই) মেয়েটি গাড়িতে উঠে বসলো, শুধু গাড়িতেই নয়—উড়ে এসে জুড়ে বসার মতো সে যেন নিয়তির মতো অক্লেশে ঢুকে পড়লো তার ভূমিকায় অবতীর্ণ

হওয়া মেয়েটির শরীর মন এমন কি আত্মার মধ্যেও। খেলার ছলে যার ভূমিকায় অভিনয় করা হচ্ছিলো সেই হয়ে উঠলো আসল, তার সত্তা কেমন করে যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেলো অভিনেত্রীর সত্তায়। তখন কেঁদেকেটে একাকার হলেও নিষ্কৃতি মেলে না, কারণ খেলারও একটা নিয়ম-প্রণালী থাকে, খেলতে নেমে খেলোয়াড়রা আচমকা নিজেদের ইচ্ছেমতো মাঠ ছেড়ে চলে যেতে পারে না। আসলে গড়ে নেওয়া কিছু ধারণা, অর্থহীন কিছু বিশ্বাস আর প্রচলিত কিছু সংস্কার—যা যুগ যুগ ধরে ধর্মের সঙ্গে মিশে থাকা আচারের মতো মিশে গেছে আমাদের রক্তে, মজ্জায় তা যে কিভাবে আমাদের মনটাকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিতে পারে—গল্পটা তারই এক বিশ্বস্ত নজির। অথচ এর একটা পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাহ্যিক পরিবর্তনটাই বড়ো কথা নয়, পরিবর্তন হওয়া দরকার অন্তর্জগতেরও—নইলে সবই হয়ে যাবে অর্থহীন।

উনিশ শতকের ছোটোগল্পে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অলৌকিকত্বের দাগ থাকলেও তার মধ্যে মোটামুটি একটা কাহিনী থাকতো, নাটকীয়তা থাকতো, আর থাকতো কিছু স্বাভাবিক চরিত্র। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর জটিল যুগে জীবনের সঙ্গে জীবন মিলিয়ে নিটোল গল্প বলার দিন বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। তাই এ যুগের অধিকাংশ গল্পই জটিল এবং হয়তো অনেকের কাছেই কিছুটা দুর্বোধ্য। নতুন আঙ্গিক, প্রতীকের ব্যবহার, নতুন নতুন শব্দ-অপ্সরীর নিপুণ অন্বেষণ—এ সবই এ যুগের গল্পের বৈশিষ্ট্য।

'যুবতীর মন' (The Goat) এমনি একটি জটিল গল্প যেখানে এক উর্বরা নারী ফুল ফোটাবার স্বপ্ন দ্যাখে, কিন্তু তার আতঙ্ক : অনিবার্য জরা দ্রুত এগিয়ে আসছে তার স্বামীকে গ্রাস করতে। যৌবনের প্রতীক জাগের ও লেনার উৎসুক দেহবিলাস তার মনে ঈর্ষা আর আক্রোশ বয়ে আনে। নিজের দৃষ্টান্ত মনে রেখে লেনাকে সে সতর্ক করে দিয়ে বলে, জাগের তার চাইতে বয়েসে অনেক বড়ো এবং যে ফলটা আগে পাকে প্রকৃতির নিয়মে সেটাই সব চাইতে আগে পচে। শেষ অব্দি রতিলিপ্সু অসহায় সুশান ছুরি হাতে নিয়ে ছাগলটাকে হত্যা করতে যায়, যে ছাগলটা প্রকাশ্যে খেলার ছলে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জানাতে আসে, নিরাপত্তার বেষ্টনী পেরিয়ে বাগানে ঢুকে তার সাধের গোলাপ-ঝাড়গুলোকে মুড়িয়ে খায়। এ গল্পে ছাগল হয়তো অনিবার্য জরা, আর ছুরিটা ফ্রয়েডীয় যুক্তিতে পুরুষাঙ্গের প্রতীক।

নান্দীমুখ শেষ হয়ে এলো, এবারে যবনিকা তোলার পালা। কিন্তু তার আগে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। আইজ্যাক সিঙ্গার বহুদিন ধরেই অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, নোবেল পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন ওই দেশের নাগরিক হিসেবে। আর মিলান কুন্দেরাও বর্তমানে চেখোস্লোভাকিয়ার নাগরিক নন। কিন্তু যে অর্থে জোসেফ কনরাড ও শ্রী নীরদ চন্দ্র চৌধুরী ব্রিটিশ নাগরিক হয়েও যথাক্রমে পোলিশ ও ভারতীয় সাহিত্যিক, সেই একই অর্থে সিঙ্গার এবং কুন্দেরার গল্প দুটিকে এই সংকলনে যথাক্রমে পোল্যাণ্ড ও চেখোস্লোভাকিয়ার গল্প হিসেবে স্থান দেওয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকে যেতে পারে।

পরিশেষে আর একটি নিবেদন। 'ওগো বিদেশিনী' প্রেম-কেন্দ্রিক বিদেশী গল্পের একটি সংকলন, যার ব্যাপ্তি প্রায় একশো বছর। তবে কোনো অর্থে-ই আমরা এটিকে শ্রেষ্ঠ প্রেম-কাহিনীর সংকলন বলছি না। কারণ 'শ্রেষ্ঠ' শব্দটাই হয়তো আপেক্ষিক। তাছাড়া যেখানে কোনো একজন লেখকের একটিমাত্র গল্পকেই শ্রেষ্ঠ গল্প হিসেবে বেছে নেওয়া দুঃসাধ্য, সেখানে একটি মাত্র গল্পকেই একটা গোটা দেশের তামাম গল্পের প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নেবার প্রয়াস নিতান্তই ধৃষ্টতা। আসলে এই সংকলনের মাধ্যমে ছোটোগল্পের বিবর্তনের ধারাটিকে বজায় রেখে আমরা অতি প্রাচীন সেই আরক্তিম অনুভূতিটির অশেষ বৈচিত্র্যকে বাণীবদ্ধ করতে চেয়েছি যা গ্রীষ্মের খরতাপের মতো রুদ্র আবার বর্ষার মেঘমালার মতো মেদুর, আকাশের মতো উদার ও উদাসীন অথচ মরুভূমির মতো হিংস্র ও নিষ্ঠুর, সমুদ্রের মতো উদ্দাম কিন্তু পর্বতের মতো মূক। কিন্তু আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও কিছুটা অপূর্ণতা রয়েই গেলো। বহু ভালো প্রেমের গল্প এতে নেওয়া সম্ভব হয়নি। অনিবার্য কারণে বাদ দিতে হয়েছে বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিকদেরও। তবু আশা করি, 'ওগো বিদেশিনী' রসিক পাঠকের সুবেদী হৃদয়ে অবশ্যই একটু ঠাঁই করে নিতে পারবে।

সোনার বালা

গুস্তাভো অ্যাদলফো বোকেয়ের

জন্ম ১৮৩৬ সালে, সিভিলিতে। চিররুগ্ন এই প্রতিভাবান মানুষটিকে চিরদিনই সংগ্রাম করতে হয়েছে নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের সঙ্গে। সাহিত্য-খ্যাতির আকর্ষণে নিতান্ত কিশোর বয়সেই তিনি মাদ্রিদে চলে আসেন। প্রাণ ধারণের তাগিদে তাঁকে নির্বিচারে নানান ধরনের কাজ করতে হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর সাহিত্যচর্চাও ছিলো অব্যাহত। ১৮৭০ সালে মৃত্যু হয় এই মহান প্রতিভার এবং পরের বছর দুখণ্ডে প্রকাশিত হয় তাঁর সমগ্র রচনাবলী।

মেয়েটি রূপসী। এমন আশ্চর্য সেই রূপ যে তা পুরুষমানুষকে একেবারে বিহ্বল করে তোলে। এমন দুর্লভ আর অতিপ্রাকৃত সেই রূপ, যে তার সঙ্গে আমাদের স্বপ্নে দেখা অপ্সরীদেরও কোনো তুলনা হয় না।

ছেলেটি ওকে ভালোবাসতো। এমন নিবিড় সেই ভালোবাসা যে তা সমস্ত বাধাবন্ধন অতিক্রম করে যন্ত্রণার মধ্যেই খুঁজে পেতো তার পরম আনন্দ, যেখানে মৃত্যুও অতি তুচ্ছ। এ প্রেম ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতোই সুন্দর, অথচ প্রায়শ্চিত্তের জন্যে তাকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিলো নির্মম এই পৃথিবীতে।

মেয়েটি খেয়ালী। এ পৃথিবীর অন্য সব মেয়েদের মতোই খেয়ালী আর অবুঝ।

ছেলেটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তার সময়কার অন্য সব ছেলেদের মতোই কুসংস্কারাচ্ছন্ন আর দুঃসাহসী।

মেয়েটির নাম মারিয়া আন্তনেজ।

ছেলেটি পেদ্রো আলফনসো দ্য অরেল্লানা।

ওরা দুজনেই তলেদের বাসিন্দা, দুজনেরই বাড়ি ওই শহরে যে শহরটা ওদের জন্মাতে দেখেছে।

মুখে মুখে প্রচারিত এই অপূর্ব কাহিনী, যা আজ থেকে বহু বছর আগে ঘটেছিলো—তাতে এই প্রধান দুটি চরিত্র সম্পর্কে আর বেশি কিছু বলা নেই।

তাই আরও বিশদভাবে ওদের বর্ণনা করার জন্যে, নিজের মনগড়া একটি শব্দও যোগ না করে, নিচের কাহিনীটা আমি যথাযথ তুলে দিলাম।

একদিন মেয়েটিকে কাঁদতে দেখে ছেলেটি প্রশ্ন করলো, 'একি, তুমি কাঁদছো কেন?'

মেয়েটি চোখ মুছে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে তাকালো, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নতুন করে কাঁদতে শুরু করলো আবার।

মারিয়ার কাছাকাছি এসে ওর হাতখানা নিজের মুঠোয় তুলে নিলো ছেলেটি, কনুইয়ের ভর রাখলো নকশা-কাটা আরবী প্রাচীরটার গায়ে, যেখানে দাঁড়িয়ে নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া কুলুকুলু নদীটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে রূপসী মেয়েটি। তারপর ফের প্রশ্ন করলো, 'এই, তুমি কাঁদছো কেন গো?'

মিনারের পায়ের কাছে গুমরে ওঠা তাজো নদী এঁকেবেঁকে চলে গেছে শিলা-পাহাড়ের ভেতর দিয়ে, যার ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজধানী-শহরটা। প্রতিবেশী পাহাড়গুলোর পেছনে সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছিলো, প্রদোষের অস্ফুট ছায়া থিরথির করে ভাসছিলো একটা স্বচ্ছ আশমানি-রঙ পর্দার মতো। শুধু জলস্রোতের একঘেয়ে ছলছল আওয়াজ ভেঙে দিচ্ছিলো চারদিকের নিটোল স্তব্ধতাকে।

'জিগেস কোরো না আমি কেন কাঁদছি, জিগেস কোরো না,' মারিয়া কাতর কণ্ঠে মুখর হয়ে ওঠে। 'কারণ আমি নিজেই জানি না কি করে তোমার প্রশ্নের জবাব দেবো, কি করে তোমাকে বোঝাবো। আমাদের, মেয়েদের প্রাণে, এমন অনেক দমবন্ধ করা বাসনা লুকিয়ে থাকে যা শুধু দীর্ঘশ্বাসে প্রকাশ পায়... এমন অনেক পাগলামোর কথা কল্পনায় ভেসে আসে যা ভাষায় রূপ দিতে ভরসা হয় না...আমাদের রহস্যময় প্রকৃতির এ এক বিচিত্র স্বভাব—যা কোনো পুরুষ মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। আমি তোমাকে মিনতি করছি, তুমি আমার দুঃখের কারণ জানতে চেয়ো না। কোনোদিন আমি যদি তোমার কাছে তা বলি, তুমি হয়তো হেসেই উড়িয়ে দেবে।'

স্খলিত কণ্ঠে কথাগুলো বলে মারিয়া মাথা নিচু করলো আর পেদ্রো ওর কান্নার প্রকৃত কারণটা জানার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করলো আবার।

অবশেষে অনমনীয় নৈঃশব্দ্য ভেঙে দীপ্তিময়ী মেয়েটি কান্না ভেজা ধরা-ধরা গলায় ওর প্রেমিক-পুরুষকে বললো, 'তবে শোনো। যদিও আমার মূর্খতার কথা শুনে তুমি হাসবে, তবু আমি তোমাকে সব কিছু বলতে চাই—কেননা শোনার জন্যে তুমি বড্ড বেশি মিনতি করছো।

'গতকাল আমি গির্জায় গিয়েছিলাম। ওরা তখন কুমারী মেরীর উৎসব অনুষ্ঠান পালন করছিলো। উঁচু বেদির ওপরে সোনালি স্তম্ভমূলে বসানো মেরীর প্রতিমূর্তিখানা ঝলমল করছিলো জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো। অর্গানের স্বর কেঁপে কেঁপে উঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিলো গির্জার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ জুড়ে। আর ঐকতান সঙ্গীতে যাজকরা গাইছিলেন, স্যালভ রিজাইনা।

'আমি তখন প্রার্থনা করছিলাম, তন্ময় হয়ে ডুবে ছিলাম আমার ধর্মীয় ধ্যানের গভীরে। কিন্তু হঠাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি মাথা তুললাম, আমার দৃষ্টি খুঁজে নিতে চাইলো দেবীর বেদিটাকে। কেন জানি না, সেই মুহূর্ত থেকে আমার চোখ দুটো দেবীর মূর্তির দিকেই স্থির হয়ে রইলো—কিন্তু না, আমি ভুল বললাম—স্থির হয়ে রইলো এমন একটা জিনিসের দিকে, যা এর আগে আমি কখনও দেখিনি…কেন জানি না সেই থেকে ওই জিনিসটা আমার সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখলো। হেসো না—জিনিসটা হচ্ছে একটা সোনার বালা… কুমারী মাতার যে হাতখানা তাঁর দেবোপম পুত্রের গায়ে স্থির হয়ে রয়েছে, সেই হাতের বালা। আমি দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম, ফের প্রার্থনা করার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম, কিন্তু অসম্ভব। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চোখ দুটো ফিরে গেলো সেই একই জায়গায়। বেদির আলো বালার হীরেগুলোর হাজারো পলে প্রতিফলিত হয়ে বেড়ে উঠছিলো বিস্ময়কর ভাবে। লক্ষ লক্ষ প্রাণময় স্ফুলিঙ্গ—গোলাপী, আশমানি, সবুজ আর সোনালি স্ফুলিঙ্গ—গতিময় পরমাণুর ঝড়ের মতো ঘুরপাক খাচ্ছিলো রত্নগুলোকে ঘিরে…মনে হচ্ছিলো ঠিক যেন অগ্নিশিখাকে ঘিরে থাকা এক অস্পষ্ট জ্যোতির্বলয়, উজ্জ্বলতা আর অপরূপ অস্থিরতায় যা মানুষকে মুগ্ধ করে রাখে চিরদিন।

'গির্জা থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। বাড়িতে ফিরে এলাম, কিন্তু ফিরে এলাম কল্পনায় সেই একই চিন্তা নিয়ে। বিছানায় শুতে গেলাম, ঘুমোতে পারলাম না। রাত কেটে গেলো—একটি মাত্র চিন্তায় ভরা অনন্ত এক রাত। ভোরের দিকে আমার চোখের পাতা বুজে এলো…আর বিশ্বাস করবে?…সেই আধো তন্দ্রার মাঝেও আমি দেখলাম, এক নারীমূর্তি আমার চোখের সামনে দিয়ে অস্পষ্ট হয়ে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। সোনা জহরতের মণিময় অলঙ্কারে সুসজ্জিতা এক রূপসী নারী। হ্যাঁ, একটি নারী…কারণ তখন উনি আর কুমারী-মাতা ছিলেন না—যাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি, যাঁর পায়ের কাছে আমি নতজানু হই। উনি স্রেফ একটি নারী। আমার মতোই অন্য একজন। আমার দিকে তাকিয়ে উনি বিদ্রূপের ভঙ্গিমায় হাসলেন। যেন নিজের ঐশ্বর্যটা আমাকে দেখিয়ে দিয়ে

বললেন, 'এটা দেখেছো ? ছাখো, কেমন ঝিকমিক করছে ! মনে হচ্ছে যেন গ্রীষ্মরাতের আকাশ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া একরাশ নক্ষত্রের ছোট্ট একটা মালা। দেখেছো ? কিন্তু এটা তোমার নয়, কোনোদিন তোমার হবে না। কোনোদিনও না। হয়তো তোমার এমন অনেক অলঙ্কার হবে যা এটাকে ছাপিয়ে যাবে…সম্ভব হলে, হয়তো সেগুলো এর চাইতেও দামী হবে—কিন্তু এই বালা, যা এমন বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরিত, তা কক্ষণো তোমার হবে না—কোনোদিনও না'।…আমি জেগে উঠলাম। কিন্তু কথাটা আমার মনে স্থির হয়ে রইলো, জেগে রইলো একটা গনগনে লাল হয়ে ওঠা পেরেকের মতো…এক নারকীয়, অদম্য বাসনা—নিঃসন্দেহে স্বয়ং শয়তানই এর প্রেরণা যুগিয়েছে। কিন্তু তারপর ? তুমি তো নীরব, নিশ্চুপ হয়ে মাথা নিচু করে বসে রয়েছো। আমার মূর্খতায় কি তোমার হাসি পাচ্ছে না ?'

আক্ষেপ-পীড়িতের মতো তলোয়ারের হাতলটা চেপে ধরলো পেড্রো…মাথা তুললো ওপরের দিকে, যা এতোক্ষণ সত্যিই আনত হয়েছিলো। তারপর শ্বাসরোধী কণ্ঠস্বরে সে প্রশ্ন করলো, অলঙ্কারটা কোন্ কুমারী-মাতার ?'

'সাগ্রারিয়োর কুমারী-মাতার,' অস্ফুটে জবাব দিলো মারিয়া।

'সাগ্রারিয়োর কুমারী-মাতার !' আতঙ্কিত স্বরভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করলো তরুণ। সর্বনাশা এক চিন্তার মুখোমুখি হতেই মুহূর্তের জন্যে মনের ছবিটা ফুটে উঠলো তার মুখের অভিব্যক্তিতে।

'ওহ্, জিনিসটা অন্য কোনো কুমারী-মাতার হলো না কেন ? উত্তেজনায় টান টান হয়ে ওঠা আবেগবিধুর স্বরে ফের বলতে থাকে ছেলেটি। 'ওটা যদি আর্চবিশপের টুপি, রাজার মুকুট কিংবা তীক্ষ্ণ-নখ-শয়তানের মুঠোর মধ্যে থাকতো, তাহলেও আমি নির্দ্বিধায় তোমার জন্যে তা ছিনিয়ে আনতাম। যদিও তার মূল্য মৃত্যু বা নরকবাস, তবু সে সবই আমার কাছে তুচ্ছ ! কিন্তু আমাদের নগরলক্ষ্মী সাগ্রারিয়োর কুমারী-মাতার কাছ থেকে…আমি…আমি…যার জন্ম এই তলেদোতে—না না, তা হয় না…তা অসম্ভব !'

'কোনোদিনও হবে না !' প্রায় কানে না-পৌছনোর মতোই আধোভাবে মারিয়া ফিসফিসিয়ে বললো, 'কোনোদিনও না !'

আবার ও ফুলে ফুলে কাঁদতে শুরু করলো।

হতবিহ্বল দৃষ্টিতে নদীর স্রোতের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে পেড্রো। তাকিয়ে থাকে ছুটে চলা ঢেউগুলোর দিকে, তার অন্যমনস্ক চোখের সামনে দিয়ে যারা অবিরাম শুধু যায়, বয়ে যায়, ভেঙে পড়ে মিনারের পায়ের কাছে, পাহাড়ের মাঝে—যার শীর্ষে গড়ে উঠেছে রাজধানী-শহরটা।

তলেদোর গির্জা! কল্পনা করো, গ্রানাইট পাথরে গড়া অতি দীর্ঘ পাম গাছের অপরূপ সব খিলান, যেন গাছগুলোর শাখা-প্রশাখা পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে গড়ে তুলেছে এক গহন অরণ্য, যার নিচে দৈবদত্ত জীবনের এক সম্পূর্ণ সৃষ্টি—কল্পনা আর বাস্তব, এই দুইয়ের এক বিচিত্র সহাবস্থান।

কল্পনা করো, আলো আর ছায়ার এক বোধাতীত সম্মেলন—যেখানে খিলানাকৃতি জানলা দিয়ে রঙীন আলোক-রশ্মিরা এসে একত্রিত হয়, মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় গির্জাগর্ভের আবছা আঁধারে, যেখানে প্রদীপের দীপ্তি আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হারিয়ে যায় উপাসনাগৃহের আবিষ্ট অস্পষ্টতায়।

কল্পনা করো, শিলাময় এক পৃথিবী—যা আমাদের ধর্মের মূল নীতির মতো অপরিমেয়, তার ঐতিহ্যের মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন, তার নীতিগর্ভ উপাখ্যানগুলির মতো প্রহেলিকাময়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রবল আগ্রহ ও পরম বিশ্বাসের এই শাশ্বত স্মৃতিস্তম্ভ সম্পর্কে এতোটুকুও ধারণা জন্মাবে না তোমার—শতাব্দীর পর শতাব্দী যে স্মৃতিস্তম্ভকে নিজেদের জ্ঞান, অনুপ্রেরণা আর শিল্পের বৈভব দিয়ে অকৃপণভাবে ঐশ্বর্যময় করে তোলা হয়েছে।

গির্জার অন্তঃপুরে এক নিবিড় নৈঃশব্দ্য, রাজসিক মহিমা, অতীন্দ্রিয়তার কবিতা এবং এক পবিত্র আতঙ্কের বাস—যারা পার্থিব চিন্তা আর তুচ্ছ জাগতিক আবেগের কাছ থেকে এর প্রবেশপথকে আগলে রাখে।

কিন্তু আজ দিনমানের যে কোনো সময়ে গির্জার রহস্যময় পবিত্র ভূমিতে পা রাখলে দেবস্থানের মাহাত্ম্য মনে যে প্রভাব ছড়িয়ে দেয়, তা কোনোমতেই সেদিনের সেই প্রগাঢ় অনুভূতির মতো গভীর হতে পারে না—যেদিন দেবস্থান ছিলো নিষ্ঠাময় আনুগত্যের আড়ম্বরে ঐশ্বর্যবান, মন্দিরগুলো ছিলো সোনা আর জহরতে মোড়া, সিঁড়িগুলোতে ছিলো মহার্ঘ গালচের আবরণ আর স্তম্ভগুলো ঢাকা থাকতো কারুকার্য করা চিকের আড়ালে।

তারপর, রুপোর হাজারো বাতিদান থেকে যখন আলোর বন্যা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে, বাতাসে ভেসে বেড়ায় ধূপের সৌরভ, ঐকতান সঙ্গীতের কণ্ঠস্বর, অর্গানের উচ্চকিত স্বরসপ্তক আর মিনারের ঘণ্টাধ্বনি গির্জার ভিত্তিপ্রস্তর থেকে সর্বোচ্চ চূড়া অবধি কাঁপিয়ে তোলে থরথর করে—তখন—তখন আমরা ঈশ্বরের অনির্বচনীয় মহিমা উপলব্ধি করি, অনুভব করি গির্জার অন্তঃপুরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, যিনি নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসে গির্জাকে প্রাণময় করে তুলেছেন, নিজের মহিমার প্রতিফলনে ভরিয়ে তুলেছেন গির্জার সর্বত্র।

এইমাত্র আমরা যে দৃশ্যটির বর্ণনা দিয়েছি, যেদিন এই কাহিনীর অবতারণা,

ঠিক সেদিনই গির্জায় আটদিন ব্যাপী কুমারী-মাতার উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। পবিত্র সেই অনুষ্ঠান অসংখ্য ধর্মবিশ্বাসীকে আকর্ষণ করেছিলো, কিন্তু ততোক্ষণে তারা সকলেই বিদায় নিয়ে চলে গেছে বিভিন্ন দিকে। উপাসনাগৃহ এবং মূল বেদির আলোগুলো যখন নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, শেষতম বিদায়ী ভক্তটির পেছনে কব্জার আর্তনাদ তুলে বন্ধ হয়ে গেছে মন্দিরের বিশাল দরজা, তখন ছায়ার গভীর থেকে একটি ফ্যাকাশে মানুষ—সমাধির যে পাথুরে মূর্তিটার গায়ে সে মুহূর্তের জন্যে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো, সেই মূর্তিটার মতোই নিজের আবেগকে জয় করে চরম সতর্কতায় এগিয়ে গেলো মূল উপাসনা গৃহের পর্দাটার দিকে। সেখানকার অস্পষ্ট আলোয় মানুষটাকে চেনা গেলো।

মানুষটা পেদ্রো আলফনসো অরেল্লানা।

প্রেমিক দুজনের মধ্যে কি এমন ছিলো, যা মানুষটাকে এমনই একটা দুঃসাহসিক কাজে টেনে নিয়ে এসেছিলো, যা কেবল কল্পনা করতে গেলেও আতঙ্কে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে? এর প্রকৃত রহস্য কিন্তু কোনোদিনই জানা যাবে না।

কিন্তু মানুষটা এখানে এসেছে তার অন্যায় উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করার জন্যে। তার অস্থির দৃষ্টি, হাঁটুর কাঁপন, মুখাবয়ব থেকে বড়ো বড়ো ফোঁটায় ঝরে পড়া ঘামের বিন্দু—সমস্ত কিছুতেই তার চিন্তার লিখন।

গির্জাটা তখন নিঃসঙ্গ, একেবারে নির্জন, গভীরতম নৈঃশব্দ্যে বিলীন। তবু মাঝে মাঝে যে অস্পষ্ট আওয়াজে নৈঃশব্দ্য ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিলো—হয়তো তা কোনো পাটাতনের অসহায় আর্তনাদ, বাতাসের মর্মর, কিংবা—কে জানে, কি? হয়তো তা চিন্তাক্লিষ্ট মনের অলীক ভ্রান্তি—উত্তেজনার মুহূর্তে সে যা শোনে, দেখে বা অনুভব করে—অথচ বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্বই নেই। কিন্তু আসলে তখন এখানে ওখানে, কখনও মানুষটার পেছনে, কখনও বা পাশে—চাপা কান্নার মতো, লুটিয়ে পড়া অঙ্গবাসের খসখসানি কিংবা বিরামবিহীন পদসঞ্চারের মতো অস্পষ্ট একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিলো অনিবার্যভাবে।

সচেষ্ট প্রয়াসে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চললো পেদ্রো। বেষ্টনীর কাছে পৌঁছে নিষিদ্ধ অঞ্চলের প্রথম সোপানে পা রাখলো সে। গির্জার ভেতর-দেয়ালের পাশ ঘেঁষে সারি সারি রাজ-সমাধি। খাপে ঢাকা তলোয়ারের বাঁটে হাত রাখা রাজাদের প্রতিমূর্তিগুলো যেন দিনরাত নজর রেখে চলেছে এই পবিত্র গির্জার দিকে, যেখানকার ছায়ায় তাঁরা অনন্তকালের জন্যে বিশ্রাম নিয়েছেন।

'কই, এগিয়ে যাও!' আধোভাবে নিজেকে বললো, এগুতে চেষ্টা করলো পেদ্রো। কিন্তু পারলো না। মনে হলো পেরেক ঠুকে তার পা দুটোকে যেন মেঝের

সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে। নিচের দিকে চোখ নামালো সে, সঙ্গে সঙ্গে এক বিপুল আতঙ্কে তার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠলো। কারণ গির্জার মেঝেটা ছিলো সমাধিস্থানের চওড়া কালো পাথরে গড়া।

মুহূর্তের জন্যে পেদ্রোর মনে হলো মাংসহীন একটা হিমেল হাত দুর্জয় শক্তিতে তাকে ধরে রেখেছে। অন্ধকারের মধ্যে পথহারা নক্ষত্রের মতো ঝিকমিক করতে থাকা নিভু নিভু প্রদীপগুলো দুলে উঠলো তার চোখের সামনে। দুলে উঠলো সমাধিস্থদের পাথুরে মূর্তি, বেদির ওপরে মেরীর প্রতিমূর্তি, গ্রানাইটের তোরণশ্রেণী আর নিরেট পাথরের স্তম্ভসহ গোটা গির্জাটাই।

'এগিয়ে চলো!' ফের যেন নিজেকেই বললো পেদ্রো। বেদির ওপরে উঠে পবিত্র মূর্তিটির স্তম্ভমূলের দিকে হাত বাড়ালো সে। সমস্ত অঞ্চলটা অপার্থিব আর আতঙ্কজনক আকৃতি দিয়ে মুড়ে রেখেছে নিজেকে, সর্বত্রই ছায়া আর কেঁপে কেঁপে ওঠা আলো—যা সম্পূর্ণ অন্ধকারের চাইতে আরও ভয়ঙ্কর। একটা সোনালি প্রদীপের আলোয় শুধুমাত্র স্বর্গরাণীর মুখখানা স্নিগ্ধ আলোকিত, যেন হাসছেন উনি। চতুর্দিকের ভয়াবহতার মধ্যে ভারি প্রশান্ত, করুণাঘন আর অচঞ্চল সেই হাসি।

তবু ওই নিঃশব্দ, পরিবর্তনহীন স্মিত হাসি যা মুহূর্তের জন্যে পেদ্রোকে শান্ত করে তুলেছিলো, শেষ পর্যন্ত সেই হাসিই তাকে এক নিবিড় আতঙ্কে ভরিয়ে তুললো। এতোক্ষণ ধরে যতো আতঙ্ক সে অনুভব করেছে, এ আতঙ্ক তার চাইতে আরও বিচিত্র, আরও গভীর।

তবু আত্মনিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়ে নিজের চোখ দুটোকে বন্ধ করে ফেললো পেদ্রো, যাতে ওই পবিত্র মূর্তিটাকে আর দেখতে না হয়। তারপর কাঁপা কাঁপা হাত বাড়িয়ে ছিনিয়ে নিলো আর্চবিশপের নিবেদিত অর্ঘ্য, সেই পবিত্র স্বর্ণবলয়।

অলঙ্কারটা এখন পেদ্রোর অধিকারে। তার বিক্ষুব্ধ আঙুলগুলো অতিমানবিক শক্তিতে আঁকড়ে ধরেছে অলঙ্কারটাতে। এখন এটাকে নিয়ে তার পালিয়ে যাবার পথে আর কোনো বাধা নেই। কিন্তু পালাতে হলে চোখ দুটোকে খোলা প্রয়োজন। অথচ চোখ খুলে তাকাতে ভয় করছিলো তার, ভয় করছিলো কুমারী-মাতার পবিত্র প্রতিমূর্তি আর সমাহিত রাজাদের মূর্তিগুলোকে দেখতে। ভয় করছিলো কার্নিসের পিশাচ, স্তম্ভশীর্ষের গ্রিফিন*, ছায়াময় অন্ধকার আর আলোর ঝলকানিকে —যা রাক্ষসে অশরীরীর মতো ধীর পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে গির্জার গর্ভগৃহে, যে গর্ভগৃহ এখন ভরে উঠেছে বিভ্রান্তিকর এক অপার্থিব আর্তনাদে।

* কল্পিত জীব—যার মাথা ও ডানা ঈগলের আর শরীর সিংহের মতো।

অবশেষে চোখ মেললো পেদ্রো। পরক্ষণেই এক তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এলো তার ঠোঁটের প্রান্ত থেকে।

সমস্ত গির্জাটা শুধু মূর্তি, মূর্তি, আর মূর্তিতে ভরা। বিচিত্র, ঢেউ তোলা পোশাক পরা ওই মূর্তিগুলো তাদের কুলুঙ্গি থেকে বেরিয়ে এসে ভিড় জমিয়েছে গির্জার প্রশস্ত পরিসরে—কোটরগত জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রয়েছে পেদ্রোর দিকে। সাধু, সন্ন্যাসিনী, দেবদূত, শয়তান, যোদ্ধা, অভিজাত মহিলা, বীরব্রতী পদের জন্যে শিক্ষানবিস যুবা, ঋষি, কৃষক—চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে তাকে। সমাধির ওপরে নতজানু হয়ে থাকা রাজাদের উপস্থিতিতে আধিকারিকের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন মর্মরের আর্চবিশপরা, যাদের সে এতোক্ষণ মৃত্যুশয্যায় নিঃশব্দে শুয়ে থাকতে দেখেছে। আর গ্রানাইট পাথরে গড়া তামাম তুনিয়ার জীবজন্তু গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে পাথুরের মেঝের ওপর দিয়ে, শরীরে মোচড় তুলছে গির্জার নিরেট চাঁদোয়ার নিচে, দোল খাচ্ছে গম্বুজাকৃতি ছাদ থেকে, কেঁপে কেঁপে উঠছে একটা বিশাল বীভৎস বিকৃত মৃতদেহের আশ্রয়ে থাকা অসংখ্য ক্রিমির মতো।

নিজেকে আর সামলাতে পারলো না পেদ্রো। এক প্রচণ্ড হিংস্রতায় দপদপ করে উঠলো তার ভ্রূ তুটো, এক টুকরো রক্তের মেঘ আড়াল করে ধরলো তার দৃষ্টিপথ। দ্বিতীয় বার এক নিদারুণ হৃদয়-বিদারক অমানুষিক চিৎকার তুলে বেদির ওপরেই মূর্ছাহত হয়ে লুটিয়ে পড়লো সে।

পরদিন সকালে গির্জার কর্মচারীরা যখন পেদ্রোকে বেদির ওপরে গুটিসুটি হয়ে বসে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলো, তখনও সে তু হাত দিয়ে সোনার বালাটাকে আঁকড়ে রেখেছে। লোকগুলোকে এগিয়ে আসতে দেখে সে বেসুরো অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো :

'ওর ! এটা ওর ! এটা আমার প্রিয়তমার !'

বেচারা তখন সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে গেছে।

মিলন পিয়াসী

গী দ্য মপাসাঁ

আধুনিক ছোটোগল্পের অন্যতম রূপকার গী দ্য মপাসাঁর জন্ম ১৮৫০ সালের ৫ই আগস্ট, ফ্রান্সের নর্মাণ্ডি অঞ্চলে। ১৮৮০ সালে প্রকাশিত একটি গল্পসংকলনে (লা সয়ার দ্য মেদান) তাঁর লেখা 'চর্বির তাল' গল্পটি পাঠকসমাজে সাড়া জাগিয়ে তোলে। ১৮৯০ পর্যন্ত তিনি অজস্র গল্প উপন্যাস আর ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেছেন। কিন্তু আনাতোলে ফ্রাঁসের ভাষায়, আসলে তিনি 'ছোটোগল্পের রাজকুমার'। মানসিক ভারসাম্যতা হারিয়ে ১৮৯২ সালে তিনি প্রথমবার আত্মহননের চেষ্টা করেন। অবশেষে বিভিন্ন রোগে ভুগে তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৯৩ সালের ৬ই জুলাই।

প্রাতরাশে বসতে যেতেই মেয়র মশাই খবর পেলেন, গাঁয়ের চৌকিদার দুজন বন্দীকে নিয়ে তাঁর জন্যে চৌকিতে অপেক্ষা করছে। তক্ষুণি সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন, বুড়ো হোচেদুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক বয়স্ক মধ্যবিত্ত দম্পতির দিকে নজর রাখছে। পুরুষটির মোটাসোটা শরীর, নাকটা লাল, মাথার সাদা চুল, সমস্ত চেহারায় একেবারে মুষড়ে পড়ার ভাব। মহিলাটি খানিকটা গোলগাল, বেঁটে-খাটো, শক্তসমর্থ—উদ্ধত চোখে তিনি চৌকিদারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

'কি ব্যাপার, হোচেদুর ?' প্রশ্ন করলেন মেয়র।

চৌকিদার তার অভিযোগ পেশ করলো। বললো, শাঁপিয় জঙ্গল থেকে শুরু করে আরজেঁতিউলের সীমানা পর্যন্ত নিজের এলাকাটা টহল দেবার জন্যে সে সকালবেলা যথাসময়েই বেরিয়ে পড়েছিলো। চমৎকার আবহাওয়া আর গমের অপর্যাপ্ত ফলন ছাড়া গ্রামের মধ্যে অস্বাভাবিক কোনো কিছুই তার নজরে আসেনি। বুড়ো ব্রিদেলের ছেলে তখন দ্বিতীয়বার তার আঙুরক্ষেতের ডালপালা-গুলো ছেঁটে দিচ্ছিলো। ওকে দেখতে পেয়ে সে ডেকে বললো, 'এই যে বাবা হোচেদুর, জঙ্গলের ধারে গিয়ে একবারটি দেখে এসো। একজোড়া পায়রা ধরতে পারবে—তাদের বয়েস কিন্তু নিঘ্‌ঘাত একশো তিরিশ বছর !' লোকটার নির্দেশিত পথে সে জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে এবং সেখানে অস্পষ্ট কথাবার্তা শুনে কোনো হীন এবং

নৈতিক অপরাধ চলছে বলে সন্দেহ করে। চোর-শিকারীকে আচমকা হাতে-নাতে ধরে ফেলার ভঙ্গিমায় সে যখন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে এই দম্পতিকে গ্রেপ্তার করে, তখন তারা প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির কাছে নিজেদের প্রায় বিলিয়ে দিতে বসেছিলো।

অবাক বিস্ময়ে অপরাধীদের দিকে তাকালেন মেয়র—কারণ পুরুষটির বয়েস অবশ্যই ষাট বছর এবং মহিলার অন্ততপক্ষে পঞ্চান্ন। পুরুষটিকেই তিনি প্রথমে জেরা করতে শুরু করলেন। কিন্তু মানুষটির কণ্ঠস্বর এতো ক্ষীণ যে তার কথা প্রায় শোনাই যায় না।

'কি নাম আপনার?'

'নিকোলাস ব্যুরেঁ।'

'পেশা?'

'জামা-কাপড়ের ব্যবসা। পারীর রুা দে মারতাসে।'

'জঙ্গলের মধ্যে কি করছিলেন?'

ব্যবসায়ীটি নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। তাঁর দৃষ্টি নিজের ভুঁড়ির দিকে, হাত দুটি উরুর ওপরে লোটানো।

'পৌর-কর্তৃপক্ষের অফিসারটি যা বললেন, আপনি কি তা অস্বীকার করেন?'

'না, মঁ্যসিয়।'

'তাহলে আপনি তা স্বীকার করছেন?'

'হ্যাঁ, মঁ্যসিয়!'

'নিজের হয়ে আপনার কিছু বলার আছে?'

'কিছুই নেই, মঁ্যসিয়।'

'আপনার দুষ্কর্মের সঙ্গিনীটিকে কোথায় পেলেন?'

'উনি আমার স্ত্রী, মঁ্যসিয়।'

'আপনার স্ত্রী?'

'হ্যাঁ, মঁ্যসিয়।'

'তাহলে...তাহলে...পারীতে কি আপনারা একসঙ্গে থাকেন না?'

'মাফ করবেন মঁ্যসিয়, আমরা একত্রেই থাকি।'

'তাহলে তো আপনারা নির্ঘাত পাগল...সম্পূর্ণ পাগল! নইলে বেলা দশটার সময় গ্রামের মধ্যে ওই অবস্থায় কেউ ধরা পড়ে?'

ব্যবসায়ীটির অবস্থা একেবারে কাঁদোকাঁদো। মিনমিনে গলায় বললেন, 'আসলে উনিই আমাকে জোরাজুরি করছিলেন। আমি ওঁকে বলেছিলুম যে

এরকম করাটা ভীষণ বোকামো হবে। কিন্তু জানেনই তো, মেয়েদের মাথায় একবার কিছু ঢুকলে, তা থেকে আর কোনোমতেই নিস্তার নেই!'

মেয়র খোলাখুলি কথাবার্তা পছন্দ করেন। তাই মৃদু হেসে বললেন, 'আপনাদের ক্ষেত্রে কিন্তু উলটোটাই হওয়া উচিত ছিলো। মতলবটা যদি শুধুমাত্র ওঁর মাথাতেই থাকতো, তাহলে আপনাদের আর এখানে আসতে হতো না।'

ম্যঁসিয় ব্যুরেঁ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকালেন, 'তোমার কাব্যরোগ আমাদের কোথায় নিয়ে এসেছে, দেখলে? এখন এই বয়সে অশালীনতার অপরাধে আমাদের আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তারপর শেষ অব্দি দোকান-পাট বন্ধ করে, সুনাম বিকিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। এই তো হচ্ছে এর ফল!'

স্বামীর দিকে একবারও না তাকিয়ে মাদাম ব্যুরেঁ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এতোটুকুও বিব্রত বা অর্থহীন সঙ্কোচে অভিভূত না হয়ে নির্দ্বিধায় নিজের বক্তব্য বুঝিয়ে বললেন:

'আমি জানি ম্যঁসিয়, আমরা নিজেদের প্রচণ্ড উপহাসাস্পদ করে তুলেছি। কিন্তু দয়া করে আপনি আমাকে নিজের পক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দিন। আমার বিশ্বাস, সবকিছু শুনলে আপনি সদয় হয়ে আমাদের বাড়িতে ফিরে যাবার অনুমতি দেবেন—কাঠগড়ায় দাঁড়াবার লজ্জা থেকে আমরা অব্যাহতি পাবো।

'অনেক বছর আগে—আমার বয়েস তখন নিতান্তই কম—এই অঞ্চলেই এক রোববারে ম্যঁসিয় ব্যুরেঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। ও তখন একটা কাপড়ের দোকানে কাজ করতো, আর আমি অন্য একটা দোকানে তৈরি-করা পোশাক-আশাক বিক্রি করতাম। সবকিছু এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে, মনে হয় বুঝি গতকালের ঘটনা। তখন রোজ লেভাক নামে এক বান্ধবীর সঙ্গে আমি রুয় পিগালে থাকতাম আর মাঝেমধ্যে রোববারের দিনটা এখানে এসে কাটাতাম। রোজের একটি প্রেমিক ছিলো, আমার ছিলো না। ওর সেই প্রেমিকটিই আমাদের এখানে নিয়ে আসতো। এক শনিবারের দিন সে আমাকে হাসতে হাসতে বললো, পরদিন সে তার এক বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। সে কি বলতে চাইছে তা আমি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু বললাম, ওতে কিছু লাভ হবে না—কারণ আমি নিষ্পাপ মেয়ে ছিলাম ম্যঁসিয়।

'পরদিন রেল স্টেশনে ম্যঁসিয় ব্যুরেঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। তখন ও রীতিমতো সুদর্শন ছিলো। কিন্তু আমি কিছুতেই ওর কাছে আত্মসমর্পণ করবো না বলে মনস্থির করে রেখেছিলাম এবং তা আমি করিওনি। যাই হোক,

আমরা বেজঁতে গিয়ে পৌঁছলাম। দিনটা ছিলো ভারি চমৎকার, অমন দিনে অকারণেই মনে কেমন যেন দোলা লাগে। আজও দিনগুলো অমন সুন্দর হলে আমি ঠিক যেন সেই আগেকার মতো হয়ে যাই, বোকার মতো কাজকর্ম করি, বুদ্ধিসুদ্ধি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলি। সবুজ ঘাস, দ্রুত উড়ে যাওয়া সোয়ালো পাখি, টুকটুকে লাল পপি, ডেইজি, ঘাসের সুগন্ধ—সবকিছু মিলে আমাকে আবেগে উচ্ছল করে তোলে। এ যেন ঠিক অনভ্যস্ত মানুষের কাছে শ্যাম্পেনের নেশার মতো!

'যাই হোক, সেদিন আবহাওয়া ছিলো চমৎকার—উষ্ণ আর উজ্জ্বল। দৃষ্টির সঙ্গে চোখের ভেতর দিয়ে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে মুখের ভেতর দিয়ে সে উষ্ণতা আর সে উজ্জ্বলতা যেন শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। রোজ আর সিমঁ প্রতি মুহূর্তে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছিলো। মঁ্যসিয় ব্যুরেঁ আর আমি ওদের পেছন পেছন হাঁটছিলাম। দুজনের কেউই খুব একটা কথাবার্তা বলছিলাম না। কারণ মানুষ যখন পরস্পরকে তেমন ভালো করে চেনে না, তখন বলার মতো খুব একটা কথাও তারা খুঁজে পায় না।…ওকে ভীরু-ভীরু দেখাচ্ছিলো, ওর বিব্রত লাজুক ভাবসাব দেখতে ভালোই লাগছিলো আমার।

'অবশেষে আমরা ছোট্ট জঙ্গলটাতে গিয়ে ঢুকলাম। জায়গাটা স্নিগ্ধ শীতল, ঠিক যেন সদ্যস্নানের অনুভূতি। চারজনেই বসলাম। রোজ আর তার প্রেমিকটি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে শুরু করলো, কারণ আমাকে খানিকটা কঠোর আর গম্ভীর দেখাচ্ছিলো। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, তখন তা ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিলো না। এতোটুকুও আত্মনিয়ন্ত্রণ না রেখে ওরা তখন আবার চুম্বন আর আলিঙ্গন শুরু করে দিলো, যেন আমরা আদৌ ওখানে নেই। তারপর দুজনে কি যেন ফিসফাস করে, আমাদের একটি কথাও না বলে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে চলে গেলো। সদ্য-পরিচিত এক যুবকের সঙ্গে একেবারে একা ওই পরিবেশে থাকতে আমার তখন কেমন লাগছিলো তা আপনি নিশ্চয়ই কল্পনা করে নিতে পারছেন। আসলে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম, তবু খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে কথাবার্তা বলতে শুরু করলাম। জিগেস করলাম ও কি করে। তাতে ও জানালো, ও একটা কাপড়ের দোকানের সহকারী, যা আমি এক্ষুণি আপনাকে বললাম। কয়েক মিনিট আমরা একসঙ্গে বেড়ালাম। এবং তাতে সাহস পেয়ে ও আমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে চাইলো। কিন্তু আমি তীক্ষ্ণ সুরে বাধা দিয়ে ওকে সামলে থাকতে বললাম। তাই নয় কি, মঁ্যসিয় ব্যুরেঁ?'

মঁ্যসিয় ব্যুরেঁ বিভ্রান্ত হয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন, কোনো

জবাব দিলেন না। মহিলা ফের বলে চললেন, 'তখন ও বুঝলো, আমি সত্যিকারের ভালো মেয়ে এবং একজন সম্মানিত মানুষের মতোই ও তখন সুন্দরভাবে আমাকে ভালোবাসতে শুরু করলো। সেই থেকে প্রতি রোববারই ও আমার কাছে আসতো। কারণ আমাকে ও ভীষণভাবে ভালোবেসে ফেলেছিলো—আর আমিও তাই। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পরের সেপ্টেম্বরেই ও আমাকে বিয়ে করে আর তারপরেই আমরা রু্য দে মারতাসে ব্যবসাটা পেতে বসি।

'কয়েকটা বছর আমাদের কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে, মঁ্যসিয়। ব্যবসাটাতে উন্নতি হচ্ছিল না। গ্রামে বেড়াতে যাওয়া তখন আমাদের সামর্থ্যের মধ্যেই ছিলো না, আর শেষ পর্যন্ত সেটা আমাদের মনেও রইলো না।…ব্যবসাতে নামলে মানুষ ক্যাশবাক্সের কথাই বেশি করে চিন্তা করে। ভালোবাসার কথা যারা খুব একটা চিন্তা করে না, তাদের মতো নিজেদের অজান্তেই বয়েস বাড়ছিলো আমাদের। কিন্তু যতোক্ষণ কেউ লক্ষ্য করে না সে কি হারিয়েছে ততোক্ষণ সেজন্যে তার কোনো দুঃখবোধও থাকে না।

'তারপর ব্যবসাটা একদিন ভালোভাবেই চলতে শুরু করলো, ভবিষ্যতের জন্যে আমাদের আর কোনো ভাবনা রইলো না। অথচ তখন থেকেই আমার কি যে হলো জানি না, সত্যিই জানি না—আমি আবার একটা স্কুলের ছাত্রীর মতো স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। রাস্তায় ফুলের গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাওয়া কোনো ফুলওয়ালাকে দেখলেই আমি চিৎকার করে ডাকতাম। ভায়োলেট ফুলের সুগন্ধ ক্যাশবাক্সের পেছনে আরাম-কুর্সি থেকে আমাকে টেনে তুলতে চাইতো, আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠতো। নীল আকাশ দেখার জন্যে আমি তখন কুর্সি ছেড়ে দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াতাম। রাস্তা থেকে আকাশের দিকে তাকালে মনে হতো, আকাশটা যেন পারীর ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়া একটা আশ্চর্য নদী আর সোয়ালো পাখিগুলো যেন মাছের মতো যাওয়া-আসা করে তার বুক জুড়ে। আমার এ বয়সে এ সমস্ত জিনিস চিন্তা করা একেবারেই বোকামো। কিন্তু সারাটা জীবন যে শুধু কাজই করে গেছে, এ ছাড়া সে আর কি-ই বা করতে পারে, বলুন! জীবনে একটা মুহূর্ত আসে যখন মানুষ অনুভব করে, সে আরও কিছু করতে পারতো। তখন মানুষ দুঃখ করে, দুঃখ পায়—হ্যাঁ, ভীষণ দুঃখ পায়! ভেবে দেখুন, বিশটা বছর আমিও তো অন্যান্য মেয়েদের মতো অরণ্য-পরিবেশে পুরুষের সোহাগ চুম্বন উপভোগ করতে পারতাম! আমি ভাবতাম, গাছের নিচের শরীর এলিয়ে দিয়ে প্রেমিকের সোহাগ অনুভব করা না জানি কতোই মনোরম! দিনরাত আমার মন জুড়ে শুধু ওই একই চিন্তা। নদীর জলে আমি

জ্যোৎস্নাধারার স্বপ্ন দেখতাম, মনে হতো আমি যেন সেই জলে শরীর ডুবিয়ে স্নান করছি।

'প্রথম প্রথম আমি এ সমস্ত কথা ম'্যসিয় বুরেঁকে বলতে ভরসা পেতাম না। জানতাম, ও তাহলে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে—ফের ছুঁচ আর তুলো বিক্কিরি করতে পাঠাবে আমাকে। সত্যি বলতে কি, ও আমার সঙ্গে খুব একটা কথা-বার্তাও বলতো না। আর আরশিতে নিজের দিকে তাকালে আমিও স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, কারুর মনে দোলা দেবার মতো ক্ষমতা আমার আর নেই।

'অবশেষে মনস্থির করে একদিন ফের সেই গ্রামে বেড়াতে যাবার জন্যে আমি ওকে অনুরোধ করলাম, যেখানে প্রথম আমাদের পরিচয় হয়েছিলো। কোনো রকম সন্দেহ না করেই আমার প্রস্তাবে রাজি হলো ও। তারপর আজ সকাল নটা নাগাদ আবার আমরা এখানে এসে পৌছলাম।

'শস্যক্ষেতের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে আমি যেন ফের সেই ছেলেমানুষটি হয়ে গেলাম, দেহে মনে ফিরে এলো কৈশোরের সেই অবুঝ চপলতা—কারণ আপনি তো জানেন, মেয়েদের মনটা কখনই বুড়িয়ে যায় না! স্বামীকে তখন আমি আর এখনকার মতো দেখছিলাম না, দেখছিলাম পুরনো দিনের সেই সুদর্শন যুবকটির মতো। আমি শপথ করে বলছি ম'্যসিয়—এখন আমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা যেমন সত্যি, আমার এই কথাগুলোও ঠিক তাই। আমি যেন নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছিলাম। আমি ওকে চুমু দিতে শুরু করলাম। আমি ওকে খুন করার চেষ্টা করলেও ও বোধহয় অতোটা অবাক হতো না। শুধু বলছিলো, 'এই সকালবেলায় কি হলো তোমার? মাথাটা খারাপ হয়ে গেলো নাকি!' কিন্তু আমি তখন ওর কোনো কথাই শুনছিলাম না, শুনছিলাম শুধু আমার বুকের দ্রিমি দ্রিমি আওয়াজ। ওকে আমি জোর করে জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলাম।...

'এই হচ্ছে আমার কাহিনী, ম'্যসিয় লেমেয়ার। আমি সত্যি কথাই বলেছি, আগাগোড়া সবটুকুই সত্যি।'

মেয়র বিচক্ষণ মানুষ। তিনি কুর্সি ছেড়ে উঠলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'আপনারা নিশ্চিন্ত মনে চলে যান, মাদাম। তবে বনে জঙ্গলে আর কখনও অমন দুষ্কর্ম করবেন না যেন!'

রাশিয়া

ভালোবাসা

আন্তন শেখভ

ছোটোগল্পের 'মুকুটহীন সম্রাট' আন্তন শেখভের জন্ম ১৮৬০ সালে। অসংখ্য ছোটোগল্প ছাড়াও তিনি একাধিক সফল নাটকের রচয়িতা। তাঁর 'সমুদ্রপাখি' (১৮৯৬), 'তিন বোন' (১৯০১) এবং 'জলপাইকুঞ্জ' (১৯০৪) পৃথিবীর প্রায় সবকটি প্রধান ভাষায় অনূদিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে। সমাজসচেতন এই জীবনশিল্পীর মৃত্যু হয় ক্ষয়রোগে, ১৯০৪ সালে।

দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নভোজে ছিলো মাংসের পুর দেওয়া ছোটো ছোটো সুস্বাদু বড়া, বাগদাচিংড়ি আর মাংসের চপ। আমরা যখন খাওয়াদাওয়া করছি তখন প্রধান পাচক নিকানোর ওপর-তলায় এসে জানতে চাইলো, রাত্রিবেলা অতিথিদের কি কি খাওয়ার ইচ্ছে। নিকানোরের উচ্চতা মাঝারি, মুখখানা গোলগাল, চোখ দুটো কুতকুতে। তার গাল দুটো মসৃণভাবে কামানো, কিন্তু ওপরের ঠোঁটটা দেখলে কেমন যেন মনে হয় গোঁফগুলোকে উপড়ে ফেলা হয়েছে।

আলিয়োখিন আমাদের বলেছিলো, বাড়ির সুন্দরী পরিচারিকা পেলাজিয়া এই নিকানোরের প্রেমে পড়েছে। কিন্তু নিকানোরটা পাঁড় মাতাল এবং ভীষণ বদমেজাজী বলে ও তাকে বিয়ে করতে চায় না, তবে এমনি এমনি তার সঙ্গে থাকতে চায়। এদিকে নিকানোর আবার প্রচণ্ড ধার্মিক মানুষ, পাপের মধ্যে সে পেলাজিয়াকে নিয়ে বাস করতে রাজি নয়। সে চায় পেলাজিয়া তাকে বিয়ে করুক আর নয়তো গোল্লায় যাক। মাতাল অবস্থায় পেলাজিয়াকে সে গালমন্দ করে, এমন কি পিটুনিও লাগায়। তাই সে মাতাল হলেই পেলাজিয়া ওপরের ঘরগুলোতে গিয়ে লুকোয় আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। এবং তখন দরকার হলে ওকে রক্ষা করার জন্যে আলিয়োখিন নিজে ও তার অন্যান্য চাকরবাকররা বাড়িতেই থাকে।

আমাদের আলোচনার ধারাটা ভালোবাসার দিকে ঘুরে গেলো।

'ভালোবাসা কেমন করে হয়?' জিগেস করলো আলিয়োখিন। 'নিকানোরকে এখানে সবাই আকাট মূর্খ বলে। রূপে-গুণে নিজের সঙ্গে মানানসই অন্য কোনো পুরুষমানুষকে ভালো না বেসে পেলাজিয়া ওই হতকুচ্ছিত মূর্খটার প্রেমেই বা

পড়লো কেন? অবিশ্যি ভালোবাসার ক্ষেত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে সুখ এবং সেটা নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাই এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব চিরদিন অজানাই থেকে যায় এবং পুরো সমস্যাটাকে যেভাবে খুশি ব্যাখ্যা করা চলে। এখন পর্যন্ত প্রেম সম্পর্কে শুধুমাত্র একটাই অকাট্য সত্য বলা যেতে পারে—প্রেম এক অগাধ রহস্য। এ ছাড়া প্রেম সম্পর্কে আজ অব্দি যা কিছু লেখা বা বলা হয়েছে তা সবই দাবি মাত্র, কোনোটাতেই সব প্রশ্নের জবাব মেলেনি—প্রশ্নগুলো এ যাবৎ অসমাধিতই থেকে গেছে। একটি প্রেমের ঘটনায় যে ব্যাখ্যাটাকে সঠিক বলে মনে হয়, অন্য দশটা ক্ষেত্রে তা কোনো কাজেই আসে না। তাই আমার মতে, এ ব্যাপারে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা না করে প্রতিটা প্রেমের ঘটনাকে আলাদা করে ব্যাখ্যা করাই সবচাইতে ভালো—যেমন ডাক্তাররা বলেন, প্রতিটি রোগীকেই স্বতন্ত্রভাবে চিকিৎসা করা উচিত।'

'একেবারে খাঁটি কথা,' বুরকিন একমত হলো।

'আমরা রুচিশীল রাশিয়ান—যে প্রশ্নগুলোর উত্তর মেলে না সেগুলোর সম্পর্কে আমাদের একটা দুর্বলতা রয়ে গেছে। সাধারণত প্রেমকে গোলাপ ফুল আর নাইটিংগেল পাখি দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে কাব্যিক করে তোলা হয়। কিন্তু আমরা রাশিয়ানরা আমাদের প্রেমকে ওই সমস্ত মারাত্মক প্রশ্নাবলী দিয়েই অলঙ্কৃত করে তুলি এবং তার চাইতেও বড়ো কথা, সবচাইতে কম আকর্ষণীয় প্রেমটিকেই আমরা বরণ করে নিই। ছাত্রজীবনে মস্কোতে আমার একটি বান্ধবী ছিলো। একটি মিষ্টি মহিলা। আমি যতোবার ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরতাম, ও মনে মনে চিন্তা করতো এক পাউণ্ড গোমাংসের দাম কতো এবং আমি ওকে মাসে মাসে কতো করে দেবো। আমরা, পুরুষ মানুষরাও সমান খারাপ। প্রেমে পড়লে আমরা ক্রমাগত নিজেদের প্রশ্ন করে চলি: এটা সম্মান না অসম্মানজনক, বিচক্ষণতা না বোকামো, কি পরিণতি হবে এ প্রেমের এবং এই ধরনের আরও অনেক কিছু। জানি না এটা ভালো কি মন্দ। তবে এটুকু জানি যে এটা বিরক্তি-কর, যন্ত্রণাদায়ক এবং এটা আমাদের অতৃপ্তই রেখে দেয়।'

মনে হলো আলিয়োখিন আমাদের কাছে কোনো একটা কাহিনী বলতে চাইছে এবং এটা তারই প্রস্তাবনা। যারা নিঃসঙ্গ জীবন কাটায় তাদের মন সর্বদাই যেন কি একটা নিদারুণ বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে এবং তারা সানন্দে সেটাকে অন্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে একটু হালকা হতে চায়। শহরে স্রেফ একটু কথা বলার তাগিদে অবিবাহিত মানুষরা প্রায়শই সার্বজনীন স্নানাগার বা রেস্তোরাঁগুলোতে যায় এবং কখনও কখনও নিজেদের সঙ্গে সম্পর্কিত সবচাইতে

আশ্চর্যজনক কাহিনীগুলো সেখানকার পরিচারকদের বলে আসে। গ্রামাঞ্চলে সাধারণত অতিথি-অভ্যাগতদের কাছেই তারা নিজেদের কথা উজাড় করে প্রকাশ করে।...জানলা দিয়ে আমরা বাইরের ধূসর আকাশ আর বৃষ্টি-ভেজা গাছ-গাছালিগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। এমন আবহাওয়ায় কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় এবং নিজের কোনো অভিজ্ঞতার অনুস্মরণ করা কিংবা অন্য কারুর কাহিনী শোনা ছাড়া এ পরিস্থিতিতে করারও কিছু নেই।

'আজ দীর্ঘদিন হয়ে গেলো আমি সফাইনোতে এসে রয়েছি, চাষ-আবাদও করছি।' আলিয়োখিন বলতে শুরু করলো, 'সত্যি বলতে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট শেষ করেই আমি এখানে চলে এসেছিলাম। একজন অলস প্রকৃতির ভদ্রলোক হিসেবে আমি গড়ে উঠেছি এবং মানসিক প্রবণতার দিক দিয়ে আমি আরাম-কুর্সিতে বসে কাজ করার মতো শ্রমিক। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম আমাদের তালুকের অবস্থা খুবই খারাপ। বাবার ঋণের জন্যে আমার ব্যয়বহুল পড়াশুনোটাও খানিকটা দায়ী বলে স্থির করলাম, ওই ঋণ শোধ না করা অব্দি আমি এখান থেকে যাবো না। অতএব সেই প্রতিজ্ঞা নিয়েই আমি কাজে নামলাম—তবে স্বীকার করছি, খানিকটা বিরূপ না হয়ে নয়। এখানকার মাটি ফসল দেয় সামান্যই এবং এখানে মাটির কাছ থেকে ফসল আদায় করে নিতে হলে তোমাকে ভূমিদাস কিংবা ভাড়াটে শ্রমিকদের কাজে লাগাতে হবে অথবা চাষীদের মতো পরিশ্রম করতে হবে—তার মানে পরিবারের সবাইকে নিয়ে ক্ষেতে গিয়ে নামতে হবে। এর মধ্যে মধ্যম-পন্থা বলতে আর কিছু নেই। কিন্তু তখন আমি এ সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়গুলো চিন্তা করে দেখিনি। তাই এক ফালি জমিও আমি ফাঁকা রাখিনি, আশেপাশের গ্রামগঞ্জ থেকে সমস্ত মেয়ে-পুরুষদের ধরে নিয়ে এসে সবাই মিলে পাগলের মতো খেটেছি। নিজেও জমিতে লাঙল দিতাম, বীজ ছড়াতাম, মরাই করতাম। অবিশ্যি একঘেয়েও লাগতো খিদের জ্বালায় সবজি-বাগানে গিয়ে শশা-খাওয়া গ্রাম্য বেড়ালের মতো আমিও তখন মুখ বিকৃত করতাম। সমস্ত শরীর ব্যথায় টনটন করতো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোতাম। প্রথম প্রথম ভাবতাম এই কায়িক পরিশ্রমের জীবনটাকে আমি আমার ভদ্র-সভ্য স্বভাবের সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নিতে পারবো। ভাবতাম, আমাকে শুধুমাত্র যেটুকু করতে হবে তা হচ্ছে খানিকটা বাহ্যিক শোভনতা বজায় রাখা। তাই তখন আমি ওপরের এই সেরা ঘরগুলোতে থাকতাম, দুপুরে আর রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর প্রতিদিন নিয়মিত কফি আর সুরা পান করতাম। আর তা ছাড়া রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে রোজই 'ভেস্তনিক ইউরোপি' পত্রিকাটা পড়তাম। তারপর একদিন আমাদের

পুরোহিত ফাদার ইভান আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমার সবটুকু সুরা উনি এক দফাতেই শেষ করে ফেললেন। আমার পত্রিকাটাও তাঁর মেয়েদের হেফাজতে চলে গেলো। কারণ গ্রীষ্মকালে, বিশেষ করে খড় শুকোবার সময়, নিদারুণ পরিশ্রমে আমি এতো ক্লান্ত হয়ে পড়তাম যে তখন নিজের বিছানাটায় এসেও পৌঁছুতে পারতাম না—গোলাবাড়ি, কোনো স্লেজ বা জঙ্গলের কোনো ঝুপড়িতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। কাজেই তখন আর পড়াশুনো করবোই বা কি? ক্রমশ একটু একটু করে আমি নিচের তলার ঘরগুলোতে নেমে এলাম। এখন চাকরবাকরদের রান্নাঘরেই খাওয়াদাওয়া করি। অতীতের জাঁকজমকের মধ্যে এখন অবশিষ্ট আছে শুধু এই চাকরবাকরগুলো, প্রাণে ধরে ওদের আর আমি জবাব দিতে পারিনি।

'প্রথম দিকের সেই বছরগুলোতেই আমি শান্তিরক্ষার একজন অবৈতনিক বিচারক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলাম। জেলা-আদালতের সভায় যোগ দেবার জন্যে আমাকে তখন প্রায়ই শহরে যেতে হতো। আমার পক্ষে এই পরিবর্তনটা ছিলো ভীষণ মনোরম। একটানা দু-তিন মাস, বিশেষ করে শীতের দিনে, এখানে বন্দী হয়ে থাকার পর তখন নিজের কালো ফ্রক-কোটটা গায়ে চড়াবার জন্যে আমি রীতিমতো আর্তি অনুভব করতাম। জেলা-আদালতে আমাকে ঘিরে থাকতেন আইনজীবীরা, যাঁরা সাধারণ-শিক্ষায় সুশিক্ষিত। তাই সেখানে সদালাপী ভদ্র-লোকের কোনো অভাব ঘটতো না। স্লেজে শুয়ে ঘুমোনো আর চাকরদের রান্নাঘরে বসে খাওয়াদাওয়া করার পর পরিষ্কার জামা আর হালকা জুতো পরে গলায় হার ঝুলিয়ে সেখানে একখানা আরাম কুর্সিতে বসাটা রীতিমতো বিলাসিতা বলে মনে হতো আমার!

'শহরের মানুষরা আমাকে সাদর আতিথ্যের আহ্বান জানাতেন, আমিও নির্দ্বিধায় আলাপ করতাম নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে। সবচাইতে ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়েছিলো জেলা-আদলতের সহ-সভাপতি লুগানোভিচের সঙ্গে। তোমরা দুজনেই তাঁকে চেনো—ভারি চমৎকার মানুষ। সেই কুখ্যাত অগ্নি-সংযোগের মামলাটার শুনানির সময় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। বিচারপর্ব দুদিন ধরে চলছিলো, আমরা সকলেই তখন একেবারে ক্লান্ত। লুগানোভিচ একবার ভালো করে আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'চলুন মশাই, আজ রাত্তিরে আমার বাড়িতেই খেয়ে নেবেন'।

'এটা খানিকটা অপ্রত্যাশিত। কারণ লুগানোভিচের সঙ্গে তখন আমার সামান্য যেটুকু আলাপ তা শুধুমাত্র আদালতের পদাধিকার সূত্রে এবং তাঁর

বাড়িতে আমি আগে আর কখনও যাইনি। স্রেফ এক মিনিটের জন্যে হোটেলে গিয়ে পোশাকটা বদলেই আমি তাঁর বাড়ির দিকে রওনা হলাম এবং সেখানেই লুগানোভিচের স্ত্রী আন্না অ্যালেক্সিয়েভনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলাম। তখন ও খুবই ছেলেমানুষ, কুড়ি-বাইশের বেশি বয়েস নয়। মাস ছয়েক আগেই ওর প্রথম বাচ্চাটা হয়েছে। আজ এর সবটাই অতীত ইতিহাস—ওর মধ্যে কি এমন বৈশিষ্ট্য ছিলো, ওর কোন্ জিনিসটা আমার অতো ভালো লেগেছিলো আজ তা নির্দিষ্ট করে বলা আমার পক্ষে কিছুটা কঠিন। কিন্তু সেদিনের সেই নৈশভোজে আমার কাছে সমস্ত কিছুই ছিলো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। সেদিন আমি দেখেছিলাম একটি অল্পবয়সী সুন্দরী স্নেহময়ী আকর্ষণীয়া এবং সুরুচিসম্পন্না মহিলাকে, তেমনটি আমি আগে আর কখনও দেখিনি। দেখেই মনে হলো ও আমার চেনা, ভীষণ অন্তরঙ্গভাবে চেনা—যেন ওই মুখ আর ওই স্নেহময় বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি আমি আগে কোথাও দেখেছি, দেখেছি আমার শৈশবে, আমার মায়ের দেরাজ-আলমারিতে রাখা ছবির অ্যালবামে।

'সেই অগ্নি-সংযোগের মামলায় চারজন ইহুদিকে দলবদ্ধভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, কিন্তু আমার বিবেচনায় তারা ছিলো নির্দোষ। তাই বিবেকের তাড়নায় নৈশভোজের সময় আমি প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ ছিলাম। কি বলেছিলাম এখন আর তা মনে নেই, তবে আন্না অ্যালেক্সিয়েভনা বারবার মাথা নেড়ে ওর স্বামীকে বলছিলো, 'কিন্তু দমিত্রি, কি করে এমন হয়' ?

'লুগানোভিচ নেহাতই সরল প্রকৃতির মানুষ। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, একবার যে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছে সে নিশ্চয়ই দোষী এবং আদালতের রায় সম্পর্কে বৈধ উপায়ে একমাত্র কাগজ-কলমের মাধ্যমেই সন্দেহ প্রকাশ করা যেতে পারে—নৈশভোজে বা ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার সময় কোনোমতেই তা করা চলে না।

'দেখুন, আপনি বা আমি আগুনটা লাগাইনি', লুগানোভিচ মার্জিত ভঙ্গিতে বললেন। 'তাই আমাদের অভিযুক্তও করা হয়নি বা গারদেও ঢোকানো হয়নি। তাই নয় কি' ?

'ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পান ও ভোজনের জন্যে আমাকে আন্তরিকভাবে পীড়াপীড়ি করছিলো। ছোটোখাটো জিনিস, যেমন ওদের দুজনে মিলে একসঙ্গে কফি তৈরি করা, মুখে কিছু না বললেও পরস্পরের কথা বুঝতে পারা—এ সমস্ত দেখে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম যে ওরা সুখেই আছে এবং একজন অতিথিকে পেয়ে ওরা দুজনেই খুশি হয়েছে। খাওয়াদাওয়ার পর ওরা দুজনে

মিলে পিয়ানোতে দ্বৈতসুর বাজালো। তারপর অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, আমিও বাড়িতে ফিরে গেলাম।

'সেটা ছিলো বসন্তের প্রথম দিক। তারপর পুরো গ্রীষ্মকালটা আমি সফাইনোতেই বন্দী হয়ে রইলাম। এতো ব্যস্ততার মধ্যে তখন আমার দিন কেটেছে যে শহরের কথা ভাবার মতো অবকাশটুকুও আমি পাইনি। কিন্তু হালকা রঙের চুল আর ছিপছিপে চেহারার সেই মেয়েটির স্মৃতি আমার মনের মধ্যে রয়েই গিয়েছিলো। আমি যে সচেতনভাবে ওর কথা ভাবতাম তা কিন্তু নয়—বরং বলা যায়, ওর হালকা ছায়াটা ছড়িয়ে ছিলো আমার সত্তার ওপরে।

'শরতের শেষাশেষি একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্যে শহরে একটা নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। সেখানে বিরতির সময় গভর্নরের আমন্ত্রণে আমি তাঁর বক্সে ঢুকে দেখি, তাঁর স্ত্রীর পাশে বসে রয়েছে আন্না অ্যালেক্সিয়েভনা। দেখামাত্রই ওর রূপের সেই দুর্নিবার জাদু আর ওর সেই শান্ত সুন্দর দুটি চোখ আমাকে আবার আচ্ছন্ন করে ফেললো এবং আগের মতোই আমার ফের মনে হলো, ওর সঙ্গে আমার যেন কতোদিনের কতো ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

'আমি ওর পাশে গিয়ে বসলাম। তারপর বিরতির সময় বিরাম-কক্ষে একসঙ্গে পায়চারি করতে করতে ও আমাকে বললো, 'আপনি কিন্তু রোগা হয়ে গেছেন। কোনো অসুখ করেছিলো নাকি'?

'হ্যাঁ, কাঁধে ঠাণ্ডা লেগেছিলো। বর্ষাকালে যন্ত্রণায় রাতে ঘুমোতে পারতাম না'।

'আপনাকে কেমন যেন ক্লান্ত, অবসন্ন লাগছে। অথচ বসন্তকালে, সেই যেদিন রাত্রিবেলা আমাদের সঙ্গে খেতে এলেন, সেদিন আপনাকে অনেক অল্পবয়সী আর খুশিয়াল লাগছিলো। সেদিন আপনি খুব উত্তেজিত ছিলেন, অনেক কথা বলেছিলেন, ভীষণ আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিলো আপনাকে এবং স্বীকার করছি, সেদিন আমি একটু একটু আপনার প্রেমেও পড়ে গিয়েছিলাম। কেন জানি না, এই পুরো গ্রীষ্মকালটাতে আমার প্রায়ই ঘুরেফিরে আপনার কথা মনে পড়তো। আজও থিয়েটারে আসার জন্যে সাজগোছ করার সময় হঠাৎ কেমন যেন মনে হলো, আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে'।

'ও একটু হাসলো, তারপর ফের বললো, 'কিন্তু আজ আপনাকে ক্লান্ত আর উদাসীন দেখাচ্ছে। তাই মনে হচ্ছে আপনার বয়েসটা যেন বেড়ে গেছে'।

'পরের দিন দুপুরে আমি ওদের বাড়িতে খেতে গেলাম। খাওয়াদাওয়ার পর লুগানোভিচ দম্পতিকে ওদের গ্রামের গ্রীষ্মাবাসে যেতে হবে, কারণ আগামী শীতকালটার জন্যে প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করা দরকার। আমিও ওদের সঙ্গে

গেলাম। শহরে ফিরলামও ওদের সঙ্গে। তারপর মাঝরাতে ওদের বাড়ির শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে বসে চা খেলাম। তাপচুল্লির ঝাঁঝরির মধ্যে তখন আগুন জ্বলছিলো আর তরুণী মা-টি বারবার উঠে গিয়ে দেখে আসছিলো ওর শিশুকন্যাটি ঘুমিয়ে আছে কি না।

'তার পর থেকে শহরে গেলেই আমি লুগানোভিচদের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। এতে আমি যেমন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, ওরাও তেমনি। পরিবারের একজন সদস্যের মতো সাধারণত কিছু না বলে-কয়েই আমি ওদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতাম।

'কে' ? বাড়ির পেছন দিককার কোনো ঘর থেকে এক দীর্ঘায়িত কণ্ঠস্বর ভেসে আসতো, যা ভারি অপরূপ বলে মনে হতো আমার।

'পাভেল কন্সতান্তিনোভিচ', বাড়ির পরিচারিকা বা আয়া জবাব দিতো।

'তখন আন্না অ্যালেক্সিয়েভনা আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসতো এবং উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে অনিবার্যভাবে জিগেস করতো, 'এতোদিন আসেননি কেন ? কিছু হয়েছিলো নাকি' ?

'এবং প্রতিবারই ওর চাহনি, আমার দিকে এগিয়ে দেওয়া ওর সুন্দর ছন্দিল হাত, ওর ঘরোয়া পোশাক, কেশবিন্যাস, কণ্ঠস্বর আর পায়ের শব্দ আমার কাছে কেমন যেন নতুন, বিস্ময়কর এবং আমার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে হতো। আমরা অনেকক্ষণ ধরে গল্পগুজব করতাম কিংবা নিজেদের ভাবনায় মগ্ন হয়ে চুপচাপ বসে থাকতাম। কখনও ও আমাকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতো। লুগানোভিচরা কেউ বাড়িতে না থাকলে আমি অপেক্ষা করতাম—আয়াটির সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম, বাচ্চাটার সঙ্গে খেলতাম, কিংবা পড়ার ঘরের কৌচে শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়তাম। কেনাকাটা সেরে আন্না অ্যালেক্সিয়েভনা যখন ফিরে আসতো আমি হলঘরে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতাম, ওর হাতের সব মোড়কগুলো নিজের হাতে তুলে নিতাম এবং প্রতিবারই কেন জানি না মনে হতো, আমি যেন একটা বাচ্চা ছেলের মতো পরম ভালোবাসায় আর নিবিড় আনন্দে ওর মোড়ক-গুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

'সবাই বলে : মনে যথেষ্ট উদ্বেগ না থাকলে একটি পোষ্য নেবে—তা কখনও বিফল হবে না। লুগানোভিচদের কোনো উদ্বেগ ছিলো না, তাই তারা আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলো। আমি দীর্ঘদিন শহরে না এলেই ওরা মনে করতো, আমি অসুস্থ অথবা আমার একটা কিছু হয়েছে এবং ওরা তাতে ভয়ঙ্কর চিন্তিত হয়ে পড়তো। আমি একটা শিক্ষিত মানুষ, বেশ কয়েকটা বিদেশী ভাষা জানি—কিন্তু

তা সত্ত্বেও বিজ্ঞান অথবা সাহিত্যচর্চায় নিযুক্ত না থেকে আমি যে গ্রামে পড়ে রয়েছি, নিজের দারিদ্র্য দূর করার জন্যে দিনরাত নিদারুণ পরিশ্রম করছি, অথচ কখনই আমার পকেটে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকছে না—এটাও ওদের কাছে উদ্বেগের বিষয় ছিলো। ওদের ধারণা, আমি নিশ্চয়ই অসুখী এবং আমি যে কথাবার্তা বলি, হাসিঠাট্টা করি বা খাওয়াদাওয়া করি তা স্রেফ আমার দুঃখ-বেদনাকে লুকিয়ে রাখার জন্যে। এমন কি একটা নিবিড় আনন্দঘন মুহূর্ত দিব্যি উপভোগ করার সময়েও আমি অনুভব করতাম, ওরা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করছে। যখন সত্যি সত্যি আমি মুশকিলে পড়তাম, পাওনাদাররা আমাকে কোণঠাসা করে ফেলতো, অথবা কোনো জরুরী প্রয়োজনের টাকা হাতে থাকতো না তখন ওদের অবস্থা আরও করুণ হয়ে উঠতো। স্বামী-স্ত্রী দুজনে তখন জানলার কাছে গিয়ে ফিসফিসিয়ে কি সব আলাপ-আলোচনা করতো, তারপর লুগানোভিচ এগিয়ে এসে গম্ভীর মুখে বলতেন :

'শুনুন পাভেল কন্সতান্তিনোভিচ, আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আপনার কাছে মিনতি করে বলছি···এই মুহূর্তে আপনার যদি টাকা-পয়সার প্রয়োজন থাকে তাহলে অহেতুক ভদ্রতার বালাই না রেখে টাকাটা আপনি আমাদের কাছ থেকে ধার নিন'।

'প্রবল কুণ্ঠায় লুগানোভিচের কান দুটো তখন লাল হয়ে উঠতো।

'আবার কখনও কখনও জানলার কাছে স্ত্রীর সঙ্গে নিচু গলায় কথাবার্তা সেরে নিয়ে উনি কান লাল করে আমার খুব কাছাকাছি এগিয়ে এসে বলতেন :

'আমি ও আমার স্ত্রী আপনার কাছে সনির্বন্ধ মিনতি জানাচ্ছি, আপনি আমাদের কাছ থেকে এই সামান্য উপহারটুকু গ্রহণ করুন'।

'তারপর উনি আমাকে একজোড়া হাতের বোতাম, একটা সিগারেট কেস কিংবা একটা টেবিল ল্যাম্প দিতেন এবং তার প্রতিদানে আমিও খামার-বাড়ি থেকে ওদের জন্যে মুরগী, ফুল আর মাখন পাঠিয়ে দিতাম।

'এখানে এসে প্রথম দিকে আমাকে প্রায়ই টাকা ধার করতে হয়েছে—কার কাছ থেকে টাকাটা নিলাম, সেটা আমার কাছে খুব একটা বড়ো কথা ছিলো না। লুগানোভিচরা দুজনেই ছিলো সচ্ছল, অথচ পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি ছিলো না যা ওদের কাছ থেকে আমাকে ধার নেবার জন্যে বাধ্য করতে পারে। অবিশ্যি সেটাই তো স্বাভাবিক!

'আমার তখন খুবই করুণ অবস্থা। ঘরে মাঠে-ঘাটে গোলাবাড়িতে যেখানেই থাকি না কেন, সর্বদাই আমি তখন শুধু আন্নার কথা ভাবতাম। ওই সুন্দরী

অল্পবয়সী বুদ্ধিমতী মেয়েটি—যে স্রেফ সাদামাঠা, প্রায় ভীমরতিগ্রস্ত (লুগানোভিচের বয়স চল্লিশের ওপরে) একটা মানুষকে বিয়ে করেছে এবং তার সন্তান ধারণ করেছে—আমি তার রহস্যের তল খুঁজে পাবার চেষ্টা করতাম। বুঝতে চেষ্টা করতাম ওই আকর্ষণহীন সরল হৃদয় ভালোমানুষটির রহস্য—যার বিচারবুদ্ধিতে শুধু একঘেয়ে বিচক্ষণতা, নাচের আসরে যিনি অনেকটা বিক্রির জন্যে নিয়ে আসা মেষের মতো মুখে একটা নির্বিকার বিনত অভিব্যক্তি নিয়ে রাশভারী বয়স্ক লোকদের সঙ্গে সর্বদা উদ্দীপনাবিহীন ফালতু মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন—অথচ সুখী হবার এবং আন্নার সন্তানদের জনক হবার ব্যাপারে নিজের অধিকার সম্পর্কে যে মানুষটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসী! সর্বক্ষণ আমি শুধু ভাবতাম আন্নার সঙ্গে প্রথমে কেন লুগানোভিচের দেখা হলো, আমার সঙ্গে কেন হলো না, কেন এমন একটা ভয়ঙ্কর ভুল ঘটে গেলো আমাদের জীবনে!

'যতোবার শহরে এসে আমি আন্নার সঙ্গে দেখা করতে গেছি, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছি ও আমার জন্যেই প্রতীক্ষা করছিলো। একবার ও নিজেই স্বীকার করেছিলো, সকাল থেকেই ওর কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়—তখন বুঝতে পারে আমি আসবো। আমরা অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলতাম, বহুক্ষণ একটানা চুপ করে বসে থাকতাম, কিন্তু কক্ষণো আমাদের ভালোবাসার কথা পরস্পরের কাছে ভাষায় প্রকাশ করতাম না—বরং ভীরুর মতো, নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে তাকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করতাম। যা কিছু আমাদের এই গোপন রহস্যটুকুকে প্রকাশ করে দিতে পারে, তার সমস্ত কিছুকেই আমরা ভয় পেতাম। ওকে আমি ভীষণ গভীরভাবে—বড়ো নিবিড় করে ভালোবাসতাম। কিন্তু তবু নিজেকে আমি যুক্তি দিয়ে বোঝাতাম···বারবার নিজেকে প্রশ্ন করতাম, যদি আমরা লড়াই করার শক্তি হারিয়ে ফেলি তবে কি পরিণতি হবে আমাদের এ প্রেমের? আমার এই শান্ত ঐকান্তিক ভালোবাসা একদিন আচমকা নিষ্ঠুরের মতো ওর স্বামী আর সন্তানের সুখময় জীবনধারাকে তছনছ করে দেবে, ভেঙে ফেলবে ওদের গোটা সংসারটাকে—যে সংসারটার কাছে আমি এতো প্রিয়, এতো বিশ্বস্ত—এ আমি কল্পনাও করতে পারতাম না। তাছাড়া সেটা কি ঠিক হবে? ও কি আমার সঙ্গে চলে আসবে? কিন্তু কোথায় আসবে? ওকে আমি কোথায় নিয়ে যাবো? আমার জীবনটা যদি সুন্দর ও আকর্ষণীয় হতো, আমি যদি স্বদেশের মুক্তির জন্যে সংগ্রামরত থাকতাম, কিংবা ধরা যাক আমি যদি কোনো বিখ্যাত পণ্ডিত, অভিনেতা অথবা চিত্রশিল্পী হতাম—তাহলে ব্যাপারটা অন্য রকম হতো। কিন্তু আমি এসবের কিছুই নই! কাজেই আমি

তো নীরস একটা জীবন থেকে ওকে স্রেফ অন্য একটা একঘেয়ে ক্লান্তিকর জীবনে —কিংবা হয়তো তার চাইতেও জঘন্য কোনো পরিস্থিতিতে—নিয়ে গিয়ে ফেলবো! তারপর কতোদিন স্থায়ী হবে আমাদের সুখ? আমি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি, মারা যাই, কিংবা আমাদের পারস্পরিক ভালোবাসাটাই যদি হারিয়ে যায় তাহলে কি হবে আন্নার?

'আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, আন্নাও ঠিক ওই ভাবেই ভাবতো। ও ভাবতো ওর স্বামী, ওর সন্তান আর ওর মায়ের কথা, যিনি আন্নার স্বামীকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতেন। ওকে যদি নিজের অনুভূতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় তাহলে হয় ওকে মিথ্যে কথা বলতে হবে, আর নয়তো সত্যি কথা—এবং ওর যা পারস্থিতি তাতে দুটোই সমান ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনক। দুটো প্রশ্ন ওকেও সর্বদা বিক্ষত করতো। ও শুধু ভাবতো, ওর প্রেম কি আমাকে সুখী করতে পারবে? এমনিতেই আমার জীবনটা সমস্ত রকমের দুর্ভাগ্যে ভারাক্রান্ত—এর মধ্যে ওর প্রেম আমার জীবনটাকে আরও জটিল করে তুলবে না তো? ও মনে করতো, ও আর ততোটা তরুণী নয় এবং নতুন করে জীবন শুরু করার মতো যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনাও ওর আর নেই। তাই প্রায়ই ও স্বামীকে বলতো, আমার একটি চালাক-চতুর, যোগ্য মেয়েকে বিয়ে করা উচিত যে সুগৃহিণী হবে এবং আমাকে সাহায্য করতে পারবে। সেই সঙ্গে ও একথাটাও যোগ করে দিতো যে সারা শহরে তেমন মেয়ে একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

'ইতিমধ্যে কয়েকটা বছর গড়িয়ে গেছে। আন্না অ্যালেক্সিয়েভনার তখন দুটি সন্তান। আমি ওদের বাড়িতে গেলেই চাকরবাকরেরা আন্তরিক ভঙ্গিতে হেসে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতো, বাচ্চারা 'পাভেল কাকু এসেছে' বলে চিৎকার করে ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরতো। সবাই খুশি হতো এবং মনে করতো আমিও খুশি হয়েছি। কিন্তু আমার মনের মধ্যে তখন যে কি হতো তা কেউই জানতো না। সবাই আমাকে একজন সম্মানিত মানুষ বলে মনে করতো। ছোটো-বড়ো সকলেই মনে করতো, একটি ন্যায়পরায়ণ মানুষ ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে এবং তার ফলে আমার প্রতি তাদের ব্যবহারে একটা বিশেষ মাধুর্য ফুটে উঠতো—যেন আমার উপস্থিতিতে তাদের জীবন আরও পবিত্র, আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে আমি আর আন্না অ্যালেক্সিয়েভনা থিয়েটারে যেতাম—সর্বদা হেঁটেই যেতাম। সেখানে আমরা দুজনে পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ ছুঁইয়ে বসতাম। মুখে কিছু না বলে আমি ওর হাত থেকে অপেরা-গ্লাসটা তুলে নিতাম। এবং সেই সব মুহূর্তে মনে হতো ও আমার কতো কাছের···মনে হতো ও

আমার, শুধু আমার…মনে হতো পরস্পরকে ছাড়া আমরা কেউই বাঁচতে পারবো না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, থিয়েটার থেকে যখন বেরিয়ে আসতাম তখন পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে আমরা দুটি অপরিচিত মানুষের মতোই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতাম। ততোদিনে আমাদের নিয়ে শহরে নানান কথা উঠেছে। কিন্তু সেই সমস্ত মারাত্মক কথাবার্তার মধ্যে একটি বর্ণও সত্যি ছিলো না।

'শেষের বছরগুলোতে আন্না অ্যালেক্সিয়েভনা মাঝে মাঝেই মা বা বোনের কাছে গিয়ে থাকা শুরু করেছিলো। প্রায়ই ও মেজাজ খারাপ করতো, কারণ ও বুঝতে পেরে গিয়েছিলো ওর জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে—অতৃপ্তই থেকে যাবে ওর বাকি জীবনটা। স্বামী বা সন্তানদের যত্নআত্তিও করতে চাইতো না। ততোদিনে ওর স্নায়ুগুলোর জন্যে চিকিৎসা চলছে।

'কিন্তু আমরা আগে যেমন কিছু বলিনি, তখনও পরস্পরকে কিছু বলতাম না। অন্যের উপস্থিতিতে ও তখন আমার সঙ্গে অদ্ভুত খিটখিটে ব্যবহার করতো। আমি যা-ই বলি না কেন, ও তার বিরোধিতা করতো। আমি যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করলে ও অনিবার্যভাবে আমার প্রতিপক্ষকে সমর্থন করতো। আমার হাত থেকে কিছু পড়ে গেলে ও হিমকণ্ঠে বলতো, 'চমৎকার'! থিয়েটারে আমি নিজের অপেরা গ্লাসটা নিতে ভুলে গেলে, ও সুনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলতো, 'আমি জানতাম তুমি কিছু না কিছু ভুলে যাবে'।

'সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের জীবনে এমন কিছু নেই যা কোনোদিনও শেষ হয় না। পশ্চিমের একটা প্রদেশে লুগানোভিচ সভাপতি নিযুক্ত হলেন, তাই আমাদের বিচ্ছেদের ক্ষণও ঘনিয়ে এলো। যাবার আগে ওদের আসবাবপত্র, ঘোড়াগুলো এবং গ্রীষ্মাবাসটা বিক্রি করে যেতে হবে। ওদের সঙ্গে আমিও ওদের গ্রীষ্মাবাসে গেলাম। চলে আসার সময় শেষবারের মতো ওই বাগান আর সবুজ ছাদটা দেখার জন্যে আমরা বারবার শুধু পেছনে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলাম। সকলেরই মন খারাপ লাগছিলো এবং আমি অনুভব করছিলাম, আমরা শুধু ওই গ্রীষ্মাবাসটাকেই বিদায় জানাচ্ছি না। যাই হোক, ঠিক হলো ডাক্তারের নির্দেশ মতো আন্না অ্যালেক্সিয়েভনা আগস্টের শেষাশেষি ক্রিমিয়ায় চলে যাবে এবং কয়েক-দিন বাদেই বাচ্চাদের নিয়ে লুগানোভিচ তার সেই পশ্চিম-প্রদেশে রওনা হবে।

'আন্না অ্যালেক্সিয়েভনাকে বিদায় জানাতে বহু লোক হাজির হয়েছিলো। ও স্বামী আর বাচ্চাদের বিদায় চুম্বন দিয়েছে, ট্রেনটা ছাড়তে আর মাত্র এক মুহূর্ত বাকি—এমন সময় ওর ফেলে যাওয়া ছোট্ট একটা ঝুড়ি তুলে দিতে আমি তাড়াতাড়ি ওর কামরায় গিয়ে উঠলাম। ঝুড়িটা তুলে দেওয়া ছাড়াও ওকে

আমার বিদায় জানাতে হবে। সেখানে, সেই ট্রেনের কামরায়, আমাদের পরস্পরের দৃষ্টি মিলিত হলো। আমি ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলাম, ও আমার বুকে নিজের মুখটা চেপে ধরে কেঁদে ফেললো। আমি ওর মুখে, ওর কাঁধে, ওর অশ্রুসিক্ত হাত দুটিতে চুমু দিলাম।...ওহ, তখন সে যে কি দুর্বিষহ মর্মান্তিক অবস্থা আমাদের!...আমি বললাম, আমি ওকে ভালোবাসি এবং বুকের মধ্যে একটা দুঃসহ তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা নিয়ে সেই প্রথম আমি অনুভব করলাম, আমাদের প্রেমের পথে যে যুক্তি বিচারগুলো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো সেগুলো কতো ছোটো, কতো অর্থহীন, কতো প্রবঞ্চনাময়। বুঝতে পারলাম, কাউকে ভালোবাসলে নিজের প্রেম সম্পর্কিত বিচার-বিবেচনাগুলোকে উঁচুর দিক থেকে—চলতি অর্থে যেগুলোকে সুখ-দুঃখ বা পাপ-পুণ্য বলা হয় তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে—দেখতে শুরু করতে হয় আর নয়তো আদৌ কোনো যুক্তি-বিচার করতে হয় না।

'শেষবারের মতো আমি ওকে চুমু দিলাম, ওর হাতখানা একটু চেপে ধরলাম, তারপর চিরদিনের মতো দুজন দুজনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম।

'ট্রেনটা ততোক্ষণে চলতে শুরু করেছে। আমি পাশের কামরাটাতে চলে গেলাম—সেখানে কেউ ছিলো না—সেখানে বসে বসে আমি কাঁদলাম এবং পরের স্টেশনটা আসতেই ট্রেন থেকে নেমে পায়ে হেঁটে সফাইনোতে ফিরে গেলাম!'

আলিয়োখিন কাহিনীটি বলতে বলতেই বৃষ্টি থেমে গিয়েছিলো, মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছিলো সূর্যটা। বুরকিন আর ইভান ইভানোভিচ বাইরের ঝুল-বারান্দাটায় গিয়ে দাঁড়ালো। বাইরে তখন বাগান আর রোদে আরশির মতো ঝিলমিলিয়ে ওঠা নদীর অপরূপ দৃশ্য। মুগ্ধ দৃষ্টিতে দৃশ্যটা দেখতে দেখতেও ওরা আলিয়োখিনের কথা ভাবছিলো। ভাবছিলো, সদয় আর বুদ্ধিদীপ্ত চোখের ওই মানুষটি—যে এতোক্ষণ এমন অকপট ভঙ্গিতে নিজের জীবনের একটা কাহিনী তাদের শোনালো—সে যে এই বিশাল তালুকটা নিয়ে খেটে মরছে, এটা খুবই দুঃখের বিষয়। এর চাইতে মানুষটা যদি বিজ্ঞান বা অন্য কোনো বিষয়ে যুক্ত থাকতো তাহলে তার জীবনটা অনেক বেশি মনোরম হয়ে উঠতো। ওরা আরও ভাবছিলো, ট্রেনের কামরায় মানুষটা যখন আন্না অ্যালেক্সিয়েভনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলো, ওর মুখে আর কাঁধে চুমু দিচ্ছিলো তখন না জানি কেমন বেদনাবিধুর হয়ে উঠেছিলো ওই তরুণীর মুখখানি। ওরা দুজনেই আন্নাকে শহরে দেখেছে—সত্যি বলতে কি বুরকিনের সঙ্গে ওর পরিচয়ও আছে এবং বুরকিন ওকে সুন্দরী বলেই মনে করে।

তৃষ্ণা

উইলিয়াম সমারসেট মম

জন্ম ১৮৭৪ সালে ফ্রান্সের পারী শহরে, শিক্ষা ক্যান্টারবেরির কিংস স্কুল ও জার্মানীর হাইডেলবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৮৯৭ সালে প্রথম উপন্যাস 'লিজা অফ ল্যামবেথ্' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রসিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথম ধ্রুপদী উপন্যাস 'অফ হিউম্যান বণ্ডেজ' প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। এরপর ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয় 'দ্য মুন অ্যাণ্ড দ্য সিক্স পেন্স'। উপন্যাস ছাড়াও অসংখ্য সফল ছোটোগল্প লিখেছেন। মৃত্যু ১৯৬৫ সালে।

পাতলুনের পকেটে হাত গুঁজে বহু কষ্টে বড়োসড়ো একটা রুপোর ঘড়ি বের করে আনলো ক্যাপটেন। কষ্ট হবার কারণ—পকেট দুটো পাতলুনের পাশের দিকে নয়, সামনের দিকে এবং ক্যাপটেন মোটাসোটা মানুষ। ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে ফের অস্তমুখী সূর্যের দিকে তাকালো সে। জাহাজের চাকার সামনে বসে থাকা ক্যানাকাটা এক ঝলক তার দিকে তাকালো, কিন্তু কোনো কথা বললো না। ক্যাপটেনের দৃষ্টি ক্রমশ এগিয়ে আসা দ্বীপটার দিকে স্থির। জলের ওপরে মাথা তুলে রাখা শৈলশ্রেণীর ধার ঘেঁষে সফেন-সমুদ্রের একটা শুভ্র রেখা। ক্যাপটেন জানে, জাহাজটাকে ভেতরে নিয়ে যাবার মতো যথেষ্ট বড়োসড়ো একটা মুখ ওখানে আছে এবং সে আশা করছে, আর একটু কাছে এগুলেই সেটা দেখতে পাওয়া যাবে। দিনের আলো এখনও প্রায় ঘণ্টাখানেকের মতো আছে। উপহ্রদটায় গভীর জল, সেখানে ওরা স্বচ্ছন্দে নোঙর ফেলতে পারবে। নারকেল গাছগুলোর ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে এখনই যে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে, তার মোড়ল জাহাজের মেটের বন্ধু। রাতের মতো ডাঙায় যেতে পারলে দেদার মজা হবে। ভাবতে ভাবতেই মেট সামনে এগিয়ে এলো, ক্যাপটেন ঘুরে দাঁড়ালো তার দিকে।

'আমরা এক বোতল মাল নিয়ে যাবো আর নাচার জন্যে কয়েকটা ছুকড়িকে জুটিয়ে নেবো।'

'কিন্তু ভেতরে ঢোকার মুখটাই তো দেখতে পাচ্ছি না,' মেট বললো।

মেট একটি সুদর্শন ক্যানাকা, গায়ের রঙ শ্যামলা, চেহারার আদল অনেকটা যেন শেষ যুগের রোমক সম্রাটদের মতো—বলিষ্ঠতার দিক ঘেঁষা, কিন্তু চোখ-মুখ তীক্ষ্ণ ও কাটাকাটা।

'আমি একেবারে স্থির নিশ্চিত, ঠিক এখানেই একটা মুখ আছে।' দূরবীনে চোখ রেখে ক্যাপটেন বললো, 'বুঝতে পারছি না, কেন সেটা চোখে পড়ছে না। একটা ছোঁড়াকে মাস্তুলে তুলে দাও, তাকিয়ে দেখুক।'

একটা খালাসিকে ডেকে হুকুম দিলো মেট। ক্যাপটেন দেখলো, ক্যানাকাটা ওপরে উঠে গেলো। তার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করে রইলো ক্যাপটেন। কিন্তু লোকটা নিচের দিকে চিৎকার করে জানালো, ফেনার অভগ্ন রেখাটা ছাড়া সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ক্যাপটেন দেশীয় লোকদের মতোই স্যামোয়া ভাষায় কথা বলে। লোকটাকে সে ইচ্ছেমতো খিস্তিখাস্তা করলো।

'ও কি ওই ওপরেই থাকবে?' মেট জিগেস করলো।

'তাতে কোন্ কম্মটা হবে? হতচ্ছাড়া দরকারী জিনিস কিছুই দেখতে পায় না।' ক্যাপটেন বললো, 'আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, ওপরে গেলে আমি মুখটা ঠিকই দেখতে পেতাম।'

ছিপছিপে মাস্তুলটার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো ক্যাপটেন। আজীবন নারকেল গাছে চড়ে অভ্যস্ত স্থানীয় লোকদের পক্ষে ওখানে ওঠা খুবই সহজ, কিন্তু সে নিজে মোটা আর ভারি।

'নেমে আয়,' ক্যাপটেন চিৎকার করে বললো। 'তুই একটা মরা কুত্তার চাইতে বেশি কাজের নোস। যতোক্ষণ মুখটার হদিশ না পাচ্ছি, ততোক্ষণ ওই ডুবো-পাহাড়গুলোর ধার ঘেঁষে আমাদের যেতে হবে।'

জাহাজটা সত্তর টনি একটা স্কুনার, খনিজ তেলে চলে, অনুকূল বাতাস না থাকলে এর গতি ঘণ্টায় চার-পাঁচ মাইল। চেহারাটা একেবারে লুঝঝুরে মার্কা। বহুকাল আগে একবার সাদা রঙ করা হয়েছিলো, কিন্তু এখন নোংরা মলিন চিত্র-বিচিত্র অবস্থা। সর্বত্র খনিজ তেল আর নারকেলের শুকনো শাঁসের তীব্র গন্ধ। ডুবো-পাহাড়গুলোর একশো ফুটের মধ্যে এসে, খোলা মুখটা না পাওয়া অব্দি চালককে ওই পাহাড়-পাঁচিল বরাবর জাহাজ চালাবার হুকুম দিলো ক্যাপটেন। কিন্তু বেশ কয়েক মাইল যাবার পরে বোঝা গেলো, জায়গাটা তারা ফেলে এসেছে। জাহাজটা আবার আস্তে আস্তে পেছনের দিকে চললো। কিন্তু পাহাড়-পাঁচিল বরাবর ফেনার শুভ্র রেখাটা চলেছে তো চলেইছে। ওদিকে সূর্য অস্তে যেতে বসেছে। নাবিকদের বোকামোর জন্যে গালাগাল করতে করতে ক্যাপটেন অগত্যা পরদিন সকাল অব্দি অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো।

'জাহাজটাকে একটু পেছনে নিয়ে চলো,' ক্যাপটেন বললো, 'এখানে নোঙর করা যাবে না।'

খোলা দরিয়ার দিকে একটুখানি এগিয়ে গেলো ওরা। দেখতে দেখতে চারদিক বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। নোঙর ফেলা হলো। পাল গুটিয়ে নিতেই দারুণভাবে দুলতে শুরু করলো জাহাজটা। অ্যাপিয়ায় সবাই বলাবলি করে, এমনিভাবে দুলতে দুলতেই একদিন ওটা পুরো উলটে যাবে। জাহাজের মালিক আধা জার্মান আধা অ্যামেরিকান, বিরাট একটা দোকানের মালিক। তার মতে, কোনো দামই জাহাজটাকে বেচে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

চীনা পাচক এসে জানালো, রাতের খানা তৈরি। লোকটা ভীষণ নোংরা, রুক্ষ চেহারা, পরনে সাদা পাতলুন আর সাদা পাতলা টিউনিক। ক্যাপটেন কেবিনে গিয়ে ত্যাখে, এঞ্জিনিয়ার ততোক্ষণে টেবিলে এসে বসে পড়েছে। লোকটা লম্বা, রোগা, ঘাড়টা লিকলিকে সরু, পরনে নীল অঙ্গাবরণ আর হাতকাটা জামা—ফলে দেখা যাচ্ছে, ওর রোগা হাত দুটোতে কনুই থেকে কব্জি অব্দি উল্কির ছাপ।

'খোলা দরিয়ায় এভাবে রাত কাটানো—জঘন্য!' ক্যাপটেন বললো।

এঞ্জিনিয়ার কোনো জবাব দিলো না, নিঃশব্দে খেতে লাগলো দুজনে। কেবিনে একটা তেলের বাতির মিটমিটে আলো। টিনে রাখা এপ্রিকট ফল দিয়ে খানা শেষ করার পর চীনেটা ওদের জন্যে চা নিয়ে এলো। ক্যাপটেন একটা চুরুট ধরিয়ে ওপরের ডেকে চলে এলো। রাতের পটভূমিকায় দ্বীপটা এখন স্রেফ গাঢ়তর অন্ধকারের একটা স্তূপ মাত্র। ঝলমল করছে আকাশের তারাগুলো। শব্দ বলতে শুধুমাত্র সমুদ্র-ঢেউয়ের অবিরাম ভেঙে পড়া। ডেকচেয়ারে গা ডুবিয়ে বসে অলস ভঙ্গিমায় ধূমপান করছিলো ক্যাপটেন। সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও তিন-চারজন নাবিক ওপরের ডেকে এসে বসলো। তাদের মধ্যে একজনের হাতে একটা ব্যাঞ্জো, আর একজনের কাছে কনসার্টিনা। তারা বাজাতে শুরু করলো, আর একজন গান ধরলো। এখানকার লোকসংগীতের সুর অদ্ভুত শোনাচ্ছিলো ওই যন্ত্রগুলোতে। তারপর গাইতে গাইতে দুজন উঠে নাচ জুড়ে দিলো। ক্ষিপ্রভঙ্গিতে হাত-পা ছুঁড়ে শরীর মুচড়ে সে এক আদিম বর্বর প্রাগৈতিহাসিক নাচ। সে নাচ ইন্দ্রিয়গত, এমন কি যৌনতাময়ও বটে—কিন্তু আবেগ-উচ্ছ্বাসবিহীন যৌনতা। সে নাচ একেবারেই পশুদের মতো, সরাসরি। রহস্যবিহীন অথচ অপার্থিব! সংক্ষেপে বলা যায়, অকৃত্রিম। প্রায় শিশুর মতোও বলা চলে। অবশেষে ওরা ক্লান্ত হয়ে ডেকের ওপরেই হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। ক্যাপটেন এবারে তার ভারি শরীর নিয়ে কুর্সি ছেড়ে উঠে, সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামলো। তারপর নিজের কেবিনে ঢুকে পোশাক ছেড়ে, বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়লো। রাতের গরমে একটু হাঁসফাঁস করতে হলো তাকে।

পরদিন সকালে উষা যখন শান্ত সমুদ্রে নেমে এলো, তখন পাহাড়-পাঁচিলের যে ফোকরটা আগের দিন বারবার ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, সেটা খানিকটা পুবদিকে ফুটে উঠতে দেখা গেলো। উপদ্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়লো স্কুনারটা। জলের বুকে সামান্য তরঙ্গটুকুও নেই। অনেক নিচে প্রবাল পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছোটো ছোটো রঙিন মাছের সাঁতার কাটাও স্পষ্ট দেখা যায়। নোঙর ফেলে, প্রাতরাশ সেরে ক্যাপটেন ডেকে এলো। নির্মেঘ আকাশে ঝলমল করছে সূর্যটা, কিন্তু ভোরের বাতাস ভারি স্নিগ্ধ আর ঠাণ্ডা। দিনটা রোববার। চারদিকে কেমন একটা শান্তিময় পরিবেশ,কেমন একটা আশ্চর্য নীরবতা—যেন প্রকৃতি নিজেও ছুটি উপভোগ করছে। সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলো ক্যাপটেন। কুর্সিতে বসে, বনময় তীরভূমির দিকে তাকিয়ে নিজেকে অলস আর শিথিল বলে মনে হলো তার। পরক্ষণেই এক চিলতে মৃদু হাসি তার ঠোঁট দুটিতে ফুটে উঠলো। চুরুটের শেষাংশটুকু জলে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে, 'পারে যাবো। নৌকো নামাও।'

মই বেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নেমে এলো ক্যাপটেন। দাঁড় বেয়ে তাকে ছোট্ট একটা খাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। নারকেল গাছগুলো জলের ধার অব্দি নেমে এসেছে। সারিবদ্ধভাবে নয়—এসেছে খানিকটা জায়গা ছেড়ে ছেড়ে, যেন কোনো নির্দেশিত রীতি অনুসারে। ওরা যেন একদল অবিবাহিতা নারী—বয়স্কা অথচ বাচাল—দাঁড়িয়ে রয়েছে বিগত বয়সের ঠমক দেখানোর ভঙ্গিমায়। গাছগুলোর ভেতর দিয়ে একেবেঁকে চলে যাওয়া রাস্তাটা ধরে অলস গতিতে এগিয়ে খানিকক্ষণের মধ্যেই ক্যাপটেন একটা চওড়া খাঁড়ির কাছে পৌছে গেলো। খাঁড়ির ওপরে একটা সাঁকো। কিন্তু সাঁকোটা তৈরি করা হয়েছে কতকগুলো নারকেল গাছের গুঁড়ি লম্বালম্বিভাবে ফেলে। জোড়ের মুখগুলোতে একটা করে আঁকশিসুদ্ধ ডাল খাঁড়ির বুকে পুঁতে দিয়ে সাঁকোটার ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে। ওটার ওপর দিয়ে যাওয়া মানে একটা মসৃণ, গোল, সংকীর্ণ এবং পিছল পথ ধরে যাওয়া। হাত দিয়ে ধরার মতোও কিছু নেই ওখানে। ক্যাপটেন ইতস্তত করতে লাগলো। কিন্তু খাঁড়ির ওধারে গাছগাছালির মাঝখানে একজন শ্বেতাঙ্গের বাড়ি রয়েছে দেখে সে মনস্থির করে ফেললো। তারপর এগুতে লাগলো আস্তেসুস্থে। সাবধানে পা ফেলছিলো ক্যাপটেন। জোড়ের মুখগুলোতে একটু উঁচু-নিচু থাকায় সামান্য টলমল করছিলো সে। শেষ গুঁড়িটাতে পৌছে এবং অবশেষে শক্ত মাটিতে পা ফেলে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। এই কঠিন পারাপারে সে এতোই একাগ্র ছিলো যে খেয়ালই করেনি, এতোক্ষণ ধরে কেউ তাকে লক্ষ্য করছিলো। তাই তাকে উদ্দেশ করে বলা কথাগুলো শুনে সে অবাক হয়ে গেলো।

'অভ্যেস না থাকলে, এ ধরনের সাঁকো পেরোতে রীতিমতো সাহসের দরকার হয়।'

চোখ তুলে ক্যাপটেন দেখলো, একটা লোক তার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, ওই বাড়িটা থেকেই সে বেরিয়ে এসেছে।

'দেখছিলাম আপনি ইতস্তত করছেন।' ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে লোকটা বললো, 'লক্ষ্য রাখছিলাম, আপনি পড়ে যান কি না।'

ক্যাপটেন এতোক্ষণে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। বললো, 'অতো সস্তা নয়।'

'আগে আগে আমি নিজেও পড়েছি। মনে আছে, একদিন সন্ধ্যাবেলা শিকার করে ফিরছি—বন্দুকটন্দুক নিয়ে পড়ে গেলাম! এখন বন্দুক বইবার জন্যে একটি ছেলেকে রেখেছি।'

লোকটা এখন আর যুবকটি নেই। মুখে ছোট্ট একটু দাড়ি, অধিকাংশই পাকা। মুখখানা কৃশ। গায়ে একটা হাতকাটা ফতুয়া, পরনে পাতলা কাপড়ের পাতলুন। পায়ে মোজা বা জুতো কিছুই নেই।

'আপনিই কি নীলসন?' জিগেস করলো ক্যাপটেন।

'হ্যাঁ, আমি।'

'আমি আপনার কথা শুনেছি। বুঝতে পেরেছিলাম, এখানেই আশেপাশে কোথাও থাকেন।'

লোকটাকে অনুসরণ করে ছোট্ট বাংলোটাতে গিয়ে ঢুকলো ক্যাপটেন, তারপর গৃহস্বামীর দেখানো কুর্সিটাতে বসে পড়লো ধপ করে। নীলসন হুইস্কি আর গ্লাস আনতে বেরিয়ে গেলো। সেই অবসরে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে ক্যাপটেন বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে উঠলো। এতো বই সে জীবনে কখনও দেখেনি। চারদিকের দেয়ালেই মেঝে থেকে ছাদ অব্দি তাক উঠে গেছে আর সেগুলো সবই বইয়ে ঠাসা। বিশাল একটা পিয়ানো। মস্ত বড়ো একটা টেবিলের ওপরে অজস্র বই আর সাময়িক পত্রিকা এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। ঘরটা ক্যাপটেনকে অস্বস্তিতে ভরিয়ে তুললো। সে শুনেছিলো, নীলসন লোকটা অদ্ভুত। বহু বছর ধরে ওই দ্বীপে থাকা সত্ত্বেও কেউই তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। কিন্তু যারা চেনে তারা এ বিষয়ে একমত যে লোকটা অদ্ভুত। ওর দেশ সুইডেনে।

'আপনার এখানে তো দেখছি গাদাগুচ্ছের বই,' নীলসন ঘরে আসার পর ক্যাপটেন বললো।

'ওরা কোনো ক্ষতি করে না,' নীলসন মৃদু হাসলো।

'সবগুলো পড়েছেন?'

'অধিকাংশই।'

'আমি নিজেও একটু-আধটু পড়াশুনো করি। স্যাটারডে ইভনিং পোস্টটা নিয়মিত আনাই।'

নীলসন অতিথিকে কড়া করে এক গ্লাস হুইস্কি আর একটা চুরুট দিলো। ক্যাপটেন নিজে থেকে যেচে তাকে সামান্য কিছু খবরাখবর দিলো।

'আমি গতকাল রাত্রে এখানে এসেছি। কিন্তু ভেতরে আসার খোলা-মুখটা খুঁজে না পাওয়ায় বাইরেই নোঙর ফেলতে হয়েছিলো। আগে আমি কোনোদিন জাহাজ নিয়ে এদিকে আসিনি। কিন্তু আমার লোকজন কিছু মালপত্র এখানে আনতে চাইছিলো, তাই···আচ্ছা, গ্রে বলে এখানে কাউকে চেনেন?'

'হ্যাঁ, তার একটা দোকান আছে। এই তো, একটু এগিয়েই।'

'তার ফরমাশ মতো কিছু টিনে রাখা খাবার নিয়ে আসা হয়েছে। আর তার কাছে বিক্কিরি করার মতো আছে নারকেলের কিছু শুকনো শাঁস। অ্যাপিয়ায় শুয়ে-বসে সময় কাটানোর চাইতে আমার লোকেরা এখানে চলে আসাই ভালো বলে সাব্যস্ত করলো। আমি বেশির ভাগ সময়ে অ্যাপিয়া আর প্যাগো-প্যাগোর মধ্যেই জাহাজ নিয়ে যাতায়াত করি। কিন্তু অ্যাপিয়ায় এখন ভীষণ বসন্ত হচ্ছে, কাজকর্ম কিছু হচ্ছে না।'

হুইস্কিতে একটা চুমুক দিয়ে ক্যাপটেন চুরুট ধরালো। এমনিতে সে কথাবার্তা বলতে তেমন ভালোবাসে না। কিন্তু নীলসনের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিলো যা তাকে বিচলিত করে তুলেছিলো এবং বিচলিত হয়েছে বলেই সে এতো কথা বলছিলো। বড়ো বড়ো কালো চোখ মেলে তার দিকে তাকাচ্ছিলো সুইডিশটা, চোখের দৃষ্টিতে যেন অস্পষ্ট কৌতুকের আভাস।

'আপনার বাড়িটা কিন্তু দিব্যি সুন্দর, ছিমছাম।'

'আমার যথাসাধ্য করেছি।'

'গাছগুলো থেকে আপনার নিশ্চয়ই ভালো আয় হয়? সুন্দর লাগছে দেখতে। আজকাল নারকেলের শুকনো শাঁসের যা দাম! এককালে উপোলোতে আমার নিজেরও এক টুকরো বাগান ছিলো। কিন্তু সেটা বিক্রি করে দিতে হয়েছে।'

ফের একবার ঘরের চারদিকে তাকিয়ে নিলো ক্যাপটেন। বইগুলো তাকে যেন এক বোধাতীত এবং প্রতিকূল অনুভূতিতে ভরিয়ে তুলছিলো।

'এখানে আপনার নিশ্চয়ই খানিকটা একা একা লাগে?'

'অভ্যেস হয়ে গেছে। পঁচিশ বছর ধরে এখানে রয়েছি তো!'

এবারে ক্যাপটেন বলার মতো আর কিছু ভেবে পেলো না, তাই নীরবে শুধু

ধূমপান করতে লাগলো। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিলো, নীলসনের দিক থেকেও ওই নীরবতা ভাঙার কোনো ইচ্ছে নেই। ধ্যানমগ্ন দৃষ্টিতে অতিথিকে দেখছিলো সে। ক্যাপটেন লোকটা দীর্ঘকায়, উচ্চতা ছ ফুটের ওপরে, গড়ন খুবই শক্তপোক্ত। মুখটা লাল, ব্রণ আর আঁচিলের দাগে কণ্টকিত, দু গালে সূক্ষ্ম রক্তবাহী শিরার রক্তিম আঁকি-বুঁকি। অতিরিক্ত স্থূলতার জন্যে চোখ-মুখ যেন ভেতরের দিকে বসে গেছে। চোখ দুটোতে রক্তের ছটা। ঘাড়টা চর্বির থাকে ডুবে গেছে। মাথার পেছন দিকে লম্বা কোঁকড়া প্রায়-সাদা চুলের ঝালরটি বাদে লোকটা সম্পূর্ণ টেকো। বিশাল চকচকে কপালের জন্যে তাকে বুদ্ধিমান বলে মনে হতে পারতো—যেটা একেবারেই ভুল। কিন্তু সেজন্যে তাকে অদ্ভুত এক জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খ বলেই মনে হয়। ক্যাপটেনের গায়ে নীল ফ্লানেলের জামা—গলার কাছটা খোলা বলে দেখা যায়, তার মোটাসোটা বুকটাতে লালচে চুলের জটলা। পরনে অতি পুরনো নীল সার্জের পাতলুন। একটা জবুথবুর মতো কুর্সিতে বসে রয়েছে লোকটা, বিশাল ভুঁড়িটা ঠেলে উঠেছে সামনের দিকে, মোটা মোটা পা দুটো ফাঁক করে রাখা। ওর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে নমনীয়তা বলে জিনিসটা উধাও হয়ে গেছে। নীলসন অন্যমনস্কভাবে ভাবলো, লোকটা যুবক বয়সে কেমন ছিলো কে জানে। বিশাল বপুর ওই মানুষটা যে কোনো দিন একটা বালক ছিলো, ছোটাছুটি করে বেড়াতো—তা এখন কল্পনা করাও প্রায় অসম্ভব।

ক্যাপটেনের হুইস্কিটা শেষ হয়ে গিয়েছিলো। নীলসন বোতলটা তার দিকে ঠেলে দিলো, 'নিয়ে নিন।'

ক্যাপটেন সামনের দিকে ঝুঁকে বিশাল একটা হাত বাড়িয়ে বোতলটা চেপে ধরলো, 'তা আপনি এ অঞ্চলে এলেন কি করে?'

'আমি স্বাস্থ্যের খাতিরে এই দ্বীপগুলোতে এসেছিলাম। আমার ফুসফুস দুটোর অবস্থা এতোই খারাপ হয়েছিলো যে ডাক্তাররা বলে দিয়েছিলেন, আমি আর একটা বছরও বাঁচবো না। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, তাঁরা ভুল করেছিলেন।'

'আমি জানতে চাইছিলাম, আপনি ঠিক এখানটাতে স্থিতু হলেন কি করে?'

'আমি একজন ভাবপ্রবণ মানুষ।'

'ও!'

নীলসন বুঝতে পেরেছিলো, তার কথাটার প্রকৃত অর্থ ক্যাপটেন আদৌ বুঝতে পারেনি। কালো চোখ দুটোতে বিদ্রূপের ঝিলিক তুলে মানুষটার দিকে তাকালো সে। হয়তো ক্যাপটেন অমন স্থূল আর মাথামোটা বলেই, আরও কথা বলার খেয়াল তাকে পেয়ে বসলো।

'সাঁকোটা পার হবার সময় আপনি নিজেকে সামলাতে বড্ড বেশি ব্যস্ত ছিলেন বলে হয়তো লক্ষ্য করতে পারেননি—কিন্তু এ জায়গাটাকে মোটামুটি সুন্দর বলেই মনে করা হয়।'

'ভারি সুন্দর ছোট্টখাট্ট বাড়ি আপনার!'

'আমি প্রথম যখন এখানে আসি তখন এটা ছিলো না, ছিলো একটা দেশী কুটির। লাল ফুলে ভরা বিশাল একটা গাছের ছায়ায় মৌচাকের চাল আর থাম দিয়ে তৈরি। ক্রোটনের ঝোপগুলো তাদের হলদে, লাল আর সোনালি পাতার বাহারে নানা রঙের চিত্রবিচিত্র একটা বেষ্টনী গড়ে রেখেছিলো চারদিকে। আর নারকেল গাছ ছিলো সর্বত্র। ওরা মেয়েদের মতো খেয়ালি আর অহঙ্কারী—জলের কাছে দাঁড়িয়ে ওরা সারাটা দিন নিজেদের ছায়ার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সময় কাটায়। তখন আমি নবীন যুবক—ওঃ, সে আজ সিকি শতাব্দী আগেকার কথা—অন্ধকারে হারিয়ে যাবার আগে, আমার জন্যে বরাদ্দ সংক্ষিপ্ত সময়টুকুতে, আমি তখন পৃথিবীর সবটুকু সৌন্দর্য উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। মনে হয়েছিলো এতো সুন্দর জায়গা আমি আর কোনোদিনও দেখিনি। প্রথম দেখাতেই বুকটা যেন মুচড়ে উঠেছিলো, ভয় হচ্ছিলো বুঝি কেঁদে ফেলবো। তখন আমার বয়েস পঁচিশের বেশি নয়। মুখে যথাসাধ্য সাহস আনলেও, আমি তখন মরতে চাইনি। যে কোনো কারণেই হোক মনে হয়েছিলো, এখানকার এই সৌন্দর্য আমার পক্ষে নিজের ভাগ্যকে মেনে নেওয়া সহজতর করে তুলেছে। এখানে এসে আমি অনুভব করলাম আমার সমস্ত অতীতটা যেন আমার জীবন থেকে খসে পড়ে গেছে। স্টকহোম, তার বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর বন—সে সবই যেন অন্য কারুর জীবনের ঘটনা। মনে হলো অবশেষে আমি যেন সেই পরম সত্যকে অর্জন করেছি, যার প্রসঙ্গে দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিতরা—আমি নিজেও তাঁদের একজন—এতো আলোচনা করেছেন। 'একটা বছর,' আমি নিজেকে চিৎকার করে বলেছিলাম, 'আমার হাতে আর একটা বছর। সেটা আমি এখানেই কাটাবো। তারপর মরলে কোনো দুঃখ নেই'। পঁচিশ বছর বয়সে আমরা বড়ো বোকা বড্ড ভাবপ্রবণ আর ভীষণ নাটুকে থাকি। কিন্তু তা না থাকলে পঞ্চাশে এসে আমরা হয়তো একটু কম প্রাজ্ঞ হতাম।···আরে, আপনি খান মশাই! আমার বাজে বকবকানি আপনার কাজে যেন বাধা না হয়।'

নীলসন নিজের রোগা-পাতলা হাতটা দুলিয়ে বোতলের দিকে দেখালো। ক্যাপটেন গ্লাসের অবশিষ্ট অংশটুকু শেষ করে হাত বাড়ালো বোতলটার দিকে, 'আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না।'

'আমি কমই খাই,' নীলসন মৃদু হাসলো। 'আমি যেভাবে নিজেকে মাতাল করে তুলি, আমার ধারণা সেটা আরও সূক্ষ্মপথ। তবে হয়তো সে ধারণাটা মিথ্যে। কিন্তু আর যা-ই হোক না কেন, তার আমেজটা অনেক বেশি সময় থাকে আর ফলটাও তেমন ক্ষতিকর নয়।'

'স্টেটসে আজকাল নাকি খুব কোকেন চলছে।'

নীলসন খুকখুক করে হেসে বললো, 'কিন্তু সাদা মানুষের সঙ্গে আমার বড়ো একটা দেখাসাক্ষাৎ হয় না আর এক বার এক ফোঁটা হুইস্কি খেলেও আমার কোনো ক্ষতি হবে বলে হয় না।'

সামান্য একটু হুইস্কি ঢেলে, তাতে সোডা মিশিয়ে নীলসন ছোট্ট একটা চুমুক দিলো।

'কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, কেন জায়গাটার এমন অপার্থিব সৌন্দর্য। মাঝ দরিয়ায় যাযাবর পাখি যেমন ক্লান্ত ডানা মুড়ে কোনো জাহাজে বসে সামান্য সময়ের বিশ্রাম নেয়, তেমনি ভালোবাসা মুহূর্তের জন্যে এখানে এসে থেমেছিলো। আমার দেশের প্রান্তরে প্রান্তরে মে মাসে হথর্ণ ফুলের সৌরভের মতো এখানে বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়ায় এক অপরূপ আবেগের নির্যাস। আমার মনে হয়, মানুষ যেখানে ভালোবাসে বা দুঃখ পায় সেখানে সর্বদাই যেন কিসের একটা মৃদু নির্যাস জড়িয়ে থাকে যা কোনোদিনই পুরোপুরি মরে না। জায়গাগুলো তখন যেন একটা আত্মিক গুরুত্ব অর্জন করে ফেলে—যারা সেখানে যায় তারা প্রত্যেকেই রহস্যজনকভাবে তাতে প্রভাবিত হয়ে ওঠে। কথাটা আরও পরিষ্কার করে বোঝাতে পারলে ভালো হতো।' নীলসন মৃদু হাসলো, 'কিন্তু তাহলেও আপনি তা বুঝতেন কি না জানি না।'

একটু থামলো নীলসন।

'আসলে প্রেমের নিবিড় পুলক কিছুদিন ধরে এ জায়গাটাকে সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলেছিলো বলেই হয়তো জায়গাটা আমার সুন্দর বলে মনে হয়েছিলো।' নীলসন কাঁধ ঝাঁকালো, 'তবে এমনও হতে পারে, নতুন প্রেমের সঙ্গে উপযুক্ত পরিবেশের সুষম যোগাযোগে হয়তো আমার নন্দনবোধ তখন তৃপ্তি পেয়েছিলো।'

ক্যাপটেনের চাইতে কম রসবোধসম্পন্ন মানুষও নীলসনের কথায় বিহ্বল হয়ে উঠলে, তাকে ক্ষমা করা যেতো। কারণ নিজের কথায় নীলসন নিজেই যেন অস্পষ্ট ভাবে হাসছিলো। মনের আবেগে সে যা বলছে, নিজের বুদ্ধিবৃত্তির কাছেই তা যেন হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে। নীলসন নিজেই বলেছে সে ভাবপ্রবণ। এই ভাবপ্রবণতার সঙ্গে যখন সংশয়বোধ এসে মেশে তখনই হয় বিপদ।

এক মুহূর্ত নীরব হয়ে ক্যাপটেনের দিকে তাকালো নীলসন। তার চোখের দৃষ্টিতে এক চকিত বিহ্বলতা।

'জানেন, আমার মনে হচ্ছে আমি আপনাকে আগে কোথাও না কোথাও দেখেছি।'

'কিন্তু আপনাকে আমার মনে পড়ছে, তেমন কথা বলতে পারছি না।' ক্যাপ-টেন জবাব দিলো।

'আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, আপনার মুখটা আমার চেনা। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই চিন্তাটা আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলছে। কিন্তু কবে বা কোথায় দেখেছি, তা মনে করতে পারছি না।'

ক্যাপটেন তার ভারি কাঁধ দুটো প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকালো।

'তিরিশ বছর আগে এই দ্বীপগুলোতে আমি প্রথম এসেছিলাম। এতো বছরে কতো লোকের সঙ্গে দেখা-পরিচয় হয়েছে—তা কারুর পক্ষেই মনে রাখা সম্ভব নয়।'

নীলসন ঘাড় নাড়লো, 'জানেন তো, এক একটা জায়গায় আগে কোনোদিন না গেলেও জায়গাটাকে অদ্ভুত চেনা বলে মনে হয়। মনে হয় আপনাকে চেনার ব্যাপারটাও তেমনি।' ঈষৎ খেয়ালি হাসি ছড়ালো নীলসন, 'কে জানে, হয়তো অতীতে অন্য কোনো জন্মে আপনাকে চিনতাম। হয়তো আপনি ছিলেন প্রাচীন রোমে কোনো রণতরীর অধিনায়ক আর আমি ছিলাম ক্রীতদাস—দাঁড় বাইতাম। তা আপনি তিরিশ বছর এখানে আছেন?'

'তিরিশ বছরের প্রতিটা অংশ।'

'আচ্ছা, রেড নামে কাউকে আপনি চিনতেন?'

'রেড?'

'তার একমাত্র ওই নামটাই আমি জানি। ব্যক্তিগতভাবে কোনোদিনই তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। এমন কি চোখেও দেখিনি। অথচ মনে হয় অনেকের চাইতেই—যেমন ধরুন আমরা ভাইরা, যাদের সঙ্গে আমি অনেকগুলো বছর প্রতি-দিনকার জীবন কাটিয়েছি—তাদের চাইতেও ওই লোকটাকে আমি অনেক স্পষ্ট করে দেখতে পাই। পাওলো মালাতেস্তা বা রোমিওর মতো বৈশিষ্ট্য নিয়ে সে আমার কল্পনায় বাস করে। তবে আপনি বোধকরি দান্তে বা শেক্সপিয়র পড়েননি, তাই নয় কি?'

'পড়েছি, তা বলতে পারি না।'

কুর্সিতে হেলান দিয়ে বসে চুরুট টানতে টানতে স্থির বাতাসে ভাসতে থাকা শূন্যগর্ভ ধোঁয়ার বৃত্তগুলোর দিকে শূন্যদৃষ্টিতেই তাকিয়ে থাকে নীলসন। মৃদু হাসি

খেলা করে তার ঠোঁট দুটিতে, কিন্তু চোখ দুটো গম্ভীর। তারপর ক্যাপটেনের দিকে তাকায় সে। লোকটার নিদারুণ স্থূলতার মধ্যে অস্বাভাবিক অরুচিকর কিছু একটা রয়ে গেছে। ওর অস্তিত্বে একজন প্রচণ্ড স্থূলদেহীর অতিরিক্ত আত্মপ্রসাদ। এটা একেবারে বাড়াবাড়ি। জিনিসটা নীলসনের স্নায়ুগুলোকে উত্তেজিত করে তোলে। কিন্তু যে মানুষটা তার স্মৃতিতে রয়েছে আর যে মানুষটা তার সামনে বসে আছে—তাদের দুইয়ের প্রভেদটা বড়ো মনোরম।

'মনে হয় রেডের মতো সুদর্শন পুরুষ বড়ো একটা হয় না। ওই সময়ে তাকে চিনতো এমন বেশ কয়েকজন শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে আমি কথা বলে দেখেছি। তারা প্রত্যেকেই একমত যে রেডকে প্রথম বার দেখলেই তার সৌন্দর্যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতো। আগুনের শিখার মতো লাল চুল ছিলো বলে সবাই তাকে রেড বলে ডাকতো। চুলগুলো ছিলো অকৃত্রিম ঢেউ খেলানো, ওগুলো সে লম্বা করেই রাখতো। ওর চুলে নিশ্চয়ই সেই আশ্চর্য রঙ ছিলো, যা নিয়ে র‍্যাফায়েলের পূর্ববর্তী যুগের চিত্রকররা এককালে অতো মাতামাতি করেছেন। তবে চুলের জন্যে রেডের মনে কোনো গর্ব ছিলো বলে মনে হয় না, কারণ গর্ব করার পক্ষে সে ছিলো বড্ড অকপট। তবে কিনা গর্ব থাকলেও সেজন্যে তাকে দোষ দেওয়া যেতো না। রেড ছিলো দীর্ঘকায়—উচ্চতা ছ ফুট দুই বা এক ইঞ্চি। এখানে যে কুটিরটা ছিলো তার মাঝখানকার খুঁটিটা—যেটার ওপরে চালের ভর থাকতো—সেটার গায়ে সে ছুরি দিয়ে নিজের উচ্চতা দাগিয়ে রেখেছিলো। চেহারার গড়ন ছিলো গ্রীক দেবতার মতো—চওড়া কাঁধ, সরু কোমর। প্রাক্সিতেলিসের গড়া অ্যাপোলোর মতো তার অঙ্গে ছিলো সুকোমল ডৌল আর ছিলো সেই নরম মেয়েলি মাধুর্য যা রহস্যময়, যা মনকে ব্যাকুল করে তোলে। গায়ের চামড়া ছিলো উজ্জ্বল, দুধের মতো সাদা আর সাটিনের মতো মসৃণ— ঠিক যেন মেয়েদের গায়ের চামড়া।'

'বাচ্চা বয়সে আমার চামড়াটাও ফর্সা ছিলো,' ক্যাপটেনের রক্তিম চোখ দুটোতে খুশির ঝিলিক ফুটে উঠলো।

নীলসন ক্যাপটেনের কথায় ভ্রূক্ষেপ করলো না। এখন সে গল্প বলছে। বাধা তাকে অধৈর্য করছে।

'রেডের মুখখানা ছিলো তার দেহের মতোই সুন্দর। আয়ত চোখ দুটো নীল, ঘন নীল—এতো ঘন যে কেউ কেউ বলতো কালো। ভুরু দুটো কালো, চোখের দীর্ঘ পল্লবগুলোও কালো—অধিকাংশ লালচুলো লোকের ক্ষেত্রে যা হয় না। চোখ নাক মুখ সবই টানাটানা, ঠোঁট দুটি টুকটুকে—ঠিক যেন একটা রক্তাক্ত ক্ষত। তার বয়েস তখন কুড়ি।'

এই অব্দি বলে নীলসন খানিকটা নাটকীয়ভাবে থামলো। তারপর এক চুমুক হুইস্কি পান করে ফের বলতে লাগলো, 'রেড ছিলো অতুলনীয়। বুনো গাছে ফুটে থাকা আশ্চর্য ফুলের মতো তারও অস্তিত্বের পেছনে অন্য কোনো কারণ ছিলো না। সে প্রকৃতির এক মধুর দুর্ঘটনা।

'আজ সকালে আপনি যে খাঁড়িটায় এসে নেমেছেন, একদিন সেও সেখানে এসে নেমেছিলো। সে ছিলো একজন মার্কিন নাবিক, অ্যাপিয়ায় একটা যুদ্ধজাহাজ থেকে সে পালিয়েছিলো। একজন সহৃদয় স্থানীয় অধিবাসীর কাছ থেকে কোনো-ক্রমে ভাড়াটা যোগাড় করে সে অ্যাপিয়া থেকে সাফোতোগামী একটা জাহাজে চেপে বসে। এখানে একটা ডিঙিতে চাপিয়ে তাকে তীরে নামিয়ে দেওয়া হয়। কেন সে সৈন্যবাহিনী ছেড়ে পালিয়েছিলো, জানি না। হয়তো যুদ্ধজাহাজে বাধানিষেধের জীবন তাকে বিরক্ত করে তুলেছিলো, হয়তো সে কোনো মুশকিলে পড়েছিলো কিংবা হয়তো দক্ষিণ-সমুদ্র আর এই রোম্যান্টিক দ্বীপগুলো তার মনে ঝড় তুলেছিলো। মাঝে মাঝেই এই দ্বীপগুলো এক একটা মানুষকে আশ্চর্যভাবে পেয়ে বসে, তারপর মাকড়সার জালে পড়া পতঙ্গের মতো এক সময় ধরা পড়ে যায় মানুষটা। হয়তো তার মনে কোথাও কোনো কোমলতা ছিলো এবং মিষ্টি বাতাসে ভরা এই সমস্ত সবুজ পাহাড় আর এই সুনীল সাগর হয়তো তার ভেতর থেকে উস্তুরে বলিষ্ঠতা হরণ করে নিয়েছিলো—যেমন করে ডেলাইলা জয় করেছিলো নাজারিথের নিয়মনিষ্ঠ মানুষটাকে। যাই হোক, রেড নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলো এবং সে মনে করেছিলো, স্যামোয়া থেকে তার জাহাজটা ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে এই নির্জন আশ্রয়টাতে নিরাপদেই থাকবে।

'খাঁড়ির কাছে একটা দেশী কুটির ছিলো। রেড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে সে কোন দিকে পা বাড়াবে, এমন সময় অল্পবয়সী একটি মেয়ে কুটির থেকে বেরিয়ে এসে তাকে ভেতরে ডাকলো। দেশী ভাষার দুটো শব্দও রেড তখন জানে কিনা সন্দেহ। মেয়েটির আবার ইংরেজী ভাষায় তেমনি দৌড়। কিন্তু মেয়েটির মৃদু হাসি আর মধুর ভঙ্গিমার অর্থ সে ভালোভাবেই বুঝতে পারলো। মেয়েটিকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকে, রেড একটা মাদুরে গিয়ে বসলো। মেয়েটি তাকে কয়েক টুকরো আনারস খেতে দিলো। রেডের সম্পর্কে যা শোনা যায়, আমি শুধু সেটুকুই বলতে পারি। কিন্তু তার সঙ্গে মেয়েটির প্রথম দেখা হবার তিন বছর বাদে আমি ওই মেয়েটাকেই দেখেছিলাম—ওর বয়েস তখন উনিশ হয়েছে কিনা সন্দেহ। তখন ও যে কি অপরূপ সুন্দরী ছিলো তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। জবা ফুলের ঢলোঢলো সৌন্দর্য আর জমকালো রঙ—দুই-ই ছিলো

ওর। মাথায় একটু লম্বাই বলা চলে, ছিপছিপে, ওদের জাতের মতোই কোমল চেহারা। আয়ত চোখ দুটি যেন তালগাছের তলায় শান্ত দুটি দীঘি। কালো কোঁকড়া চুলগুলো ছড়িয়ে পড়তো পিঠময়, তাতে সুগন্ধি ফুলের মালা জড়াতো ও। হাত দুটি সুন্দর—এতো ছোটো ছোটো আর এতো নিখুঁত গড়ন যে দেখে মনের তন্ত্রীতে যেন টান পড়তো। সে সব দিনগুলোতে ও খুব সহজেই হাসতো। ওর সেই মধুর হাসি শুনলে কাঁপুনি জাগতো আপনার হাঁটু দুটোয়। গায়ের রঙ ছিলো গ্রীষ্মদিনের পাকা শস্যখেতের মতো। ওঃ ঈশ্বর, কি করে আমি তার বর্ণনা দেবো? বাস্তবে অমন সুন্দরী মেয়ে হয় না।

'এই দুটি তরুণ-তরুণী—মেয়েটির বয়েস তখন ষোলো আর রেডের বয়েস কুড়ি—প্রথম দর্শনেই পরস্পরকে ভালোবেসে ফেললো। সত্যিকারের ভালোবাসা। সহানুভূতি, সমরুচি কিংবা বুদ্ধিগত সংযোগ থেকে যে ভালোবাসা গড়ে ওঠে—এ তা নয়। এ সত্যিকারের বিশুদ্ধ ও সরল প্রেম। আদম তার বাগানে ঘুম ভেঙে উঠে ঈভকে শিশিরভেজা চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে যে প্রেম অনুভব করেছিলো, এ সেই প্রেম। এই প্রেমই পৃথিবীকে অলৌকিক করে তোলে। এই প্রেমই অর্থবহ করে তোলে জীবনকে। আপনি নিশ্চয়ই সেই বিজ্ঞ বিশ্বনিন্দুক ফরাসী ডিউকের মন্তব্যটা শোনেননি—তিনি বলেছিলেন, প্রেমিক যুগলের মধ্যে একজন চিরদিন ভালোবাসে আর একজন নিজেকে ভালোবাসতে দেয়। কথাটা তিক্ত সত্য হলেও আমরা বেশির ভাগ মানুষই তা মেনে নিয়েছি। তবে ক্বচিৎ-কদাচিৎ এমন দুটি যুগলও হয়, যারা পরস্পরকে ভালোবাসা দেয়—ভালোবাসা পায়। কল্পনা করে নেওয়া যায় তখন আকাশে সূর্যটা স্থির হয়ে থাকে—যেমন ছিলো ইজরায়েল-ঈশ্বরের কাছে যোশুয়ার প্রার্থনার সময়।

'আজ এতো বছর বাদেও সেই দুটি সরল সুন্দর তরুণ প্রাণ আর তাদের প্রেমের কথা চিন্তা করলে আমি ভীষণ কষ্ট পাই। আমার হৃদয়টা তখন যেন ছিঁড়েখুঁড়ে যায়, যেমনটি হয় কোনো কোনো রাতে যখন দেখতে পাই নির্মেঘ আকাশ থেকে ছড়িয়ে পড়া পূর্ণ চাঁদের মায়া হ্রদের বুকে ঝিলমিল করছে। নিখুঁত সৌন্দর্যের চেতনা সর্বদাই এমনি করে বেদনা বয়ে আনে!

'ওরা দুজনেই তখন ছেলেমানুষ। মেয়েটি ভারি ভালো, মিষ্টি স্বভাব, করুণাময়ী। রেডের সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু ভাবতে ভালো লাগে সেও ছিলো সরল আর অকপট। ভাবতে ইচ্ছে করে, তার আত্মা ছিলো তার দেহের মতোই সুন্দর। কিন্তু আমার আশঙ্কা…ধরণী যখন তরুণী ছিলো, যখন পুরাণে কল্পিত দাড়িওলা সেন্টরের পেছন পেছন ছোটো ছোটো হরিণ শাবককে নিঃসীম প্রান্তর

ধরে ছুটতে দেখা যেতো, তখন অরণ্যবাসী আদিম মানুষ—যারা বেণুবাঁশ কেটে বাঁশি বানাতো, পাহাড়ি নদীতে স্নান করতো—তাদের মতো রেডেরও আত্মা বলতে কিছু ছিলো না। আত্মা এক যন্ত্রণাদায়ক সম্পত্তিবিশেষ। আত্মার অধিকারী হওয়া মাত্রই মানুষকে স্বর্গের নন্দনকানন থেকে নির্বাসিত হতে হয়েছিলো।

'যাই হোক, রেড যখন এ দ্বীপে আসে তার কিছুদিন আগেই দক্ষিণ-সমুদ্র অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গদের বয়ে আনা এক মহামারীতে এক-তৃতীয়াংশ দ্বীপবাসীই মারা গিয়েছিলো। মনে হয় মেয়েটিও ওই মহামারীতে নিজের সমস্ত নিকট আত্মীয়কে হারিয়ে, তখন ওই কুটিরে ওর দূর সম্পর্কের জ্ঞাতিগুষ্টির সঙ্গে বাস করতো। সংসারে মানুষ বলতে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া কোঁচকানো চামড়ার দুই থুথ্‌ুরে বুড়ি, দুটি অল্পবয়সী মেয়েমানুষ, একজন পুরুষ আর একটা বাচ্চা ছেলে। কয়েকটা দিন রেড সেখানেই রইলো। তারপর হয়তো তার মনে হলো সে সৈকতের বড্ড কাছাকাছি রয়েছে, এখানে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে তার হঠাৎ করে দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা এবং তারা হয়তো কর্তৃপক্ষের কাছে তার গোপন আশ্রয়ের সন্ধানটা জানিয়ে দেবে। কিংবা প্রেমিক-যুগল হয়তো অন্যদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারছিলো না, নিজেদের সান্নিধ্য-সুখ থেকে তারা হয়তো মুহূর্তের জন্যেও বঞ্চিত হতে চায়নি। তাই একদিন সকালে, মেয়েটির সামান্য যা কিছু জিনিসপত্র ছিলো তা নিয়ে, ওরা দুজনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। নারকেল গাছের তলা দিয়ে ঘাসে-ছাওয়া পথ ধরে ওই যে খাঁড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, ওই অব্দি এগিয়ে এসেছিলো ওরা। আপনি যে সাঁকোটা পেরিয়ে এলেন, ওদেরও সেটা পেরোতে হয়েছিলো সেদিন। রেড ভয় পাচ্ছিলো দেখে মেয়েটি হেসে উঠেছিলো খিলখিল করে। প্রথম গুঁড়িটার শেষপ্রান্ত অব্দি ও রেডের হাত ধরে রেখেছিলো, তারপর রেডের আর সাহসে কুলোলো না, সে পেছনে ফিরে গেলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝুঁকিটা সে নিলো, তবে তার আগে নিজের পোশাক-আশাক ছেড়ে নিলো। মেয়েটি মাথায় করে বয়ে আনলো তার পোশাক। এদিকে তখন একটা শূন্য কুটির ছিলো, ওরা সেখানেই ঘর বাঁধলো। জানি না কুটিরটার ওপরে মেয়েটির কোনো স্বত্ব ছিলো কি না (এই দ্বীপগুলোতে জমি-বাড়ির ভোগদখলের শর্তগুলো ভীষণ জটিল), বা কুটিরের মালিক মহামারীতে মারা গিয়েছিলো কি না। তবে যাই হোক না কেন, কেউ ওদের কোনো প্রশ্ন করেনি এবং ওরাও ওই কুটিরটার দখল নিয়ে নেয়। আসবাব বলতে ওদের ছিলো কয়েকখানা মাদুর—যাতে ওরা ঘুমোতো, এক টুকরো ভাঙা আরশি আর দু-একটা বাসন। এই মনোরম দেশে সংসার শুরু করার পক্ষে ওটুকুই যথেষ্ট।

'সবাই বলে, সুখী মানুষের কোনো অতীত ইতিহাস থাকে না। সুখী প্রেমের সত্যিই তা নেই। সারাদিন ওরা কিচ্ছুটি করতো না, তবু দিনগুলোকে ওদের বড্ড ছোটো বলে মনে হতো। মেয়েটির একটা এদেশী নাম ছিলো। কিন্তু রেড ওকে 'স্যালি' বলে ডাকতো। এদেশের সহজ ভাষাটা সে খুব দ্রুত শিখে নিয়েছিলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে মাদুরে শুয়ে থাকতো আর মেয়েটি খুশিয়াল সুরে কলকল করে কথা বলতো তার সঙ্গে। রেড ছিলো একটু চুপচাপ প্রকৃতির মানুষ। হয়তো তার মনটাও ছিলো আলসে। দেশী তামাক আর পান্দানাস পাতা দিয়ে স্যালি তাকে সিগারেট বানিয়ে দিতো, সে অনবরত তা-ই ফুঁকতো। স্যালি যখন দক্ষ আঙুলে মাদুর বুনতো, সে লক্ষ্য করতো স্যালিকে। মাঝে-মধ্যে স্থানীয় অধিবাসীরা এসে ওদের পুরনো দিনের অনেক দীর্ঘ কাহিনী শোনাতো—আদিবাসীদের যুদ্ধে দ্বীপ যখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতো, তখনকার কাহিনী। কখনও কখনও রেড খাঁড়িতে মাছ ধরতে যেতো, ফিরে আসতো ঝুড়ি ভর্তি রঙিন মাছ নিয়ে। আবার কখনও কখনও রাত্রিবেলা লণ্ঠন নিয়ে গলদা চিংড়ি ধরতে বেরুতো। কুটিরের চারদিকে প্রচুর কলা-গাছ ছিলো, স্যালি কলা ঝলসে রাখতো কালে-ভদ্রে খাবে বলে। নারকেল দিয়ে সুস্বাদু মণ্ড তৈরি করতে পারতো ও। খাঁড়ির ধারের ব্রেডফ্রুট গাছটাও ওদের ফল যোগাতো। বিশেষ ভোজের দিনে ওরা ছোট্ট একটা শুয়োর মেরে, গরম পাথরের ওপরে সেটাকে রান্না করে নিতো। খাঁড়ির জলে একসঙ্গে স্নান করতো দুজনে আর সন্ধ্যাবেলা সাজানো ডিঙিতে চেপে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতো হ্রদের বুকে। সমুদ্রের জল ঘন নীল, সূর্যাস্তের সময় হোমারের গ্রীস-সমুদ্রের মতো তাতে মদিরার রঙ ধরতো। কিন্তু হ্রদের জলে রঙের অন্তহীন বৈচিত্র্য—টলটলে নীল, হালকা সবুজ বা পান্নার মতো রঙ। অস্তগামী সূর্য সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে হ্রদের জলকে যেন গলানো সোনা করে তুলতো! তাছাড়া ছিলো হরেক রকম প্রবালের রঙ—বাদামি, সাদা, গোলাপি, বেগুনি। তাদের আকারগুলোও বা কি অপূর্ব! যেন এক মায়াকানন। ছুটপাট করে সরে সরে যাওয়া মাছগুলো ঠিক যেন প্রজাপতি। সব মিলিয়ে বাস্তবতার আশ্চর্য অভাব। মাঝে মাঝে জলের মধ্যে খানিকটা জায়গা প্রবাল দিয়ে ঘেরা—সেখানে জলের তলায় সাদা বালি বেছানো, জলটা এতো স্বচ্ছ যে চোখ যেন ঠিকরে ওঠে। ওখানে স্নান করতে ভারি মজা। স্নান করে শরীর জুড়িয়ে খুশি মনে ওরা হাতে হাত ধরে সান্ধ্য গোধূলিতে ঘাসের পথ পেরিয়ে ঘরে ফিরে আসতো—নারকেল গাছগুলো তখন ভরে থাকতো ময়না পাখির কলকাকলিতে। তারপর আসতো রাত্রি। বিশাল আকাশে তখন ঝিকমিকে সোনা। মনে হতো ইউ-রোপের আকাশের চাইতে এ আকাশের বিস্তৃতি অনেক বেশি। নরম বাতাস

আলতো গতিতে বয়ে যেতো খোলা কুটিরের ভেতর দিয়ে। দীর্ঘ রাতও কেটে যেতো বড্ড তাড়াতাড়ি। কারণ স্যালির বয়েস তখন ষোলো, আর রেডের বড়োজোর কুড়ি। কুটিরের কাঠের থামের ফাঁক দিয়ে ঊষা গুঁড়ি মেরে ওদের ঘরে ঢুকতো, দেখতো পরস্পরের আলিঙ্গনের মাঝে ঘুমিয়ে থাকা ওই দুটি অপরূপ শিশুকে। সূর্য লুকিয়ে থাকতো ছেঁড়া ছেঁড়া বিশাল কলাপাতাগুলোর আড়ালে, যাতে ওদের ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। তারপর খেলার ছলে সূর্যটা পারসিক বেড়ালের উদ্যত থাবার মতো একটা সোনালি রশ্মি ছুঁড়ে দিতো ওদের মুখের ওপরে। ঘুম ঘুম চোখ মেলে ওরা তখন মৃদু হাসতো ফের একটা নতুন দিনকে সুস্বাগত জানাতে। এমনি করে সপ্তাহ গড়িয়ে মাস, মাস গড়িয়ে একটা বছর কেটে গেলো। তখনও ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে আগের মতো সেই একই রকম··· না, 'আসক্তি নিয়ে' কথাটা ব্যবহার করতে দ্বিধা জাগছে—কারণ আসক্তির মধ্যে সর্বদাই একটা বিষাদের ছায়া, তিক্ততা বা উদ্বেগের স্পর্শ লেগে থাকে—বরং বলা যাক, তখনও ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে সেই আগের মতোই সারা প্রাণ-মন দিয়ে, ভালোবাসে তেমনি সরল আর স্বাভাবিকভাবে যেমন বেসেছিলো সেই প্রথম দেখার দিনটিতে যেদিন ওরা নিজেদের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেছিলো।

'ওদের জিগেস করলে ওরা নিঃসন্দেহে আপনাকে জানাতো, ওদের প্রেম কোনো দিন গুলু হয়ে যেতে পারে তা ওরা ভাবতেই পারে না। আমরা কি জানি না, প্রেমের এক অপরিহার্য অঙ্গ তার শাশ্বত অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখা? তবু রেডের মনে হয়তো ইতিমধ্যেই একটা অতি ক্ষুদ্র বীজ এসে বাসা বেঁধেছিলো, যা সে নিজেও জানতো না এবং মেয়েটিও তেমন কোনো সন্দেহ করতে পারেনি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সে বীজ একদিন অবসাদ হয়ে ডালপালা ছড়াতো।

'একদিন একজন স্থানীয় বাসিন্দা খাঁড়ির দিক থেকে এসে জানালো, সৈকতের কিছুটা ওধারে একটা তিমি-ধরা ব্রিটিশ জাহাজ নোঙর ফেলেছে।

'তাই নাকি'? রেড বললো, 'কিছু বাদাম আর কলার বদলে ওদের কাছ থেকে দু-এক পাউণ্ড তামাক যোগাড় করতে পারলে হতো'।

'অক্লান্ত হাতে স্যালি তাকে যে পান্দানাস সিগারেট বেঁধে দিতো সেগুলো এমনিতে কড়া, খেতেও ভালো। কিন্তু রেডের তাতে তৃপ্তি হতো না। ঝাঁঝালো গন্ধওলা, কড়া, সত্যিকারের তামাকের জন্যে তার মন কেমন করতো। কতোদিন সে পাইপ খায়নি! কথাটা ভাবতেই তার মুখে জল এসে যাচ্ছিলো। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, অমঙ্গলের আশঙ্কায় স্যালি তখন রেডকে নিরস্ত করার চেষ্টা করতে পারতো। কিন্তু আসলে প্রেম স্যালিকে এমন সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে ফেলেছিলো

যে পৃথিবীর কোনো শক্তি রেডকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে বলে ওর মনেই হয়নি। দুজনে মিলে পাহাড়ে উঠে, ওরা একটা বড়ো ঝুড়ি ভর্তি করে বুনো কমলালেবু তুললো। ফলগুলো সবুজ, কিন্তু মিষ্টি আর রসালো। তাছাড়া কুটিরের কাছ থেকে তুললো কলা, নারকেল, ব্রেডফ্রুট আর আম। তারপর খাঁড়ির কাছে সে-গুলোকে বয়ে নিয়ে গিয়ে, নড়বড়ে ক্যানোটাতে বোঝাই করে, রেড আর জাহাজের খবর নিয়ে আসা সেই ছেলেটা দাঁড় বেয়ে বেয়ে খাঁড়ির বাইরে চলে গেলো।

'রেডকে স্যালির সেই শেষ দেখা।

'পরদিন ছেলেটি একা একা ফিরে এলো। তার চোখ ভর্তি জল। সে যে কাহিনীটা বলেছিলো তা হচ্ছে এই: অনেকক্ষণ ধরে দাঁড় বাইবার পর ওরা জাহাজের কাছে গিয়ে পৌছোয়। রেড চিৎকার করে ডাকাডাকি করায় একটা সাদা চামড়ার লোক বেষ্টনীর ওপর থেকে ঝুঁকে ওদের দেখে, জাহাজে উঠে আসতে বলে। ওরা ফলগুলো নিয়ে ওপরে ওঠে এবং রেড সেগুলোকে জাহাজের ডেকে জড়ো করে রাখে। তারপর সাদা লোকটা আর রেড কথাবার্তা শুরু করে এবং মনে হয় একটা বোঝাপড়াও হয়ে যায়। ওদের মধ্যে একটা লোক নিচে গিয়ে তামাক নিয়ে আসে। রেড সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা তামাক নিয়ে একটা নল ধরিয়ে ফেলে। ছেলেটা মহা উৎসাহে নকল করে দেখায়, কিভাবে রেড মুখ থেকে একরাশ মেঘের মতো ধোঁয়া ছাড়ছিলো। তারপর লোকগুলো রেডকে যেন কি সব বলে এবং রেড একটা কেবিনে গিয়ে ঢোকে। ছেলেটি কৌতূহলী হয়ে খোলা দরজা দিয়ে লক্ষ্য করে, একটা বোতল এবং কয়েকটা গ্লাস বের করা হয়েছে। রেড বসে বসে মদ খায় আর ধূমপান করে। ওরা তাকে কি যেন জিগেস করে, জবাবে সে মাথা নাড়ে আর হাসে। যে লোকটা প্রথমে তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলো সেও হাসে, তারপর ফের ভরে দেয় রেডের গ্লাসটা। ওরা কথা বলে আর মদ খায়। ছেলেটির কাছে দৃশ্যটা অর্থহীন। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ক্লান্ত হয়ে ডেকের ওপরে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙে লাথি খেয়ে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সে দেখতে পায়, জাহাজ আস্তে আস্তে হ্রদটা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে রেড তখনও টেবিলের কাছে বসে রয়েছে, দু হাতের ওপরে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে সে। তাকে জাগাবার জন্যে ছেলেটি ওদিকে যাবার চেষ্টা করতেই একটা নির্দয় হাত তার বাহু আঁকড়ে ধরে এবং একটা লোক ভুরু কুঁচকে জাহাজের পাশের দিকটা তাকে দেখিয়ে দিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলে। রেডকে ছেলেটা চিৎকার করে ডাকে, কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যেই তাকে তুলে নিয়ে জলে ছুঁড়ে ফেলা হয়। ক্যানোটা ততোক্ষণে ভাসতে ভাসতে একটু দূরে চলে

গিয়েছিলো। অসহায় ছেলেটি তখন সাঁতার কেটে ক্যানোতে গিয়ে ওঠে। তারপর সারা রাস্তা কাঁদতে কাঁদতে নৌকো চালিয়ে তীরে ফিরে আসে।

'ঘটনাটা স্পষ্টই বোঝা যায়। কাজ ছেড়ে চলে যাওয়া বা অসুস্থতা—যে কোনো কারণেই হোক, তিমি-ধরা জাহাজটায় কাজের লোক কম ছিলো। রেড জাহাজে ওঠার পর ক্যাপটেন তাকে কাজে যোগ দিতে বলে। কিন্তু রেড তাতে রাজী না হওয়ায় তাকে মাতাল করে গুম করা হয়।

'স্যালি তখন শোকে অধীর হয়ে উঠেছিলো। তিনদিন ও শুধু চিৎকার করেছে আর কেঁদেছে। সবাই ওকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ওকে কিছুতেই শান্তি দেওয়া যায়নি। কিছুতেই ও খাবে না। শেষে ক্লান্ত হয়ে ও এক বিষণ্ণ উদাসীনতায় ডুবে গেছে। রেড যেমন করেই হোক ছাড়া পেয়ে চলে আসবে—এই বৃথা আশা নিয়ে ও খাঁড়ির কাছে গিয়ে সারাদিন হ্রদের দিকে চোখ মেলে রাখতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতো সাদা বালির ওপরে, গাল বেয়ে অশ্রু নেমে আসতো অজস্র ধারায়। রাতে অবসন্নের মতো নিজের শরীরটাকে টানতে টানতে ও সেই ছোট্ট কুঁড়েঘরটাতে ফিরে আসতো, যেখানে একদিন ও কতো সুখী ছিলো। রেড এ দ্বীপে আসার আগে ও যাদের সঙ্গে থাকতো, তারা ওকে নিজেদের কাছে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলো। কিন্তু ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, একদিন রেড ফিরে আসবে। ওর ইচ্ছে—রেড ওকে যেখানে রেখে গিয়েছিলো, ফিরে এসে ওকে সেখানেই দেখবে। চার মাস পরে ও একটা মৃত শিশুর জন্ম দিলো এবং যে বৃদ্ধা ওকে প্রসব করাতে এসেছিলো সে ওর সঙ্গে ওই কুঁড়েঘরেই রয়ে গেলো। স্যালির জীবন থেকে সমস্ত আনন্দ মুছে গিয়েছিলো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার দুশ্চিন্তা যদি একটু কমে গিয়ে থাকে, তাহলে তার জায়গায় এসে স্থিতু হয়েছিলো এক পরম বিষাদ। এখানকার মানুষগুলোর আবেগ অত্যন্ত তীব্র, কিন্তু ভীষণ ক্ষণস্থায়ী। অথচ এ মেয়েটি যে কি করে এই মর্মান্তিক বেদনা বয়ে বেড়ালো, তা সত্যিই ভাবা যায় না। আজ হোক, পরে হোক রেড একদিন ফিরে আসবেই—এই দৃঢ় প্রত্যয় ও কোনোদিনও হারায়নি। ও তার পথ চেয়ে থাকে। যতোবার কেউ নারকেল গাছের ওই সঙ্কীর্ণ সাঁকোটা পেরোয়, ও চোখ তুলে তাকায়। ভাবে, হয়তো শেষ অব্দি সে এলো।'

নীলসন কথা থামিয়ে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

'শেষ অব্দি মেয়েটির কি হলো?' জিগেস করলো ক্যাপটেন।

নীলসন তিক্ত হাসি ছড়ালো, 'তিন বছর বাদে ও আর একজন শ্বেতাঙ্গকে গ্রহণ করলো।'

ক্যাপটেন বিদ্রূপ মেশানো স্থূল ভঙ্গিতে হাসলো, 'সাধারণত ওদের তা-ই হয়।'

লোকটার দিকে এক ঝলক ঘৃণার দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো নীলসন। ওই বিশাল মোটা লোকটা কেন তার মনে এমন তীব্র বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলেছে, সে জানে না। কিন্তু তার মনে নানান চিন্তা ঘুরে ঘুরে আসে, অতীতের স্মৃতি ভরিয়ে তোলে তার সমস্ত সত্তা। পঁচিশ বছর আগেকার দিনগুলোতে ফিরে যায় নীলসন। অ্যাপিয়ায় প্রচণ্ড মদ্যপান, জুয়াখেলা আর স্থূল ইন্দ্রিয়বিলাসে ক্লান্ত হয়ে সে তখন প্রথম এই দ্বীপে এসেছে। তখন সে অসুস্থ—জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার তীব্র বাসনা তার যে উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলো, সেই স্বপ্নটা ভেঙে যাবার ক্ষতিকে সে তখন মেনে নিতে চেষ্টা করছে। নামজাদা হবার সমস্ত আশা সে তখন স্থির সংকল্পে বিসর্জন দিয়েছে। সাবধানে থাকলে আর যে কটা দিন সে বাঁচার আশা করতে পারে, তা নিয়েই সে তখন তৃপ্ত হতে আগ্রহী। এখানে এসে নীলসন প্রথমে একটা দো-আঁশলা দোকানদারের বাড়িতে উঠেছিলো। সৈকত ধরে কয়েক মাইল এগিয়ে গেলে একটা গ্রামের কিনারায় তার দোকান। একদিন নারকেল কুঞ্জের ভেতর দিয়ে ঘাসে-ছাওয়া পথটা ধরে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে নীলসন স্যালির কুটিরের কাছে এসে হাজির হয়। জায়গাটার সৌন্দর্য তাকে এমন তীব্র আনন্দে অভিভূত করে তোলে যে তা যেন বেদনারই নামান্তর। তারপরেই স্যালিকে দেখতে পায় সে। এমন সৌন্দর্য সে আগে কখনও দেখেনি। ওর অপরূপ কালো চোখ দুটিতে মিশে থাকা নীরব বেদনা তাকে অদ্ভুতভাবে নাড়া দেয়। ক্যানাকারা সুন্দরের জাত, সৌন্দর্য তাদের মধ্যে বিরল নয়—কিন্তু তা সুগঠিত পশুদের সৌন্দর্য। অন্তঃসারশূন্য। কিন্তু স্যালির ওই রহস্যে ঘেরা করুণ কালো চোখ দুটিতে যেন পথ-খুঁজে-ফেরা মানব-আত্মার তিক্ত জটিলতা অনুভব করা যায়।

'আপনার কি মনে হয় সে কোনোদিন ফিরে আসবে?' প্রশ্ন করলো নীলসন।

'তেমন আশঙ্কা নেই। জাহাজের পাওনা মিটতেই তো কয়েক বছর। তদ্দিনে সে মেয়েটার সব কথাই ভুলে যাবে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, সেদিন ঘুম ভেঙে সে যখন দেখলো তাকে সাংহাই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন সে রীতিমতো ক্ষেপে গিয়েছিলো। কারুর সঙ্গে হাতাহাতি করতে গেলেও আমি অবাক হবো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা তাকে মেনে নিতে হয়েছে এবং আমার অনুমান এক মাসের মধ্যেই তার মনে হয়েছে, ওই দ্বীপ থেকে সটকাতে পারার মতো এতো ভালো ঘটনা তার জীবনে আর ঘটেনি।'

কিন্তু নীলসন ওই কাহিনীটা নিজের মাথা থেকে তাড়াতে পারেনি। হয়তো

নিজে অসুস্থ এবং দুর্বল বলেই রেডের উজ্জ্বল স্বাস্থ্য তার হৃদয়বৃত্তিতে নাড়া দিয়েছিলো। সে নিজে কুৎসিত, চেহারাটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ—তাই অন্যের দৈহিক সৌন্দর্যকে সে অনেক বেশি মূল্য দিতো। সে কোনোদিন কাউকে পাগলের মতো ভালোবাসেনি এবং তেমন ভালোবাসাও সে অবশ্যই পায়নি। তাই ওই দুটি তরুণ প্রাণের পারস্পরিক আকর্ষণ তাকে এক পরম আনন্দে অভিভূত করে তুলেছিলো। ওর মধ্যে যেন শাশ্বত অসীমের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য। খাঁড়ির ধারে সেই ছোট্ট কুটিরটাতে ফের গিয়েছিলো নীলসন। তার ভাষা সুন্দর, মনটা উৎসাহী ও কাজে অভ্যস্ত। স্থানীয় ভাষা শেখার জন্যে ইতিমধ্যেই সে অনেকটা সময় ব্যয় করেছে। পুরনো অভ্যেসটা তখনও তার মধ্যে প্রবল। স্যামোয়াদের ভাষা সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখার জন্যে সে তখন মালমশলা সংগ্রহ করছে। স্যালির সঙ্গে যে বুড়িটা থাকতো, সে নীলসনকে ভেতরে এনে বসতে দিলো। পান করার জন্যে কাভা আর ধূমপানের জন্যে সিগারেটও দিলো। কথা বলার মতো কাউকে পেয়ে বুড়ি খুব খুশি। ও যখন কথা বলছে, নীলসন তখন স্যালিকে দেখছে। ওকে দেখে নেপলসের যাদুঘরে রাখা সাইকির মূর্তির কথা মনে পড়ছিলো তার। ওর মুখের রেখায় সেই একই রকম সুস্পষ্ট পবিত্রতা। একটি শিশুকে গর্ভে ধারণ করা সত্ত্বেও ওর চেহারায় কুমারীর আদল।

দু-তিন বার দেখাসাক্ষাৎ করার আগে নীলসন স্যালির মুখে কথা ফোটাতে পারেনি। তাও জিগেস করেছে, অ্যাপিয়ায় রেড নামে কাউকে সে দেখেছে কিনা। রেড উধাও হয়ে যাবার পর থেকে দুটো বছর কেটে গেছে, তবু এটা স্পষ্ট যে এখনও স্যালি অবিরত তার কথা চিন্তা করে।

নীলসনের কিন্তু বুঝতে দেরি হয়নি যে সে স্যালিকে ভালোবেসে ফেলেছে। প্রতিদিনই তার খাঁড়ির কাছে যেতে ইচ্ছে করতো, তবু সচেষ্ট প্রয়াসে সংযত করে রাখতো নিজেকে। স্যালির কাছে না থাকলে, সে ওর কথাই চিন্তা করতো। প্রথম প্রথম নিজেকে মৃত্যুপথযাত্রী মনে করে ও শুধু স্যালিকে দেখতে চাইতো, মাঝে-মধ্যে ওর কথা শুনতে চাইতো। ভালোবাসা তাকে এক আশ্চর্য সুখ এনে দিয়েছিলো। প্রেমের পবিত্রতা তাকে আনন্দে উদ্বেল করেছিলো। স্যালির সুন্দর দেহকান্তিকে ঘিরে কল্পনার অপরূপ জাল বোনার সুযোগটুকু ছাড়া স্যালির কাছ থেকে সে আর কিছুই চায়নি। কিন্তু খোলা বাতাস, নাতিশীতোষ্ণ তাপমাত্রা, বিশ্রাম আর সাধাসিধে খাবার—সবকিছু মিলে নীলসনের স্বাস্থ্যের ওপরে এক অপ্রত্যাশিত প্রভাব ফেলতে শুরু করলো। এখন রাত্রিবেলা তার দেহের তাপ আর ততো সাংঘাতিক বাড়ে না, কাশি একটু কম হয়, দেহের ওজনও বাড়তে শুরু

করেছে। ছ মাসে তার একবারও রক্তক্ষরণ হয়নি। হঠাৎ করেই একদিন সে আবার বেঁচে থাকার সম্ভাবনাটা দেখতে পেলো। তার রোগটাকে সে ভালোভাবে লক্ষ্য করেছিলো এবং এবারে তার মনে আশার উদয় হলো। মনে হলো, খুব সাবধানে থাকলে হয়তো সে এ রোগের দুর্বার গতিকে রোধ করতে পারবে। ভবিষ্যতের দিকে ফের একবার তাকিয়ে নীলসন উল্লসিত হয়ে উঠলো। কর্মব্যস্ত জীবন কাটানোর কথা অবশ্যই প্রশ্নাতীত, তবে এই দ্বীপে সে সহজেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে। তার যা সামান্য আয় তা অন্যত্র দিন যাপনের পক্ষে কম হলেও, এ দ্বীপে তাই-ই যথেষ্ট। এখানে সে নারকেলের চাষ করতে পারে, তাতে নিজেকেও একটা কাজের মধ্যে রাখা যাবে। তা ছাড়া সে তার বই আর একটা পিয়ানোও আনিয়ে নেবে। কিন্তু চকিত চিন্তায় সে ঠিকই বুঝতে পারলো, এসবের মধ্যে দিয়ে সে শুধু নিজের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষাকেই নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। আসলে সে স্যালিকে চায়। স্যালিকে সে ভালোবাসে শুধু ওর সৌন্দর্যের জন্যে নয়, ওর বেদনাবিধুর চোখ দুটির আড়ালে যে করুণ আত্মাটাকে সে দেখতে পেয়েছে—ভালোবাসা তার জন্যেও। নিবিড় প্রেম আর আবেগে আবেগে স্যালিকে সে মাতাল করে তুলবে। শেষ পর্যন্ত স্যালিকে সে অতীতের সবকিছু ভুলিয়ে দেবে। আত্মসমর্পণের উন্মাদনায় নীলসন কল্পনা করলো, স্যালিকে সে সুখ দেবে—যে সুখের প্রত্যাশা সে আর কোনোদিনও করবে বলে ভাবেনি, অথচ যা এখন অলৌকিকভাবে তার কাছে এসে হাজির হয়েছে।

নীলসন স্যালিকে তার সঙ্গে থাকতে বললো। স্যালি রাজী হলো না। এটা প্রত্যাশিতই ছিলো এবং নীলসন এতে হতাশ হলো না। কারণ সে নিশ্চিত ছিলো, এখন হোক বা পরে হোক স্যালি তার কাছে ধরা দেবেই। তার প্রেম দুর্বার দুর্গম। সেই বুড়ীটাকে নীলসন তার বাসনার কথা জানালো এবং অবাক হয়ে শুনলো, সে এবং অন্যান্য প্রতিবেশীরা দীর্ঘদিন ধরেই তাদের ব্যাপারটা জানে। তারা সবাই মিলে স্যালিকে নীলসনের প্রস্তাবটা মেনে নেবার জন্যে জোরাজুরি করছে। শত হলেও, এদেশী সব মেয়েই সাদা মানুষের ঘরদোর সামলাবার সুযোগ পেলে খুশী হয়। তা ছাড়া, এ দেশের মান অনুযায়ী নীলসন ধনী লোক। যে দোকানির বাড়িতে নীলসন থাকতো, সেও স্যালির কাছে গিয়ে ওকে বোকামো করতে বারণ করলো। এমন সুযোগ আর আসবে না। তাছাড়া এতোদিন হয়ে গেলো, রেড আর কোনোদিন ফিরবে বলে স্যালি এখনও নিশ্চয়ই বিশ্বাস রাখতে পারে না। কিন্তু স্যালির বিরোধিতা নীলসনের বাসনাকে শুধু বাড়িয়েই দিলো। যা ছিলো বিশুদ্ধ প্রেম তা হয়ে উঠলো মানসিক যন্ত্রণাদায়ক তীব্র কামনা। নীলসন

স্থির সিদ্ধান্ত নিলো, কোনো কিছুই তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। স্যালিকে সে শান্তিতে থাকতে দিলো না। অবশেষে নীলসনের অনুরোধ-উপরোধ এবং অন্য সকলের রাগারাগি সাধাসাধিতে ক্লান্ত হয়ে স্যালি ওই প্রস্তাবে রাজী হলো। কিন্তু পরদিন আনন্দে উচ্ছল হয়ে নীলসন স্যালির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলো, রেডের সঙ্গে ও যে কুটিরটাতে বাস করতো সেটাকে ও রাত্রিবেলা আগুন জেলে পুড়িয়ে দিয়েছে। বুড়িটা ছুটে এসে রেগেমেগে নীলসনের কাছে স্যালির নামে গালমন্দ করতে লাগলো। কিন্তু নীলসন তাকে হাত নেড়ে একপাশে সরিয়ে দিলো। ওতে কিছুই এসে যায়নি। কুটিরটা যেখানে ছিলো সেখানে ওরা একটা বাংলো তৈরি করিয়ে নেবে। পিয়ানো আর একগাদা বই আনাতে চাইলে ইউরোপীয় কেতার বাড়ি সত্যিই অনেক সুবিধেজনক হবে।

তাই এই ছোট্ট কাঠের বাড়িটা গড়ে উঠলো, যেখানে সে আজ এতো বছর ধরে বাস করছে। স্যালিও তার স্ত্রী হলো। কিন্তু প্রথম কয়েক সপ্তাহের তীব্র মধুর আনন্দটুকু ছাড়া, নীলসন তেমন করে সুখ পেলো না। প্রথম দিকে স্যালি তাকে যতোটুকু দিয়েছে, তা নিয়েই খুশী হয়েছে নীলসন। কিন্তু স্যালি তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো শুধুমাত্র ক্লান্তি আর অবসাদে। নীলসনকে ও যা দিয়েছিলো তার কোনো মূল্যই ছিলো না ওর কাছে। নীলসন ওর যে আত্মার অস্পষ্ট আভাস দেখতে পেয়েছিলো, তা কোনোদিনই তার কাছে ধরা দেয়নি। নীলসন জানে, তার জন্যে স্যালির বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা নেই। এখনও ও রেডকে ভালোবাসে, সব সময় ও তারই ফেরার প্রতীক্ষায় রয়েছে। নীলসন জানে, তার প্রেম, কোমল ব্যবহার, সহানুভূতি আর উদারতা পাওয়া সত্ত্বেও স্যালি রেডের কাছ থেকে সামান্য একটু সঙ্কেত পেলেই তাকে ছেড়ে চলে যাবে—এক মুহূর্তের জন্যে একটুও দ্বিধা করবে না, নীলসনের দুরবস্থার কথা ও একবারও চিন্তা করবে না। মানসিক অশান্তিতে অধীর হয়ে উঠলো নীলসন। বারবার সে মাথা কুটতে লাগলো স্যালির অভেদ্য সত্তার কাছে। তার প্রেম তিক্ত হয়ে উঠলো। করুণা দিয়ে সে স্যালির মন গলাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তা আগের মতোই কঠিন হয়ে রইলো। সে নির্লিপ্ত হবার ভান দেখালো, স্যালি তা লক্ষ্যও করলো না। মাঝে মাঝে সে মেজাজ খারাপ করে ওকে গালিগালাজ করতো, স্যালি তখন নীরবে কাঁদতো। মাঝে মাঝে সে ভাবতো, স্যালি একটা প্রতারক ছাড়া আর কিছু নয় আর আত্মার ব্যাপারটা স্রেফ তার কল্পনামাত্র। সে স্যালির মনের মন্দিরে ঢুকতে পারেনি; কারণ সেখানে মন্দির বলে কিছু নেই। নীলসনের প্রেম হয়ে উঠলো একটা কয়েদখানা—সেখান থেকে সে মুক্তি চায়। শুধু দরজাটা খুলে মুক্ত বাতাসে

বেরিয়ে এলেই হয়। কিন্তু দরজাটা খোলার মতো শক্তিটুকুও তার নেই। এ এক অদ্ভুত নির্যাতন। অবশেষে নীলসন আশাহীন, বোধহীন হয়ে উঠলো। আগুনটা জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে গেলো। এখন স্যালির চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে ওই সঙ্কীর্ণ সাঁকোটার দিকে স্থির হলে, নীলসনের বুক আর রাগে ভরে ওঠে না। শুধু অধৈর্য লাগে। আজ বহু বছর হয়ে গেলো ওরা অভ্যেসের বশে আর সুবিধের খাতিরে এক সঙ্গে বাস করছে। নীলসন এখন হাসিমুখে পেছনে ফিরে তার অতীতের প্রেমের দিকে তাকায়। এ দেশে মেয়েরা তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যায়। স্যালিও এখন বুড়ি হয়ে গেছে। এখন স্যালির প্রতি তার প্রেম না থাক, সহনশীলতা আছে। নীলসনকে ও বিরক্ত করে না। পিয়ানো আর বই নিয়েই খুশী থাকে নীলসন।

অতীতের চিন্তা নীলসনের মনে মুখর হবার বাসনা জাগায়।

'এখন পেছনের দিকে তাকিয়ে রেড আর স্যালির সংক্ষিপ্ত প্রেমের কথা ভাবলে আমার মনে হয়, ভালবাসার শীর্ষবিন্দুতে থাকার সময় বিচ্ছেদ হয়েছিলো বলে নিষ্ঠুর ভাগ্যকে ওদের ধন্যবাদ জানানো উচিত। ওরা কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু সে কষ্টও সুন্দর। ভালোবাসার সত্যিকারের বিয়োগান্ত বিপর্যয় ওদের সহ্য করতে হয়নি।'

'আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না,' ক্যাপটেন বললো।

'ভালোবাসার বিয়োগান্ত পরিস্থিতি মৃত্যু বা বিচ্ছেদে নয়। ওদের একজনের প্রতি অন্যজনের ভালোবাসা কমে যেতে কতোদিন সময় লাগতো বলে আপনার মনে হয়? যে নারীকে আপনি একদিন সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে ভালোবেসেছেন, যাকে চোখের আড়াল করা আপনার কাছে অসহনীয় বলে মনে হতো তাকে আর কোনোদিন না দেখলেও আপনার কিছু এসে যাবে না—এই উপলব্ধিটা কতো ভয়ঙ্কর ভেবে দেখুন তো! আসলে ভালোবাসার সত্যিকারের বিয়োগান্ত পরিস্থিতি হলো উদাসীনতা।'

নীলসন কথাগুলো বলতে বলতেই একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে গেলো। কথাগুলো ক্যাপটেনকে উদ্দেশ করে বলা হলেও, নীলসন তখন ক্যাপটেনকে কথাগুলো বলেনি। সে তখন নিজের চিন্তাগুলোকে ভাষায় রূপ দিচ্ছিলো নিজেকে শোনাবে বলে। সামনের লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও সে তখন মানুষটাকে দেখছিলো না। কিন্তু এবারে তার সামনে একটা ছবি ফুটে উঠলো। যে লোকটাকে সে দেখতে পাচ্ছিলো, তার ছবি নয়—অন্য একজনের। নীলসন যেন সেই ধরনের একটা আরশির দিকে তাকালো যে আরশিতে মানুষের মুখ অস্বাভাবিক বেঁটে কিংবা অদ্ভুত লম্বাটে দেখায়। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটলো ঠিক

তার বিপরীত। ক্যাপটেনের ওই হোঁৎকা মতো কুৎসিত বরঙ্ক মুখটার মধ্যে নীলসন একটি তরুণের ছায়া-ছায়া অস্পষ্ট মুখ দেখতে পেলো। এলোমেলো পথচলা লোকটাকে কেন ঠিক এখানেই নিয়ে এলো? বুকের মধ্যে একটা চকিত কাঁপুনিতে সামান্য বেদম হয়ে উঠলো নীলসন। একটা অবাস্তব সন্দেহ তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেললো। ব্যাপারটা অসম্ভব, কিন্তু তবু বাস্তবও হতে পারে।

'আপনার নামটা কি?' আচমকা প্রশ্ন করলো সে।

ক্যাপটেনের মুখটা কুঁচকে উঠলো। ভীষণ বিদ্বেষী আর ভয়ঙ্কর স্থূল রুচির মানুষ বলে মনে হতে লাগলো তাকে। নিচু গলায় একটা ধূর্ত হাসি হেসে সে বললো, 'এতো দীর্ঘদিন আগে নিজের নামটা শুনেছিলাম যে আজ আমি নিজেই তা প্রায় ভুলে গেছি। তবে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে এ দ্বীপগুলোতে সবাই সর্বদা আমাকে রেড বলে ডাকতো।'

একটা নিচু গলার, প্রায় নিঃশব্দ হাসির দমকে ক্যাপটেনের বিশাল শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। অশ্লীল হাসি। নীলসন শিউরে উঠলো। ওদিকে রেড যেন তখন সাংঘাতিক মজা পেয়েছে, তার লালচে চোখ দুটো দিয়ে জল বেরিয়ে দু গাল বেয়ে নামছে।

নীলসন একটা হেঁচকি তুললো, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি স্ত্রীলোক ঘরে এসে ঢুকলো। স্ত্রীলোকটি এদেশী, খানিকটা ব্যক্তিত্বময়ী। চেহারাটা শক্তপোক্ত, তবে অতিরিক্ত মাংসল নয়। রঙ কালো, কারণ এখানকার লোকেরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি করে কালো হয়। চুলগুলো ভীষণ পাকা। পরনে কালো রঙের একটা লম্বা ঢিলেঢালা পোশাক। পোশাকের পাতলা আবরণ ভেদ করে স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে ওর পুরুষ্টু স্তন দুটি।

অবশেষে সেই মুহূর্তটা এসেছে।

মহিলা নীলসনকে সংসার সম্পর্কে কি একটা কথা জিগেস করলো, নীলসন তার জবাব দিলো। নিজের কণ্ঠস্বর নীলসনের নিজের কানেই অস্বাভাবিক শোনালো। মহিলা সেটা লক্ষ্য করেছে কি না, ভাবলো সে। জানলার ধারে কুর্সিতে বসে থাকা লোকটার দিকে একবার নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো মহিলা।

মুহূর্তটা এসেছিলো, আবার চলেও গেলো।

এক মুহূর্ত নীলসন কোনো কথা বলতে পারলো না। একটা অদ্ভুত ঝাঁকুনি খেয়েছিলো সে। তারপর বললো, 'আপনি আজ এখান থেকে আমার সঙ্গে দুটি খেয়ে গেলে ভীষণ খুশী হবো।'

'তা আর হবে না,' রেড বললো। 'আমাকে এখন এই গ্রে নামে লোকটার

খোঁজে বেরুতে হবে। তাকে জিনিসগুলো দিয়ে, এখান থেকে কেটে পড়বো। কালই আমি অ্যাপিয়ায় ফিরতে চাই।'

'আমি আপনার সঙ্গে একটি ছেলেকে পাঠাচ্ছি, সে আপনাকে রাস্তা দেখিয়ে দেবে।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়!'

কষ্টেসৃষ্টে নিজেকে কুর্সি থেকে টেনে তুললো রেড। বাগানে যারা কাজ করছিলো, নীলসন তাদের মধ্যে একজনকে ডেকে বুঝিয়ে দিলো ক্যাপটেন কোথায় যেতে চাইছে। ছেলেটা সাঁকো ধরে এগুতে লাগলো। তাকে অনুসরণ করার জন্যে তৈরি হলো রেড।

'পড়ে যাবেন না যেন,' নীলসন বললো।

'আরে না, মশাই।'

নীলসন দেখলো, লোকটা সাঁকো পেরিয়ে যাচ্ছে। নারকেল গাছগুলোর আড়ালে সে উধাও হয়ে যাবার পরেও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো নীলসন। তারপর ধপাস করে বসে পড়লো নিজের কুর্সিতে। ওই লোকটাই কি তাকে জীবনে সুখী হতে দেয়নি? ওই লোকটাকেই স্যালি এতোগুলো বছর ধরে ভালোবেসে এসেছে আর ওরই জন্যে মরিয়া হয়ে প্রতীক্ষা করছে দিনের পর দিন? কি অসম্ভব, অদ্ভুত কাণ্ড! হঠাৎ ভীষণ রাগ হলো নীলসনের। ইচ্ছে করলো, লাফিয়ে উঠে চতুর্দিকের সমস্ত কিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে দেয়। সে প্রতারিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওরা পরস্পরকে দেখেছে, কিন্তু তা জানতেও পারেনি। নীলসন হাসতে শুরু করলো।

আনন্দহীন হাসি। হাসিটা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্তদের হাসির মতো হয়ে উঠলো। দেবতারা তার সঙ্গে এক নিষ্ঠুর ছলনা করেছেন। এবং এখন সে বুড়ো হয়ে গেছে।

অবশেষে স্যালি ঘরে এসে জানালো, খাবার তৈরি। ওর মুখোমুখি বসে খাওয়ার চেষ্টা করলো নীলসন। ভাবতে লাগলো, এখন সে যদি স্যালিকে বলে দেয় যে কুর্সিতে বসে থাকা সেই মোটা বুড়োটাই ওর সেই প্রেমিক যাকে যৌবনে সমর্পণ করা সুতীব্র আবেগ দিয়ে ও আজও মনে করে রেখেছে—তাহলে স্যালি কি বলবে। বহু বছর আগে, যখন স্যালি তাকে অসুখী করেছে বলে সে ওকে ঘৃণা করতো, তখন এ কথা স্যালিকে বলতে পারলে খুশী হতো নীলসন। স্যালি তাকে আঘাত দিয়েছে বলে সেও তখন স্যালিকে আঘাত দিতে চাইতো—কারণ তার ঘৃণাটা ছিলো আসলে ভালোবাসা। কিন্তু এখন তার আর কিছু এসে যায় না।

উদাস অবসন্ন ভঙ্গিতে দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললো নীলসন।

'লোকটা কি চাইছিলো?' কিছুক্ষণের মধ্যেই জিগেস করলো স্যালি.

নীলসন তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিলো না। স্যালি এখন বড্ড বুড়ি হয়ে গেছে। এখন ও মোটাসোটা একটি বয়স্কা এদেশী মহিলা। নীলসন ভেবে পেলো না, কেন সে একদিন অমন পাগলের মতো ওকে ভালোবেসে ছিলো। নিজের আত্মার সমস্ত ঐশ্বর্য সে ওর পায়ের কাছে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলো, ও সেদিকে ফিরেও তাকায়নি। অপচয়, কি প্রচণ্ড অপচয়! অথচ এখন ওর দিকে তাকিয়ে নীলসন শুধুমাত্র অবজ্ঞা অনুভব করছে। অবশেষে তার ধৈর্য নিঃশেষ হলো। স্যালির প্রশ্নের জবাব দিলো সে।

'ও একটা স্কুনারের ক্যাপটেন। অ্যাপিয়া থেকে এসেছে।'

'ও।'

'ও দেশ থেকে খবর নিয়ে এসেছে। আমার বড়দা ভীষণ অসুস্থ, আমাকে ফিরে যেতে হবে।'

'বেশি দিনের জন্যে যাবে?'

নীলসন দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললো।

সূর্য

ডেভিড হার্বার্ট লরেন্স

শুধুমাত্র ইংরেজী সাহিত্য নয়, আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের এক বিতর্কিত পুরুষ ডি. এইচ. লরন্সের জন্ম নটিংহ্যামশায়ারের ইস্টউডে, ১৮৮৫ সালে। পড়াশুনো করেছেন প্রথমে নটিংহ্যাম হাইস্কুল এবং পরে নটিংহ্যাম ইউনিভারসিটি কলেজে। প্রথম উপন্যাস 'দ্য হোয়াইট পিকক' প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-সাহিত্য—প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য সন্দেহাতীত। ১৯২৮ সালে তাঁর উপন্যাস 'লেডি চ্যাটার্লিস লাভার' অশ্লীলতার দায়ে নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু তাঁর সাহিত্যকীর্তিকে অভিযুক্ত করা গেলেও অস্বীকার করা যায় না। ১৯৩০ সালে ক্ষয়রোগে তাঁর মৃত্যু হয় ভেনিস শহরে।

ডাক্তার বলেছিলেন, 'ওকে দূরে কোনো রোদ্দুরের দেশে নিয়ে যান।'

ও নিজে সূর্য সম্পর্কে অবিশ্বাসী। তবু ও নিজের সন্তান, মা আর একজন নার্সের সঙ্গে সমুদ্র পেরিয়ে দূরদেশে যেতে রাজী হয়ে গেলো।

জাহাজ মাঝরাতে ছাড়লো। তার আগে দুটি ঘণ্টা স্বামী ওর সঙ্গেই ছিলো। বাচ্চাটাকে তখন শুইয়ে দেওয়া হয়েছে, যাত্রীরা উঠতে শুরু করেছে জাহাজে। কালো অন্ধকার রাত্রি। গাঢ় অন্ধকার নিয়ে দুলছিলো হাডসন নদীর জল, তাতে কেঁপে কেঁপে উঠছিলো ছলকে পড়া কয়েকটি আলোর বিন্দু। জাহাজের বেষ্টনীতে শরীর এলিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে ও ভাবছিলো : এই হচ্ছে সমুদ্র—মানুষ যেমনটি ভাবে সমুদ্র তার চাইতেও বেশি গভীর, অজস্র স্মৃতিতে ভরা। সেই মুহূর্তে সমুদ্রটা নড়েচড়ে উঠেছিলো ঠিক যেন চিরজীবী অনন্তনাগের মতো।

'জানো, এই বিদায় নেবার ব্যাপারটা মোটেই ভালো নয়।' স্বামী ওর পাশে দাঁড়িয়ে বলছিলো, 'একেবারে বিশ্রী ব্যাপার। আমার একটুও ভালো লাগে না।'

মানুষটার কণ্ঠস্বর আশঙ্কা আর উদ্বেগে ভরা। সেই সঙ্গে যেন আশার শেষ কুটোটাকে আঁকড়ে রাখার প্রচেষ্টা।

'আমারও ভালো লাগে না,' নির্লিপ্ত স্বরে জবাব দিয়েছিলো ও। ওর মনে পড়ছিলো, কি প্রচণ্ড তিক্ততা নিয়ে ওরা একজন আর একজনের কাছ থেকে

বিচ্ছিন্ন হতে চাইছিল। বিদায়ের আবেগ ওর মনটাকে একটু নাড়া দিয়েছিলো বটে, কিন্তু তাতে ওর হৃদয়ের কাঠিন্যটুকুই আরও গভীরে পৌঁছে গেছে।

তাই ঘুমন্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলো ওরা। বাবার চোখ দুটো জলে ভিজে উঠলো। কিন্তু চোখ সজল হওয়ায় কিছু এসে যায় না। যাতে এসে-যায় তা হলো সারা বছর, সমস্ত জীবন ধরে অভ্যাসের কঠোর ছন্দ—সত্তার গভীরে জেগে থাকা শক্তির প্রকাশ। ওদের দুজনের জীবনে শক্তির এই প্রকাশ পরস্পরের বিরোধীপক্ষ। পরস্পরের বিপরীত দিকে ছুটে আসা দুটো এঞ্জিনের মতো ওরা একে অন্যকে ভেঙে চুরমার করে ফেলেছে।

'পারে নামুন! পারে নামুন আপনারা!' হুকুম শোনা যায়।

'মরিস, তুমি এবারে যাও!' স্বামীকে কথাটা বলে মেয়েটি মনে মনে ভাবে: ওর এখন পারে নামার পালা। আর আমার পালা সমুদ্রে ভাসার!

জাহাজটা যখন কূল থেকে একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে, তখন মাঝরাত্রির বিষণ্ণতায় ফেরিঘাট থেকে রুমাল ওড়ালো মানুষটা। অসংখ্য মানুষের ভিড়ে একজন। ভিড় করা মানুষের একজন।

আলোর সারিতে সাজানো বড়ো বড়ো থালার মতো ফেরি-নৌকোগুলো তখনও হাডসন পারাপার করছে। ওই কালো গহ্বরটা নিশ্চয়ই লাকাওয়ানা স্টেশন। জাহাজ ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে, হাডসনটা যেন আর শেষ হয় না। অবশেষে ওরা বাঁকটা ঘুরলো। এখান থেকে দেখা যায়, গোলন্দাজ বাহিনীর কেন্দ্রে আলোর অপ্রতুলতা। স্বাধীনতার মূর্তিটা বদমেজাজের ঘোরে মশালটা ধরে রেখেছে। সমুদ্রে ঢেউ জেগেছে এতোক্ষণে।

অতলান্তিকের রূপ ছিলো লাভার মতো ধূসর, তবু শেষ পর্যন্ত রোদ্দুরের দেশে পৌঁছে গেলো ও। এমন কি সুনীল সমুদ্রের ধারে বাড়িও পেয়ে গেলো একটা। বাড়িতে মস্ত বাগান, কিংবা দ্রাক্ষাকুঞ্জ। অজস্র আঙুরলতা আর জলপাইবীথি ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্র-সৈকতের সঙ্কীর্ণ ভূ-ভাগ অব্দি। বাগানটা অসংখ্য গোপন জায়গায় ভরা। মাটির গহ্বরে অনেক নিচে লেবু গাছের ঘন কুঞ্জবন। লুকিয়ে থাকা একটা অকৃত্রিম সবুজ জলের কুণ্ড। ছোট্ট একটা গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা ঝরনা—গ্রীকরা আসার আগে আদিম সিকিউলররা হয়তো এখানে জলপান করতো। শূন্যগর্ভ একটা প্রাচীন কবরে ধূসর রঙের একটা ছাগল ডাকছে। বাতাসে মিমোসার সৌরভ আর দূরে আগ্নেয়-গিরির তুষার চূড়া।

এ সবকিছুই দেখলো মেয়েটি। একদিক দিয়ে এসব মনটাকে স্নিগ্ধ করে

তোলে। কিন্তু এসব কিছুই বাইরের, এসবে ওর সত্যিকারের কোনো আকর্ষণ নেই। ওর ভেতরকার রাগ আর হতাশা, বাস্তবের কোনো কিছুকে অনুভব করার অক্ষমতা—সব কিছু নিয়ে ও ঠিক সেই আগেকার মতোই রয়ে গেছে। বাচ্চাটাও ওকে বিরক্ত করে তোলে, ওর মানসিক শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটায়। ছেলের সম্পর্কে ও নিজেকে ভয়ঙ্কর দায়ী বলে মনে করে—যেন ছেলের প্রতিটা নিঃশ্বাসের জন্যেই ওকে দায়ী থাকতে হবে। এবং এটাই ওর কাছে যন্ত্রণাদায়ক, ওর ছেলে এবং ওদের সঙ্গে জড়িত অন্য সকলের পক্ষেও তাই।

'আচ্ছা জুলিয়েট, ডাক্তারবাবু তোকে জামা-কাপড় না পরে রোদ্দুরে শুয়ে থাকতে বলেছেন। তুই তা করিস না কেন?' ওর মা জিগেস করলেন।

'তা করার মতো সুস্থ হলেই করবো। তোমরা কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও নাকি?' ঝাঁঝিয়ে উঠলো ও।

'না না! মারতে চাইবো কেন, বাছা! আমরা শুধু তোর ভালোই করতে চাই।'

'দোহাই তোমাদের, আর আমার ভালো করতে চেয়ো না।'

মা শেষ অব্দি রাগে-দুঃখে চলেই গেলেন।

সমুদ্র সাদা হয়ে উঠলো, তারপর অস্পষ্ট হতে হতে একেবারে উধাও। ঝরতে লাগলো দুরন্ত বৃষ্টি। রোদ্দুর পাবার জন্যে তৈরি করা বাড়িটা এখন ঠাণ্ডায় হিম।

তারপর ফের একদিন সকালে নগ্ন, গলিত, দীপ্ত সূর্যটা সমুদ্রের প্রান্তসীমায় নিজেকে উঁচু করে তুলে ধরলো। জুলিয়েটের বাড়িটা দক্ষিণ-পুবমুখো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ও এই সূর্যোদয় দেখলো। মনে হচ্ছিলো, ও যেন আগে কোনোদিনও সূর্যোদয় দেখেনি। সমুদ্র-রেখার ওপরে দাঁড়িয়ে উলঙ্গ সূর্য নিজের শরীর থেকে রাত্রিকে ঝেড়ে ফেলছে, এ দৃশ্য এতোদিন ওর অদেখা ছিলো।

তাই ওর গোপন-মনে নগ্ন দেহে সূর্যস্নানের বাসনা জেগে উঠলো। একটা গোপন রহস্যের মতো বাসনাটাকে ও সস্নেহে লুকিয়ে রাখলো মনের গভীরে। সূর্যস্নানের জন্যে ও বাড়ি ছেড়ে, মানুষের দৃষ্টির নাগাল এড়িয়ে, দূরে কোথাও চলে যেতে চায়। কিন্তু যে দেশে প্রতিটা জলপাই গাছের চোখ আছে, যেখানকার প্রতিটা ঢালই দূর থেকে চোখে পড়ে, সেখানে লুকোতে যাওয়াটা সহজ কাজ নয়। তবু একটা জায়গা খুঁজে পেলো ও—বড়ো বড়ো ফণীমনসা জাতের কাঁটাঝোপে ঘেরা একটা পাহাড়ি খাঁজ। সমুদ্র আর সূর্যের দিকে ঝুলে রয়েছে খাঁজটা। কাঁটাগাছের এই পাঁশুটে-নীল ঝোপের ভেতর থেকে বিবর্ণ গুঁড়ির একটা

সাইপ্রেস গাছ ওপরের দিকে উঠে গিয়ে নীল আকাশে মাথা হেলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঠিক যেন একজনের অভিভাবকের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে নজর রাখছে গাছটা। অথবা যেন একটা রুপোলি মোমবাতি, যার বিশাল শিখায় আলোর বদলে রয়েছে অন্ধকার—যেন পৃথিবী তার বিষাদের গর্বিত বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে আকাশের দিকে।

সাইপ্রেস গাছটার তলায় বসে জুলিয়েট ওর পোশাক খুলে ফেললো। ওর চারদিকে কাঁটা গাছের এক ভয়ঙ্কর অথচ মনোরম অরণ্য। সেখানে বসে ও সূর্যের কাছে নিজের অন্তরকে উৎসর্গ করলো। তবু বাধ্য হয়ে নিজেকে উৎসর্গ করার নিষ্ঠুরতায় এক নিদারুণ বেদনায় দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও।

নীল আকাশের পথে এগিয়ে যেতে যেতে সূর্য নিজের কিরণ ছড়িয়ে গেলো নিচের পৃথিবীতে। ওর স্তন দুটি, যা কোনোদিনও পরিপক্ক হয়ে উঠবে না বলে মনে হয়েছিলো, তাতে সমুদ্রের কোমল বাতাস অনুভব করলো জুলিয়েট। অথচ সূর্যের স্পর্শ যেন অনুভবই করলো না। ওর স্তন দুটি যেন পূর্ণ বিকাশের আগেই শুকিয়ে যাওয়া কোনো ফল।

কিন্তু শীগগিরি নিজের গভীরে সূর্যকে অনুভব করলো ও—প্রেমের চাইতে তপ্ত, বুকের দুধ বা ওর সন্তানের হাতের স্পর্শের চাইতেও বেশি উষ্ণ সে অনুভূতি। অবশেষে, অবশেষে উত্তপ্ত রোদে ফলে থাকা দীর্ঘ শুভ্র আঙুরের মতো হয়ে উঠলো ওর স্তন দুটি।

সমস্ত আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে নগ্ন শরীরে সূর্যের আলোয় শুয়ে থাকে জুলিয়েট। শুয়ে শুয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে তাকায় মাঝ-আকাশের সূর্যটার দিকে —যেন নীল রঙে স্পন্দিত একটা গোলক, প্রান্তভাগগুলো ধোঁয়াটে উজ্জ্বল। সূর্য···অপরূপ নীলে স্পন্দিত, প্রাণময়, প্রান্তসীমা থেকে শুভ্র আগুন ছড়িয়ে যাওয়া সূর্য। মুখ নিচু করে সূর্য নীল আগুনের মতো দৃষ্টিতে জুলিয়েটের দিকে তাকায়—জড়িয়ে ধরে ওর স্তন, ওর মুখ, ওর গলা—ওর ক্লান্ত উদর, ওর হাঁটু, ওর উরু আর পা দুটিকে।

চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে জুলিয়েট। তবু চোখের পাতার ভেতর দিয়ে সূর্যের গোলাপী শিখা ওর চোখ দুটিকে ভরিয়ে তোলে। এটা একেবারে বাড়াবাড়ি। গাছের কয়েকটা পাতা কুড়িয়ে, চোখের ওপরে চাপা দিয়ে রাখে ও। তারপর শুয়ে পড়ে আবার—ঠিক যেন রোদ্দুরে রাখা একটা লম্বা সাদা লাউয়ের মতো, সূর্যের তাপে যাকে অবশ্যই সোনার মতো পরিপক্ক হয়ে উঠতে হবে।

জুলিয়েট অনুভব করে, সূর্যের আলো ওর দেহের অস্থি পর্যন্ত ঢুকে গেছে।

না, ঢুকে পড়েছে আরও গভীরে—ওর আবেগ, ওর চিন্তার ভেতরেও। ওর আবেগের ঘন উদ্বেগ এখন শিথিল হতে শুরু করেছে, গলতে শুরু করেছে রক্তের মতো জমাট বেঁধে থাকা ওর চিন্তার হিমপিণ্ডগুলি। প্রাণের গভীরে উত্তাপ অনুভব করতে শুরু করেছে জুলিয়েট। সূর্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে শোয় ও—সূর্যের তাপে গলে যেতে দেয় ওর কাঁধ, কোমর, উরুর পেছন দিক, এমন কি গোড়ালিও। বিস্ময়ে আধো বিহ্বল হয়ে শুয়ে শুয়ে ও ভাবে, এ কি হলো! ওর ক্লান্ত হিম-তুহিন হৃদয়টা যে গলে যাচ্ছে, গলে-গলে মিলিয়ে যাচ্ছে বাষ্প হয়ে!

পোশাক-আশাক পরে ফের একবার শুয়ে পড়ে জুলিয়েট। সাইপ্রেস গাছটার মাথার দিকে তাকিয়ে ছাখে, গাছটার নমনীয় চূড়া বাতাসে এধার থেকে ওধারে হেলে পড়ছে। ইতিমধ্যে মহান সূর্যের আকাশ-পরিক্রমা সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠেছে ও।

সূর্যের আলোয় প্রায় অন্ধ আর বিহ্বল হয়ে বাড়ি ফিরলো জুলিয়েট। এই অন্ধতা ওর কাছে যেন এক পরম ঐশ্বর্য। আর এই অস্পষ্ট, উষ্ণ, গাঢ় অর্ধ-সচেতনতা যেন এক দুর্লভ সম্পদ।

'মামন! মামন!' বাচ্চাটা ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এলো ওর দিকে। ছেলেটার পাখির মতো আশ্চর্য গলায় চাহিদার এক নিবিড় আর্তি। সব সময়েই ওকে চায় বাচ্চাটা। কিন্তু এই প্রথম ওর ডাকে সাড়া দেবার জন্যে কোনো সাগ্রহ ব্যাকুলতা অনুভব করলো না দেখে অবাক হলো জুলিয়েট। বাচ্চাটাকে দু হাতে উঁচু করে তুলে ধরলো ও, কিন্তু মনে মনে ভাবলো: ও এমন একটা মাংসপিণ্ড হয়ে থাকবে না। রোদ্দুর পেলেই ও সজীব হয়ে বেড়ে উঠবে।

বাচ্চাটা ছোটো ছোটো হাত দুটি দিয়ে বিশেষ করে ওর গলাটা আঁকড়ে ধরছিলো বলে খানিকটা বিরক্ত হলো জুলিয়েট। নিজের গলাটা টেনে সরিয়ে নিলো ও। ও চাইছিলো না, কেউ ওকে স্পর্শ করুক। বাচ্চাটাকে আস্তে করে নিচে নামিয়ে দিয়ে ও বললো, 'যাও, রোদ্দুরে গিয়ে ছোটাছুটি করো।'

এবং তক্ষুণি ছেলের সমস্ত পোশাক ছাড়িয়ে, ওকে নগ্নশরীরে উষ্ণ চত্বরটায় ছেড়ে দিলো জুলিয়েট। বললো, 'রোদের মধ্যে খেলা করো।'

বাচ্চাটা ভয় পেয়ে কাঁদতে চাইছিলো। কিন্তু জুলিয়েট শরীরভরা তপ্ত অবসাদ আর সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত মন নিয়ে একটা কমলা লেবু গড়িয়ে দিলো লাল-রঙা টালিগুলোর ওপর দিয়ে। বাচ্চাটা নিজের অপরিণত ছোট্ট শরীর নিয়ে টলোমলো পায়ে এগিয়ে গেলো লেবুটার দিকে। লেবুটার স্পর্শ অপরিচিত মনে হওয়ায়, সেটা হাতে তুলেই ফেলে দিলো বাচ্চাটা। তারপর নালিশের ভঙ্গিমায় ফিরে

তাকালো মায়ের দিকে, কান্নার প্রস্তাবনায় কুঁচকে উঠলো ওর মুখখানা। আসলে নিজের নগ্নতায় ও ভয় পাচ্ছিলো।

'লেবুটা আমাকে এনে দাও,' বাচ্চাটার ভয় পাওয়া সম্পর্কে নিজের এমন গভীর উদাসীনতায় অবাক হলো জুলিয়েট। 'মামনকে কমলা লেবুটা এনে দাও, সোনা!' মনে মনে ও বললো, 'বাচ্চাটা ওর বাবার মতো, যে পোকা কোনোদিনও সূর্য দেখেনি তার মতো, বড়ো হয়ে উঠবে না।'

ছেলের চিন্তা জুলিয়েটের মনে একটা বোঝার মতো, ছেলের দায়িত্ব ওর কাছে যেন অত্যাচার। বাচ্চাটাকে নিজের শরীরে বয়েছে বলে ওর সমস্ত অস্তিত্বের জন্যে যেন জুলিয়েটকেই জবাবদিহি দিতে হবে। এমন কি ওর নাক দিয়ে জল গড়ালেও জুলিয়েটের বিরূপ মনে যেন অঙ্কুশের খোঁচা লাগে—নিজেকে নিজেরই যেন বলতে হয়, 'ভ্যাখো, কি এক সন্তানের জন্ম দিয়েছো তুমি!'

কিন্তু এখন একটা পরিবর্তন এসেছে। বাচ্চাটার বিষয়ে এখন ও আর ততোটা আন্তরিক আগ্রহী নয়। ওর ওপর থেকে নিজের উদ্বেগ আর বাসনার বোঝা তুলে নিয়েছে জুলিয়েট। আর ছেলেটাও এতে আগের চাইতে বেশি সতেজ হয়ে উঠছে।

নিজের মনের গভীরে জুলিয়েট এখন সুদীপ্ত সূর্য আর তার সঙ্গে ওর মিলনের কথা ভাবে। ওর জীবন এখন একটা সম্পূর্ণ উপচার। সমুদ্রের প্রান্তসীমার মেঘ আছে কি না জানার জন্যে ও প্রতিদিন ভোর হবার আগে ঘুম ভেঙে বিছানায় শুয়ে শুয়ে লক্ষ্য করে, ধূসর আকাশটাতে ফিকে সোনালি রঙ লাগলো কিনা। গলিত সূর্যটা যখন নগ্ন হয়ে জেগে ওঠে, কোমল আকাশের বুকে ছুঁড়ে দেয় নীল শুভ্র আগুনের ঝলক—তখন জুলিয়েটের মন আনন্দে ভরে ওঠে।

সূর্য কখনও বড়োসড়ো লাজুক প্রাণীর মতো আরক্তিম, কখনও বা ক্রোধে লাল। আবার কখনও সে মেঘের আড়ালে সরে যায়। জুলিয়েট তখন তাকে দেখতে পায় না, শুধু মেঘের আড়াল থেকে ঝরে পড়ে লাল আর সোনা রঙ।

জুলিয়েট ভাগ্যবতী। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়—কোনো কোনো দিন সকালটা মেঘলা আর বিকেলটা ধূসর হলেও, সূর্যহীন অবস্থায় ওর কোনো দিন যায় না। শীতের বেলা হওয়া সত্ত্বেও আজকাল অধিকাংশ দিনই রোদে ঝলমলে হয়ে থাকে। মাটির বুকে জেগে ওঠে হালকা বেগনি রঙের ছোটো ছোটো ক্রোকাস ফুল, বুনো নার্সিসাসগুলো ঝুলে থাকে শীতের নক্ষত্রের মতো।

জুলিয়েট প্রতিদিন সেই হলদেটে পাহাড়ের ধারে কাঁটাঝোপের মধ্যে সেই

সাইপ্রেস গাছটার কাছ অব্দি চলে যায়। এখন ও আগের চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধিমতী আর কৌশলী হয়ে উঠেছে। তাই আজকাল ও শুধু একটা হালকা ধূসর রঙের চাদর গায়ে জড়িয়ে আর চটি পায়ে দিয়ে ওখানে চলে যায়, যাতে যে কোনো নির্জন নিরালায় মুহূর্তের মধ্যে ও সূর্যের কাছে নগ্ন হতে পারে। আবার গায়ে চাদর জড়ালেই ও হয়ে ওঠে ধূসর, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিশে অদৃশ্য হয়ে যায় তখুনি।

প্রতিদিন সকালে, একটু বেলার দিকে, ও সেই বিশাল সাইপ্রেস গাছের তলায় গিয়ে শুয়ে থাকে আর খুশিয়াল ভঙ্গিমায় সূর্য এগিয়ে চলে আকাশ পরিক্রমায়। এতোদিনে ও দেহের প্রতিটি স্নায়ু দিয়ে সূর্যকে চিনে নিয়েছে, ওর কোথাও আর এতোটুকু হিমেল ছায়া বাকি পড়ে নেই। শুধু একটি মাত্র পরিপক্ক বীজাধার রেখে সূর্যের তেজে খসে পড়া ফুলের মতো ওর সেই উদ্বিগ্ন, পীড়িত হৃদয়টাও গেছে সম্পূর্ণ উধাও হয়ে।

আকাশের ওই গলিত, নীল-আগুন-ঝরানো সূর্যকে জুলিয়েট চেনে। সমস্ত পৃথিবীতে আলো দেয় ওই সূর্য। কিন্তু জুলিয়েট যখন বিবস্ত্র হয়ে শুয়ে থাকে, তখন সূর্য নিজের সমস্ত রশ্মি ওর দিকেই কেন্দ্রীভূত করে তোলে। সূর্যের এ এক পরম বিস্ময়—এক সঙ্গে লক্ষ কোটি মানুষকে আলো ছড়িয়েও সে নিজের প্রদীপ্ত উজ্জ্বলতা নিয়ে শুধু ওর প্রতিই একাগ্র হয়ে উঠতে পারে।

সূর্য সম্পর্কে ওর উপলব্ধি এবং পার্থিব কামনার দিক দিয়ে সূর্যও ওকে জানে—এই বিশ্বাসবোধের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাছ থেকে নিজেকে কেমন যেন বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয় জুলিয়েটের। সমস্ত মানুষ জাতি সম্পর্কেই এক ধরনের ঘৃণা অনুভব করে ও। মানুষ বড়ো অ-মৌলিক, অ-প্রাকৃতিক—কবরখানার মাটির তলার পোকার মতো মানুষও সূর্যের স্পর্শে বঞ্চিত।

এমন কি যে সমস্ত কৃষকেরা তাদের গাধাগুলোকে নিয়ে প্রাচীন পাহাড়ি পথ ধরে যাতায়াত করে, সূর্যের তাপে তাদের গায়ের রঙ কালো হয়ে উঠলেও তাদের অন্তরে সূর্যের স্পর্শ লাগেনি। খোলার নিচে শামুকের শরীরের মতো মানুষের মনের গভীরেও ভীতির একটা ছোট্ট নরম সাদা কেন্দ্রবিন্দু রয়ে গেছে—সেখানে মানুষের আত্মা মৃত্যু এবং জীবনের স্বাভাবিক দীপ্তির ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকে। সর্বদা শুধু গুটিয়ে থাকা, পুরোপুরি বেরিয়ে পড়ার সাহস নেই। সমস্ত মানুষই এমনি।

তাহলে মানুষকে আর মেনে নেওয়া কেন!

মানুষের প্রতি নির্বিকার উদাসীনতায় জুলিয়েট এখন আর নিজেকে মানুষের

দৃষ্টির আড়ালে রাখার জন্যে আগের মতো অতোটা সতর্ক থাকে না। মারিনিনা ওর জন্যে গ্রামে জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে যায়। তাকে ও বলেছে, ডাক্তার ওকে সূর্যস্নান করতে বলেছেন। এটুকুই যথেষ্ট।

মারিনিনার বয়েস ষাটের ওপরে। লম্বা, রোগা, ঋজু চেহারা। মাথায় গাঢ় ধূসর রঙের কোঁকড়ানো চুল। গাঢ় ধূসর রঙের চোখ দুটিতে হাজার বছরের তীক্ষ্ণতা। আর হাসিতে শুধু দীর্ঘ অভিজ্ঞতার চিহ্ন। বিয়োগান্ত বেদনা আসলে অভিজ্ঞতারই অভাব।

মারিনিনা যেভাবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অন্য মহিলাদের দিকে তাকায়, তেমনিভাবে দু চোখে ধূর্ত হাসির ঝিলিক তুলে বললো, 'পোশাক-আশাক খুলে রোদে থাকতে নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগে!' মারিনিনা ম্যাগনা গ্রাসিয়ার মেয়ে, ওর মনে দূর অতীতের স্মৃতি। ফের জুলিয়েটের দিকে তাকিয়ে ও অতীতের মেয়েদের মতো রুদ্ধশ্বাসে এক বিচিত্র হাসি ছড়ালো, 'কিন্তু সেজন্যে তোমাকে সুন্দরী হতে হবে। তা না হলে সূর্যকে অপমান করা হয়। তাই নয় কি?'

'কে জানে আমি সুন্দরী কি না!' বললো জুলিয়েট।

কিন্তু সুন্দরী হোক বা না হোক, ও জানে যে সূর্য ওকে পছন্দ করেছে। যার অর্থ সেই একই।

রোদ না থাকলে মাঝে-মধ্যে দুপুরবেলা জুলিয়েট পাহাড়ি খাঁজটা থেকে পা টিপে টিপে গভীর গিরিখাতটাতে নেমে আসতো। সেখানে চিরন্তন ঠাণ্ডা ছায়ার রাজত্বে গাছে গাছে অসংখ্য লেবু। সেই নিবিড় স্তব্ধতায় কোনো একটা গভীর স্বচ্ছ সবুজ জলাশয়ে দ্রুত স্নান সেরে নেবার জন্যে গায়ের চাদর খসিয়ে ফেলতো ও। তারপর লেবুপাতার নিচে নগ্ন সবুজ গোধূলি আলোয় লক্ষ্য করতো, ওর সমস্ত দেহটা গোলাপী এবং গোলাপী থেকে ক্রমশ সোনালি হয়ে উঠছে। ওকে অন্য কারুর মতো মনে হতো। ও যেন অন্য কেউ।

তখন গ্রীকদের কথাটা মনে পড়তো ওর। গ্রীকরা বলতো: একটা সাদা, রোদ না লাগা শরীর সন্দেহজনক এবং অস্বাস্থ্যকর।

গায়ে সামান্য একটু জলপাই-তেল ঘষে জুলিয়েট অল্প কিছুক্ষণ সেই অন্ধকার লেবুবনে ঘুরে বেড়ায়, নাভিতে একটা লেবুফুল রাখার চেষ্টা করে হেসে ওঠে আপন মনে। কোনো চাষী ওকে দেখে ফেলতে পারে, এমন একটা সূক্ষ্ম সম্ভাবনা অবিশ্যি থাকে। কিন্তু তা হলে জুলিয়েট তাকে দেখে যতো না ভয় পাবে, সে জুলিয়েটকে দেখে ভয় পাবে আরও বেশি। পোশাকে ঢাকা মানুষের শরীরে ভয়ের সাদা কেন্দ্রবিন্দুটার কথা জুলিয়েট জানে।

জুলিয়েট জানে, ওর ছেলের মধ্যেও ভয়ের সেই কেন্দ্রবিন্দুটা রয়ে গেছে। ও রোদ ঝলমলে মুখে ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসে, তাই ছেলে এখন আর ওকে বিশ্বাস করে না। প্রতিদিন ও ছেলেকে জোর করে নগ্ন শরীরে রোদে হাঁটায়। এখন ওর ছোট্ট শরীরটাও গোলাপী হয়ে উঠেছে। সোনা রঙের ঘন চুলগুলো কপালের ওপর থেকে পেছন দিকে ঠেলে তোলা। রোদ-লাগা গায়ের চামড়ায় কোমল সোনালি আভা, গাল দুটো ডালিমের মতো রাঙা। ছেলেটা ভারি সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান। চাকরবাকরেরা ওর লাল আর নীলে-সোনায় মেশানো সৌন্দর্যকে ভালোবেসে ওকে স্বর্গের দেবদূত বলে ডাকে।

কিন্তু মাকে ও বিশ্বাস করে না, কারণ মা ওর দিকে তাকিয়ে হাসে। ছোট্ট ভ্রূকুটির নিচে ওর নীল আয়ত চোখ দুটিতে জুলিয়েট ভয়ের সেই কেন্দ্রটাকে দেখতে পায়। জুলিয়েটের ধারণা, প্রত্যেক পুরুষমানুষেরই চোখের মাঝখানে ওই আতঙ্কের আবাস। জুলিয়েট একে 'সূর্যাতঙ্ক' বলে।

'ও সূর্যকে ভয় পায়,' ছেলেটার চোখের দিকে তাকিয়ে জুলিয়েট অস্ফুটে নিজেকে বলে।

পাখির মতো কিচিরমিচির শব্দ তুলে ছেলেটাকে টলোমলো পায়ে রোদের মধ্যে চলতে ফিরতে আছাড় খেতে দেখে জুলিয়েটের মনে হয় খোলসের মধ্যে থাকা শামুকের মতো ও নিজের প্রাণ-চাঞ্চল্যকে একটা ভিজে স্যাঁতসেঁতে খোলসের মধ্যে শক্ত করে আটকে রেখেছে, লুকিয়ে রেখেছে সূর্যের কাছ থেকে। দেখতে দেখতে ছেলের বাবার কথা মনে হয় ওর। মনে হয়, ও যদি মানুষটাকে এগিয়ে আনতে পারতো! যদি সে জীবনকে অভিবাদন জানাতে বেপরোয়া হয়ে ভেঙে ফেলতে পারতো নিজের খোলসটাকে!

জুলিয়েট স্থির করে, ছেলেকে ও কাঁটাগাছগুলোর মাঝখানে সেই সাইপ্রেস গাছটার কাছে নিয়ে যাবে। কাঁটাগুলোর জন্যে ছেলের দিকে ওকে নজর রাখতে হবে বটে, কিন্তু ওখানে গেলে ছেলেটা নিশ্চয়ই নিজের ভেতরকার ছোট্ট খোলসটাকে ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসবে। তখন সভ্যতার ছোট্ট উদ্বেগটুকু উধাও হয়ে যাবে ওর ভ্রূ দুটি থেকে।

একটা কম্বল পেতে ছেলেটাকে তার ওপরে বসিয়ে দেয় জুলিয়েট। তারপর নিজের গায়ের চাদরটা খসিয়ে শুয়ে শুয়ে লক্ষ্য করে নীল আকাশের বুকে অনেক উঁচুতে উড়তে থাকা একটা বাজপাখি আর সাইপ্রেস গাছের নুয়ে পড়া চুড়োটাকে।

ছেলেটা কম্বলে বসে পাথর নিয়ে খেলা করছিলো। তারপর সে টলোমলো

পায়ে এগুতে যেতেই জুলিয়েট উঠে বসলো। পেছন দিকে ফিরে ওর দিকে তাকালো ছেলেটা। ওর নীল চোখ দুটিতে অভিযোগের ভাষা, ঠিক যেন সত্যিকারের পুরুষমানুষের উষ্ণ দৃষ্টি। ছেলেটা সত্যিই সুদর্শন। গোলাপী রঙের শরীরে সোনালি রঙের রোম। গায়ের রঙ এখন আর ঠিক ফর্সা নয়, ঘন সোনালি।

'দেখো সোনা, কাঁটা আছে কিন্তু!' বললো জুলিয়েট।

'কাঁটা!' পাখির মতো কিচিরমিচির করে ওর কথার প্রতিধ্বনি তোলে বাচ্চাটা। তখনও ও কাঁধের ওপর থেকে মুখ ঘুরিয়ে জুলিয়েটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ঠিক যেন ছবিতে আঁকা নগ্ন এক দেবশিশু।

'বিচ্ছিরি কাঁটা।'

'বিছছিরি কাঁটা!'

ছোট্ট চটিটা পায়ে গলিয়ে পাথরের ওপর দিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে চলে ছেলেটা। কিন্তু ও কাঁটা ঝোপের ওপরে গিয়ে পড়ার আগেই জুলিয়েট সরীসৃপের মতো ক্ষিপ্রতায় এক লাফে ওর কাছে পৌঁছে যায়। নিজের ক্ষিপ্রতায় নিজেই অবাক হয় ও। মনে মনে বলে, 'সত্যিই, আমি একটা বন-বেড়ালী!'

রোদ থাকলে জুলিয়েট প্রতিদিনই ছেলেকে সাইপ্রেস গাছটার কাছে নিয়ে যায়।

বলে, 'চলো, আমরা সাইপ্রেস গাছের কাছে যাই।'

আর মেঘলা দিনে এলোমেলো দমকা বাতাস বইলে ও যখন বাইরে বেরুতে পারে না, তখন বাচ্চাটা অনবরত শুধু বলে, 'সাইপ্রেস গাছ! সাইপ্রেস গাছ!'

জুলিয়েটের মতো বাচ্চাটাও এখন গাছটার জন্যে অভাব অনুভব করে।

এ তো শুধু সূর্যস্নান নয়, এ তার চাইতেও অনেক কিছু বেশি। জুলিয়েটের মনের গভীরে কি যেন ভাঁজ খুলে শিথিল হয়ে ওঠে। ওর পরিচিত চেতনা আর বাসনার গভীরে থাকা কোনো এক রহস্যময় শক্তিস্রোত ওকে সূর্যের সঙ্গে যুক্ত করিয়ে দেয়—স্রোতটা যেন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বেরিয়ে আসে ওর জরায়ু থেকে। জুলিয়েট নিজে, ওর সচেতন সত্তা—এখানে গৌণ, অপ্রধান, প্রায় একজন দর্শক। আর ওর দেহের গভীর থেকে সূর্যের দিকে বয়ে যাওয়া ওই রহস্যময় স্রোতটাই সত্যিকারের জুলিয়েট।

চিরদিন জুলিয়েট নিজেই নিজের কর্তৃত্ব করেছে। ও কি করছে না করছে, সে সম্পর্কে ও চিরদিনই সচেতন—নিজের শক্তির রাশ ও নিজেই সামলে রেখেছে চিরকাল। কিন্তু এখন ও নিজের গভীরে এক সম্পূর্ণ অন্য ধরনের শক্তির অস্তিত্ব

অনুভব করে। এ শক্তি ওর নিজের চাইতে প্রবল, এ শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত। এখন ও নিজে অস্পষ্ট, অনিশ্চিত—কিন্তু এমন এক শক্তির অধিকারী যা ওকেও ছাপিয়ে গেছে।

ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি হঠাৎ খুব গরম পড়লো। এখন সামান্য একটু হাওয়ার স্পর্শেই কাগজি-বাদামের ফুলগুলো হালকা গোলাপী রঙের তুষারের মতো ঝরে ঝরে পড়ে। চারদিকে ফিকে বেগনি রঙের ছোটো ছোটো রেশমি অ্যানিমোন ফুল আর লম্বা ডাঁটির অ্যাসফোডেল। সমুদ্রটা ঝুমকো ফুলের মতো নীল।

জুলিয়েট আজকাল কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছে। এখন অধিকাংশ দিনই ও বাচ্চাটাকে নিয়ে নগ্ন শরীরে রোদ্দুরে থাকে এবং এর চাইতে বেশি আর কিছুই ও চায় না। মাঝে মাঝে ও স্নান করার জন্যে সমুদ্রে গিয়ে নামে এবং প্রায়ই রোদে-ভরা গিরিখাতগুলোতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। কখনও বা গাধা নিয়ে চলা কোনো চাষীর সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যায়, সেও দেখে ওকে। কিন্তু ছেলেকে নিয়ে ও তখন সহজ আর শান্ত ভাবে চলে যায়। দেহ আর মনের নিরাময়ে সূর্যশক্তির সুনাম ইতিমধ্যেই সকলের মধ্যে এতো ছড়িয়ে পড়েছে যে আজকাল এতে আর কোনো চাঞ্চল্যও জাগে না।

বাচ্চাটা আর জুলিয়েট—দুজনেরই সর্বাঙ্গ এখন রোদে পুড়ে গাঢ় সোনালি হয়ে উঠেছে। নিজের আরক্তিম সোনালি স্তন আর উরুর দিকে তাকিয়ে জুলিয়েট নিজেই নিজেকে বলে, 'এখন আমি এক অন্য মানুষ!'

বাচ্চাটাও এখন অন্য রকম হয়ে উঠেছে। ওর মধ্যে এক আশ্চর্য প্রশান্তি আর সূর্য-গাঢ় তন্ময়তা। এখন ও নিজের মনেই নিঃশব্দে খেলা করে, ওর দিকে জুলিয়েটের লক্ষ্য রাখার কোনো প্রয়োজনই প্রায় হয় না। ও যেন বুঝতেও পারে না, কখন ও একা রয়েছে।

কোথাও এক ফোঁটা বাতাস নেই, সমুদ্রে ঘন নীল রঙ। সাইপ্রেস গাছটার থাবার মতো বিশাল শিকড়ের পাশে বসে রোদে ঢুলছিলো জুলিয়েট। অথচ ওর স্তন দুটি তখনও সজাগ, প্রাণরসে ভরা। জুলিয়েট অনুভব করছিলো, ওর মধ্যে একটা প্রাণচাঞ্চল্য জেগে উঠছে যা ওকে জীবনের এক নতুন পথে নিয়ে যাবে। অথচ এ চাঞ্চল্য সম্পর্কে ও সচেতন হতে চাইছিলো না। কারণ সভ্যতার শীতল প্রাণহীন বিশাল যন্ত্রটাকে ও ভালো করেই জানে এবং এও জানে যে যন্ত্রটাকে এড়িয়ে চলা খুবই কঠিন।

পাহাড়ি পথটা ধরে একটা কাঁটাগাছের বিশাল ব্যাপ্তির ওধারে কয়েক গজ এগিয়ে গিয়েছিলো বাচ্চাটা। জুলিয়েট ওকে দেখতে পাচ্ছিলো। ওর মনে হচ্ছিলো, পোড়া-সোনার মতো চুল আর আরক্তিম গাল এক সত্যিকারের স্বর্ণকান্তি দেবশিশু যেন ছোটো ছোটো ফুটকি দেওয়া ঘটপত্রী ফুলগুলোকে সংগ্রহ করে সারি দিয়ে সাজিয়ে রাখছে। এখন ও আর চলতে গিয়ে টলে না, প্রয়োজনমতো দ্রুত নিজেকে সামলে নিতে পারে।

একটা বাচ্চা জন্তুর মতো নিবিষ্ট হয়ে নিঃশব্দে খেলছিলো বাচ্চাটা। হঠাৎ ওর ডাক শুনতে পেলো জুলিয়েট, 'ছাখো মামন, ছাখো!'

ওর পাখির মতো কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার সুর শুনে জুলিয়েট একটু ঝুঁকে সামনের দিকে তাকাতেই ওর হৃৎপিণ্ড নিস্পন্দ হয়ে গেলো। ছেলেটা ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে আর ছোট্ট একখানা আলতো হাত তুলে গজ খানেক দূরে মাথা তুলে দাঁড়ানো একটা সাপকে দেখাচ্ছে। মুখ খুলে হিসহিস শব্দ করছে সাপটা, নরম দো-ফলা জিভটা লকলক করছে একটা কালো ছায়ার মতো।

'মামন, ছাখো!'

'দেখেছি, সোনা। ওটা একটা সাপ!' ধীর-গম্ভীর স্বরে বললো জুলিয়েট।

মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলো বাচ্চাটা। ওর আয়ত নীল চোখ ছুটিতে দ্বিধার ছোঁয়া—যেন বুঝতে পারছে না সাপটাকে ভয় পাবে কি না। তবু মায়ের মুখে ফুটে ওঠা স্বর্যের প্রশান্তি ওকে আশ্বস্ত করে তুললো।

'সাপ!' আধোভাষে বললো ছেলেটা।

'হ্যাঁ, সোনা! ওকে ছুঁয়ো না কিন্তু, ও কামড়ে দিতে পারে।'

সাপটা তখন মাথা নামিয়ে কুণ্ডলী খুলে নিজের দীর্ঘ বাদামি-সোনা দেহটাকে নিয়ে ধীরেসুস্থে এঁকেবেঁকে পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিলো। ছেলেটা সেদিকে ফিরে নিঃশব্দে খানিকক্ষণ সাপটাকে লক্ষ্য করে বললো, 'সাপ চলে যাচ্ছে!'

'হ্যাঁ, বাবা! ওকে যেতে দাও, ও একা থাকতে ভালোবাসে।'

সাপটা দৃষ্টির আড়ালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ওর ধীর দীর্ঘায়িত শরীরটার দিকে তাকিয়ে রইলো ছেলেটা। তারপর বললো, 'সাপ চলে গেছে।'

'হ্যাঁ, চলে গেছে। এবারে তুমি মামনের কাছে একটু এসো তো সোনা!'

ছেলেটা এগিয়ে এসে নিজের গোলগাল ছোট্ট নগ্ন শরীরটা নিয়ে জুলিয়েটের নিরাবণ কোলে বসলো। জুলিয়েট ওর রোদে পোড়া ঝলমলে চুলগুলোকে হাত

বুলিয়ে ঠিকঠাক করে দিলো, কিন্তু কিছুই বললো না। ও অনুভব করছিলো, সমস্ত উদ্বেগই এখন শেষ হয়ে গেছে। সূর্যের স্নিগ্ধ করে তোলার আশ্চর্য শক্তি যেন একটা জাদুর মতো ওকে, এই সম্পূর্ণ জায়গাটাকে, একেবারে ভরিয়ে তুলেছে। এবং জুলিয়েট আর এই বাচ্চাটার মতো সাপটাও এই জায়গাটারই অংশবিশেষ।

আর একদিন জুলিয়েট এক জলপাইবীথির শুকনো পাথুরে দেয়াল দিয়ে একটা কালো সাপকে এগিয়ে যেতে দেখলো।

'মারিনিনা, আমি একটা কালো সাপ দেখেছি। ওগুলো কি কোনো ক্ষতি করতে পারে ?'

'না, কালো সাপ তা পারে না ! কিন্তু হলদেগুলো পারে। সাপে কাটলেই মৃত্যু ! তবে কিনা সাপ দেখলেই আমার ভয় করে, কালো সাপ দেখলেও।'

জুলিয়েট তবুও বাচ্চাটাকে নিয়ে সাইপ্রেস গাছটার কাছে যায়। কিন্তু বসার আগে চারদিক ভালো করে দেখে নেয়—বাচ্চাটা যে সমস্ত জায়গায় যেতে পারে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নেয় সেই জায়গাগুলোকে। তারপর আবার সূর্যের দিকে মুখ রেখে শুয়ে পড়ে। ওর তামাটে, নাশপাতির মতো স্তন দুটি উদ্ধত হয়ে থাকে আকাশের দিকে। আগামীকালের কোনো চিন্তা ও মনে রাখে না। নিজের বাগানটুকুর বাইরে আর কিছুই ও চিন্তা করতে চায় না। নিজে চিঠিও লেখে না—তবে নার্সকে চিঠি লিখে দিতে বলে।

মার্চ মাস। সূর্যটা ক্রমশ আরও প্রখর হয়ে উঠছে। দিনের উষ্ণ প্রহর-গুলোতে জুলিয়েট গাছের ছায়ায় শুয়ে থাকে অথবা সেই ঠাণ্ডা লেবু গাছগুলোর গভীরে নেমে যায়। বাচ্চাটা দূরে দূরে ছুটে চলে—ঠিক যেন প্রাণের মধ্যে বিভোর হয়ে থাকা একটা তরুণ প্রাণীর মতো।

একদিন বড়োসড়ো একটা জলের কুণ্ডে স্নান সেরে জুলিয়েট গিরিখাতের দুরন্ত ঢালে বসে রোদ পোহাচ্ছিলো। নিচে, লেবু গাছগুলোর তলায়, বাচ্চাটা ছায়ায় ফুটে থাকা হলুদ-রঙা অকসালিস ফুলগুলোর মধ্যে ঘুরে ঘুরে খসে পড়া লেবুগুলোকে কুড়োচ্ছিলো আর ওর তামাটে ছোট্ট শরীরটাতে ফুটে উঠছিলো আলোছায়ার বিচিত্র নকশা। হঠাৎ অনেক উঁচুতে, পূর্ণ আলোকিত বিবর্ণ নীল আকাশের পটভূমিকায়, পাহাড়ের ধারে, মারিনিনা এসে হাজির হলো। ওর মাথায় এক টুকরো কালো কাপড় বাঁধা। শান্ত গলায় ও ডাকলো, 'সিনোরা ! সিনোরা জুলিয়েত্তা !'

মুখ ঘুরিয়ে উঠে দাঁড়ালো জুলিয়েট। মাথায় রোদে বিবর্ণ হয়ে ওঠা শুভ্র চুলের মেঘ নিয়ে তৎপর ভঙ্গিমায় উঠে দাঁড়ানো ওই নগ্ন নারীমূর্তিটিকে দেখে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো মারিনিনা। তারপর দ্রুত পায়ে নেমে এলো ঢাল বেয়ে।

রৌদ্র-রঙা রমণীর কাছাকাছি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলো বৃদ্ধা।

'সত্যি, তুমি কি সুন্দর!' শান্ত, প্রায় বিষণ্ন স্বরে বললো ও। 'শোনো, ওই যে তোমার স্বামী।'

'আমার স্বামী!' চিৎকার করে উঠলো জুলিয়েট।

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তীক্ষ্ণ স্বরে বৃদ্ধা হাসলো।

'কেন, তোমার তো একটি স্বামী আছেন—তাই নয় কি?'

'কিন্তু সে কোথায়?'

বৃদ্ধা ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকালো।

'আমার পেছন-পেছনই আসছিলেন। তবে পথ খুঁজে পাননি বোধ হয়।' শব্দ করে ফের একটু হাসলো মহিলা।

ঘাস আর ফুলে ফুলে পথগুলো উঁচু হয়ে ঢেকে গেছে। ঠিক যেন একটা আদিম বন্য জায়গা। সভ্যতার আদিম অঞ্চলে এ এক আশ্চর্য প্রাণময় বন্যতা, এ বন্যতা শুষ্ক বা কঠোর নয়।

চিন্তিত চোখে পরিচারিকার দিকে তাকালো জুলিয়েট। তারপর বললো, 'বেশ তো! আসুক এখানে।'

'এখানে আসবেন? এখন?' মারিনিনার হাসিভরা ঘোলাটে চোখ দুটো বিদ্রূপের দৃষ্টিতে ভরে ওঠে। তারপর দু কাঁধে সামান্য ঝাঁকুনি তুলে বলে, 'ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে! তবে ওঁর পক্ষে এটা একটা দুর্লভ দৃশ্য হবে!'

শব্দহীন আনন্দের হাসিতে মুখ খুললো মারিনিনা। তারপর বুকের কাছে লেবু জড়ো করতে থাকা বাচ্চাটাকে দেখিয়ে বললো, 'বাচ্চাটা কি সুন্দর, ছাখো! ওকে দেখে সে বেচারা নিশ্চয়ই খুশি হবেন। তাহলে আমি ওঁকে নিয়ে আসিগে।'

'আনো,' বললো জুলিয়েট।

বৃদ্ধা হামাগুড়ি দিতে দিতে পথ ধরে দ্রুত ওপরে উঠে গেলো। আঙুর-বাগানের মাঝখানে বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো মরিস। তার মাথায় ধূসর রঙের ফেল্ট টুপি, পরনে ধূসর-রঙা স্যুট। ঝলমলে রোদ আর

প্রাচীন গ্রীক পৃথিবীর শোভার মাঝখানে একেবারেই খাপছাড়া বলে মনে হচ্ছিল মানুষটাকে। মনে হচ্ছিলো যেন এক ফোঁটা কালির কলঙ্ক।

'আসুন!' মারিনিনা বললো, 'উনি নিচে রয়েছেন।'

ঘাসের ভেতর দিয়ে বড়ো বড়ো পা ফেলে ও দ্রুত মানুষটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। তারপর উৎরাইয়ের মুখটাতে এসে থমকে দাঁড়ালো হঠাৎ। অনেক নিচে লেবু গাছগুলোর অন্ধকার চূড়া।

'আপনি—আপনি এখান দিয়ে নেমে যান,' মরিসকে বললো মারিনিনা। চকিতে মহিলার দিকে তাকিয়ে মরিস ওকে ধন্যবাদ জানালো।

মরিসের বয়েস চল্লিশ, পরিষ্কারভাবে দাঁড়ি-গোঁফ কামানো পাণ্ডুর মুখ, ভীষণ শান্ত আর সত্যিকারের লাজুক। কোনো চমকপ্রদ সফলতা না পেলেও নিজের ব্যবসাটাকে সে সযত্নে আর সুন্দরভাবেই সামলে চলে। কাউকে বিশ্বাস করে না। ম্যাগনা গ্রাসিয়ার বৃদ্ধাটি এক পলক দেখেই বুঝেছিলো: মানুষটা ভালো, তবে বেচারা সত্যিকারের পুরুষমানুষ নয়।

'সিনোরা ওই নিচে রয়েছেন,' নিয়তির মতো আঙুল তুলে দেখালো মারিনিনা।

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ!' বিনা উচ্ছ্বাসে ফের ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাবধানে পা বাড়ালো মরিস। খুশিভরা দুষ্টুমিতে মুখখানা ওপরের দিকে তুলে মারিনিনা বাড়ির দিকে ফিরে গেলো।

ভূমধ্যসাগরীয় ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে সতর্ক পায়ে নামছিলো মরিস। তাই জুলিয়েটের একেবারে কাছাকাছি এসে ছোট্ট বাঁকটা না ঘোরা অব্দি সে ওকে দেখতে পায়নি। পাহাড়ি খাঁজটার কাছে নগ্ন শরীরে ঋজু ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়েছিলো জুলিয়েট। রোদ আর প্রাণের উত্তাপে ঝলমল করছিলো ওর সমস্ত শরীর। স্তন দুটি যেন উদ্ধত, সতর্ক, যেন কি শোনার জন্যে প্রস্তুত। উরু দুটি বাদামি। চোষ-কাগজে কালির ফোঁটার মতো মরিস ধীরে ধীরে ওর কাছে এগিয়ে আসতেই, জুলিয়েট চকিতে ভয়ে ভয়ে মরিসের দিকে তাকালো। মরিস, বেচারা মরিস, অপ্রস্তুতভাবে ওর দিক থেকে চোখ সরিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘোরালো তখন।

'এই যে, জুলি!' অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে সামান্য কাশলো মরিস, 'অপূর্ব! বাঃ, অপূর্ব!'

মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখলেও মাঝে মাঝে জুলিয়েটের দিকে তাকাতে তাকাতে এগুতে লাগলো মরিস। জুলিয়েটের তামাটে ত্বকে সূর্যের এক আশ্চর্য

রেশমি দীপ্তি। যে কোনো কারণেই হোক, ওর নগ্নতাকে যেন ততোটা প্রকট বলে মনে হচ্ছিলো না। সূর্যের সোনালি আভাই যেন ওর আবরণ হয়ে রয়েছে।

'এসো, মরিস!' মানুষটার কাছ থেকে নিজেকে একটু পেছিয়ে আনলো জুলিয়েট, 'তুমি এতো শীগগিরি আসবে বলে আমি আশা করিনি।'

'না, মানে—কোনো রকমে একটু আগে আগে পালিয়ে এলাম, আর কি!'

অপ্রস্তুতভাবে ফের একটু হাসলো মরিস।

পরস্পরের কাছ থেকে বেশ কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে রইলো দুজনে। দুজনেই নিশ্চুপ।

'ইয়ে, মানে—অপূর্ব! অপূর্ব লাগছে তোমাকে!' মরিস শুধালো, 'তা, ইয়ে···মানে ছেলেটা কোথায়?'

'ওই তো,' ঘন ছায়ায় গাছ থেকে খসে পড়া লেবুগুলোকে জড়ো করতে থাকা উলঙ্গ ছেলেটাকে আঙুল তুলে দেখালো জুলিয়েট।

ছেলের বাবা অদ্ভুতভাবে সামান্য হাসলো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ– ওই তো! ওই তো, ছোট্টখাট্টো মানুষটি! বাঃ, চমৎকার!' মরিসের ভীতু, চেপে রাখা মনটা সত্যিই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো, 'এই যে, জনি! জনি!' ছেলেকে ডাকলো মরিস, কিন্তু ডাকটা যেন খানিকটা দুর্বল শোনালো।

বাচ্চাটা চোখ তুলে তাকালো, ওর গোলগাল হাত দুটি থেকে লেবুগুলো খসে পড়লো, কিন্তু ও কোনো জবাব দিলো না।

'মনে হচ্ছে, আমাদেরই ওর কাছে যেতে হবে,' জুলিয়েট মুখ ঘুরিয়ে পথ ধরে নিচে নামতে শুরু করলো। মরিস অনুসরণ করলো ওকে। কোমরের মৃদু আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জুলিয়েটের নিতম্ব দুটির দ্রুত ওঠা-নামা দেখে মরিস মুগ্ধ বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে উঠলো। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেকে ভীষণ অসহায় বলে মনে হলো তার। নিজেকে নিয়ে সে কি করবে? গাঢ় ধূসর রঙা স্যুট, ফ্যাকাশে রঙের টুপি, লাজুক ব্যবসাদারের সাদামাটা পাণ্ডুর মুখ—সবকিছু নিয়ে এখানে সে একেবারেই খাপছাড়া।

'ছেলেটাকে দেখে মনে হয় ভালোই আছে—তাই না?' হলুদ-রঙা অকসালিস ফুলের অথৈ সমুদ্র পেরিয়ে লেবু গাছগুলোর তলায় এসে জিগেস করলো জুলিয়েট।

'অ্যাঁ—হ্যাঁ, হ্যাঁ! চমৎকার, অপূর্ব! কি গো জনি, তুমি কি তোমার বাপিকে চেনো? চেনো তোমার বাপিকে?' নিচু হয়ে হাত দুটোকে বাড়িয়ে দিলো মরিস।

'কতো লেবু!' বাচ্চাটা আধোভাবে বললো, 'দুটো লেবু!'

'দুটো লেবু!' মরিস বললো, 'অনেক লেবু।'

বাচ্চাটা এগিয়ে এসে বাবার দু হাতে দুটো লেবু তুলে দিলো। তারপর বাবাকে দেখবে বলে একটু পেছিয়ে দাঁড়ালো।

'দুটো লেবু।' ফের বললো মরিস। 'এসো জনি! এগিয়ে এসে বাপিকে একটু ডাকো তো, সোনা!'

'বাপি চলে যাচ্ছো?' বাচ্চাটা শুধালো।

'চলে যাচ্ছি? না, মানে আজকে না।'

দু হাতে ছেলেকে তুলে নিলো মরিস।

'কোট খোলো! বাপি তুমি কোট খোলো!' ছেলেটা ছটফট করে মরিসের পোশাকের সৌষ্ঠব নষ্ট করে দেয়।

'ঠিক আছে, সোনা! বাপি কোট খুলছে।'

গায়ের কোট খুলে সযত্নে সেটা এক পাশে রেখে, ফের ছেলেকে তুলে নিলো মরিস। নগ্নিকা জুলিয়েট শুধু শার্ট পরা মানুষটার কোলে উলঙ্গ শিশুটার দিকে তাকালো। ছেলেটা ততোক্ষণে বাবার টুপিটাকেও টেনে খুলে ফেলেছে। স্বামীর পাতা কেটে আঁচড়ানো কাঁচা-পাকা চুলগুলোর দিকে তাকালো জুলিয়েট। একটি চুলও এধার-ওধারে এলোমেলো হয়ে নেই। ঘরমুখো, প্রচণ্ড ঘরমুখো মানুষ। অনেকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইলো ও। আর ততোক্ষণ বাবা কথা বলে চললো ছেলের সঙ্গে। ছেলেটা ভালোবাসে ওর বাপিকে।

'এ ব্যাপারে তুমি কি করবে, মরিস?' আচমকা প্রশ্ন করলো জুলিয়েট।

চকিতে আড়চোখে ওর দিকে তাকালো মরিস।

'ইয়ে—মানে, কোন্ ব্যাপারে, জুলি?'

'সমস্ত ব্যাপারেই। এ ব্যাপারেও। আমি আর সেই ইস্ট ফর্টিসেভেনথ স্ট্রীটে ফিরে যেতে পারবো না।'

'ইয়ে—না, তা অবিশ্যি নয়।' মরিস ইতস্তত করে, 'অন্তত এখন তো নয়ই।'

'কোনোদিনও না,' জবাব দিলো জুলিয়েট। তারপর স্তব্ধতা।

'ইয়ে—মানে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না,' মরিস বললো।

'তোমার কি মনে হয়? তুমি কি এখানে চলে আসতে পারবে?' জুলিয়েট জিগেস করলো।

'হ্যাঁ! মাসখানেক এসে থাকতে পারবো। মনে হয় এক মাসের মতো বন্দোবস্ত করে ফেলা যাবে।' সামান্য ইতস্তত করলো মরিস। তারপর সাহস করে লাজুক চোখে জুলিয়েটের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে, ফের মুখ লুকিয়ে নিলো।

জুলিয়েট স্বামীর দিকে তাকালো। একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে উঁচু হয়ে উঠলো ওর সতর্ক স্তন দুটি। যেন এক অস্থিরতার বাতাস কাঁপিয়ে দিলো ওর স্তন দুটিকে।

'আমি ফিরে যেতে পারবো না।' ধীরে ধীরে ও বললো, 'এমন সূর্যকে ছেড়ে আমি ফিরে যেতে পারি না। তুমি যদি এখানে আসতে না পারো…'

অসমাপ্ত রেখেই কথাটা শেষ করলো জুলিয়েট। চোরাচোখে বারবার ওর দিকে তাকালো মরিস। কিন্তু বিভ্রান্তি কমে গিয়ে ক্রমশ তার মনে মুগ্ধতাবোধ বেড়ে উঠতে লাগলো।

'না।' মরিস বললো, 'এ সব কিছুই তোমার পক্ষে ভালো। কতো সুন্দর হয়ে উঠেছো তুমি! না, আমার মনে হয় না তুমি আর ফিরে যেতে পারবে।'

নিউইয়র্কের ফ্ল্যাটটাতে জুলিয়েটকে ভাবছিলো মরিস। সেখানে সেই বিবর্ণ মৌন জুলিয়েটকে দেখে ভীষণ মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করতো সে। মানবিক সম্পর্কের দিক দিয়ে মরিস শান্ত এবং ভীরু প্রকৃতির মানুষ। বাচ্চাটা জন্মাবার পর জুলিয়েটের নিশ্চুপ অথচ ভয়ঙ্কর বিরোধিতা তাকে গভীরভাবে শঙ্কিত করে তুলেছিলো। কারণ সে বুঝতে পেরেছিলো, এ ছাড়া জুলিয়েটের আর কোনো পথ নেই। সমস্ত মেয়েই এমনি। ওদের অনুভূতিগুলো একটা বিপরীত পথ খুঁজে নেয়, এমন কি ওদের নিজেদের বিরুদ্ধেও চলে যায় এবং তখন সেটা ভয়ঙ্কর—একেবারে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। যে মেয়ের অনুভূতিগুলো তার নিজের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়িয়েছে, তেমন কোনো মেয়ের সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করা একেবারে ভয়াবহ! মরিসের মনে হতো, জুলিয়েটের অসহায় বিরোধিতার যাঁতাকলে সে যেন চাপা পড়ে গেছে। চাপা পড়েছে জুলিয়েট এবং সেই সঙ্গে ওদের বাচ্চাটাও। না, তার চাইতে বরং অন্য যা কিছু হোক—তাই-ই ভালো।

'কিন্তু তুমি কি করবে?' জুলিয়েট জানতে চাইলো।

'আমি? তা আমি ধরো—ইয়ে—মানে যদ্দিন তুমি এখানে থাকতে চাও, তদ্দিন আমি ব্যবসাপত্তর চালাবো আর ছুটিছাটায় এখানে আসবো। তোমার যদ্দিন এখানে থাকতে ইচ্ছে হয়, থাকো।' বেশ কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে মরিস চোখ তুলে জুলিয়েটের দিকে তাকালো। তার অস্বস্তিভরা দৃষ্টিতে এক সনির্বন্ধ মিনতির স্পর্শ।

'চিরদিনের জন্যে হলেও?'

'হ্যাঁ—মানে, তুমি যদি তাই চাও। চিরদিন মানে অনেকটা সময়। তার মধ্যে তো একটা তারিখ ঠিক করে দেওয়া যায় না!'

'আর…আমি যা খুশি তা-ই করতে পারি?' প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃষ্টিতে সরাসরি

মরিসের চোখের দিকে তাকালো জুলিয়েট। ওর গোলাপী, বাতাসে কঠোর হয়ে ওঠা নগ্নতার কাছে মরিস একেবারে অক্ষম, অসহায়।

'হ্যাঁ, ইয়ে—মানে, তা পারো বইকি! মানে, যতোক্ষণ তুমি নিজেকে বা ছেলেটাকে অখুশি করে না তুলছো—ততোক্ষণ অব্দি।'

ফের এক জটিল, অস্বস্তিময় আবেদন নিয়ে জুলিয়েটের দিকে তাকালো মরিস। তার মনে বাচ্চাটার চিন্তা আর নিজের সম্পর্কে আশা।

'তা আমি করবো না,' দ্রুত জবাব দিলো জুলিয়েট।

'না, না! আমারও মনে হয় না, তুমি তা করবে।'

তারপর দুজনেই চুপ। গ্রামের ঘণ্টাগুলোতে দ্রুতলয়ে দুপুরের সংকেত বাজলো। তার অর্থ, দুপুরের খাওয়ার সময়।

ক্রেপ কাপড়ের ধূসর কিমোনোটা গায়ে গলিয়ে কোমরে সবুজ কাপড়ের একটা চওড়া পট্টি বেঁধে নিলো জুলিয়েট। তারপর ছেলেটার মাথা দিয়ে ছোট্ট একটা নীল জামা গলিয়ে, সবাই মিলে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

টেবিলে বসে স্বামীকে ভালো করে লক্ষ্য করলো জুলিয়েট। লক্ষ্য করলো মানুষটার শহুরে পাণ্ডুর মুখ, পরিপাটি করে আঁচড়ানো কাঁচা-পাকা চুল, টেবিলে বসে খাওয়ার নিখুঁত আদবকায়দা, পান ও ভোজনের চরম পরিমিতিবোধ—সবকিছুই। অল্প বয়সে বন্দী হয়ে আজীবন বন্দীদশায় কাটানো জন্তুর মতো মানুষটার চোখ দুটো সোনালি-ধূসর।

কফি খাওয়ার জন্যে ওরা বারান্দায় গেলো। নিচে, অনেক দূরে, ছোট্ট খাড়াই গিরিখাতটার ওধারে সবুজ গমক্ষেতটার কাছে মাটিতে একখণ্ড সাদা কাপড় বিছিয়ে এক চাষী আর তার স্ত্রী একটা কাগজি-বাদাম গাছের তলায় বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলো। ওদের সামনে মস্ত বড়ো একখণ্ড রুটি আর কয়েক গ্লাস ঘন রঙের মদ।

জুলিয়েট স্বামীকে ওই ছবিটার দিকে পেছন করে বসালো আর নিজে বসলো মুখোমুখি হয়ে। কারণ ও আর মরিস বারান্দায় আসতেই চাষীটা মুখ তুলে তাকিয়েছিলো।

দূর থেকে দেখে ওই চাষীকে জুলিয়েট বেশ ভালোভাবেই চেনে। লোকটা একটু মোটাসোটা, খুব চওড়া শরীর, বয়েস প্রায় পঁয়ত্রিশ, মুখভর্তি করে রুটি নিয়ে চিবোয়। ওর স্ত্রীর মুখখানা কঠোর, সুন্দর আর বিষণ্ণ। ওদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। ওদের সম্পর্কে শুধু এটুকুই জেনেছে জুলিয়েট।

গিরিখাতের উলটো দিকের জমিতে চাষীটি অধিকাংশ কাজই একা একা করে। ওর পরনে সাদা পাতলুন, গায়ে রঙিন জামা আর মাথায় পুরনো একটা টুপি। লোকটাব পোশাক-আশাক সব সময়েই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর পরিপাটি থাকে। ও আর ওর স্ত্রী—দুজনের মধ্যেই একটা শান্ত আভিজাত্য আছে, যা কোনো শ্রেণীবিশেষের মধ্যে থাকে না, থাকে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে।

সজীবতাই মানুষটার বড়ো আকর্ষণ। শক্তসমর্থ চওড়া শরীর হওয়া সত্বেও এক অদ্ভুত ক্ষিপ্র উদ্দীপনা ওর চলাফেরার মধ্যে এক আশ্চর্য মাধুর্য এনে দেয়। প্রথমদিকে, সূর্যস্নান করার আগে, একদিন গিরিখাতটা পেরিয়ে যাবার সময় পাহাড়ের মাঝখানে আচমকা মানুষটার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিলো জুলিয়েটের। জুলিয়েট তাকে দেখতে পাবার আগেই সে জুলিয়েটের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলো। তাই জুলিয়েট চোখ তুলে তাকাতেই সে মাথা থেকে টুপিটা খুলে, আয়ত দুটি নীল চোখে লজ্জা আর অহঙ্কারভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিলো ওর দিকে। লোকটার মুখখানা চওড়া, রোদে-পোড়া, ঠোঁটের ওপরে বাদামি রঙের ছাঁটা গোঁফ আর চওড়া কপালে প্রায় গোঁফের মতোই পুরু একজোড়া ভুরু।

'আমি এখানে বেড়াতে পারি?' জিগেস করেছিলো জুলিয়েট।

'নিশ্চয়ই!' চলাফেরার মতোই আশ্চর্য তৎপরতায় জবাব দিয়েছিলো মানুষটা, 'এ জমিতে আপনি ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারেন।'

তারপর স্বভাবগত লাজুক উদারতায় দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলো মানুষটা। জুলিয়েটও চলে এসেছিলো তাড়াতাড়ি। কিন্তু মানুষটার রক্তগত উদ্দাম উদারতা আর তেমনি সমান নিবিড় দ্বিধাগ্রস্ততাকে ও চিনে নিয়েছিলো সেই মুহূর্তেই।

তারপর থেকে জুলিয়েট প্রতিদিনই দূর থেকে মানুষটাকে দেখেছে আর বুঝেছে, একটা ক্ষিপ্র প্রাণীর মতো ওই মানুষটাও অধিকাংশ সময় নিজের মনেই থাকে। স্ত্রী ওকে নিবিড় করে ভালোবাসে। কিন্তু সে ভালোবাসার মধ্যে মিশে রয়েছে ঈর্ষা, যা প্রায় ঘৃণারই নামান্তর। তার কারণ সম্ভবত এই যে, স্ত্রী তার যতোটুকু নিতে পারে, সে নিজেকে তার চাইতেও বেশি করে দিতে চায়।

একদিন জুলিয়েট দেখেছিলো, একটা গাছের তলায় বসে থাকা একদল চাষীর মধ্যে মানুষটা মনের আনন্দে একটা শিশুর সঙ্গে নাচছে আর তার স্ত্রী বিষণ্ণ মুখে তা দেখছে।

ক্রমশ দূর থেকেই জুলিয়েট আর ওই মানুষটা পরস্পরের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। একজন সচেতন হয়ে উঠেছে অন্যজনের সম্পর্কে। জুলিয়েট জানে,

সকালবেলা মানুষটা কখন তার গাধাটাকে সঙ্গে নিয়ে এসে পৌঁছবে। যে মুহূর্তে জুলিয়েট বারন্দায় গিয়ে দাঁড়ায়, তক্ষুণি ওর দিকে ফিরে তাকায় মানুষটা। কিন্তু কখনও ওকে অভিবাদন জানায় না। তবু যেদিন সে ক্ষেতে কাজ করতে আসে না, সেদিন মানুষটার জন্যে একটা অভাব অনুভব করে জুলিয়েট।

একদিন এক উষ্ণ সকালে দুটো জমির মাঝখানে গিরিখাতটার গভীরে নগ্নশরীরে ঘুরে বেড়াবার সময় জুলিয়েট হঠাৎ মানুষটার সামনে গিয়ে পড়েছিলো। মানুষটা তখন নিচু হয়ে সবল কাঁধ দুটোতে কাঠ তুলছিলো, নিস্পন্দ হয়ে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা গাধাটার পিঠে চাপাবে বলে। আরক্তিম মুখটা ওপরে তুলতেই জুলিয়েটকে দেখতে পেয়েছিলো সে—জুলিয়েট তখন পেছনে সরে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষটার চোখে একটা শিখা জেগে উঠেছিলো আর একটা শিখা জুলিয়েটের শরীরের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে গলিয়ে দিয়েছিলো ওর হাড়গুলোকে। অথচ ও তখন নিঃশব্দে ঝোপগুলোর পেছনে সরে গিয়েছিলো—ফিরে গিয়েছিলো যেদিক দিয়ে ও এসেছিলো, সেদিকেই। ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থেকে মানুষটা কিভাবে অমন নিঃশব্দে কাজ করে, তা ভেবে খানিকটা বিরক্ত আর অবাক হয়েছিলো ও। বুনো জন্তুদের মতো এই গুণটা আছে মানুষটার।

সেই থেকে ওদের দুজনের শরীরেই সচেতনতার এক সুস্পষ্ট বেদনা—যদিও ওরা কেউই তা স্বীকার করে না এবং স্বীকার করার কোনো ইঙ্গিতও প্রকাশ করে না। কিন্তু মানুষটার স্ত্রী সহজাত প্রবৃত্তিবশেই এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছে।

জুলিয়েট ভেবেছে, কেন আমি এই মানুষটার সঙ্গে এক ঘণ্টার জন্যে মিলিত হয়ে ওর সন্তান ধারণ করবো না? একটি পুরুষের জীবনের সঙ্গেই বা কেন আমার জীবনকে একাত্ম করে রাখতে হবে? যতোদিন কামনা-বাসনা রয়েছে, ততোদিন কেন আমি দেখা করবো না ওর সঙ্গে? এখনই তো আমাদের মধ্যে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছে!

কিন্তু জুলিয়েট কোনোদিনও কোনো ইঙ্গিত প্রকাশ করেনি। আর এখন ও দেখলো—মাটিতে বেছানো সাদা কাপড়টার পাশে, কালো পোশাক পরা স্ত্রীর মুখোমুখি বসে মানুষটা মুখ তুলে মরিসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার স্ত্রীও মুখ ঘুরিয়ে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকালো।

জুলিয়েট অনুভব করলো, এক সুতীব্র বিরাগে ওর সমস্ত মন ভরে উঠেছে। আবার ওকে মরিসের সন্তান বহন করতে হবে। স্বামীর দৃষ্টিতে ও তা দেখতে পেয়েছে, বুঝতে পেরেছে ওর কথার জবাবে স্বামীর কথা শুনেও।

'তুমিও পোশাক ছেড়ে রোদ্দুরে হেঁটে বেড়াবে?' স্বামীকে জিগেস করেছিলো ও।

'কি বলে···ইয়ে—মানে, হ্যাঁ! এখানে যখন রয়েছি, তখন তা করতে ভালোই লাগবে। আশা করি জায়গাটা একেবারেই নিরিবিলি, তাই না?'

মরিসের চোখে এক আশ্চর্য দীপ্তি, তাতে বাসনার দুঃসাহস। চকিতে চাদরে ঢাকা জুলিয়েটের উদ্ধত স্তন দুটির দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়েছিলো সে। তার দিক থেকে দেখতে গেলে, সেও একটা পুরুষমানুষ, সেও পৃথিবীর মুখোমুখি হয়েছে—কিন্তু তার পুরুষ-সত্তার তৃষ্ণা এখনও সম্পূর্ণ মেটেনি। হাস্যকরভাবে হলেও, সে রোদ্দুরে হেঁটে বেড়াবার সাহস রাখে।

কিন্তু মরিসের সমস্ত অস্তিত্বে দাসত্বের শৃঙ্খল আর বর্ণসঙ্করের ভীরুতায় ভরা পৃথিবীর গন্ধ। তার সত্তায় যে ছাপটা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা সেরা সামগ্রীর ছাপ নয়।

জুলিয়েট এখন সুপক্ব, সম্পূর্ণ পরিণত। সূর্যরশ্মির স্পর্শে ওর সর্বাঙ্গে এখন ফিকে গোলাপী আভা। আর হৃদয়টা খসে পড়া গোলাপের মতো। প্রাণময়তায় উষ্ণ আর লাজুক ওই কৃষকের কাছে নিজেকে নিবেদন করে ও তার সন্তানকে দেহে ধারণ করতে চেয়েছিলো। কিন্তু ওর আবেগভরা অনুভূতিগুলো ফুলের পাপড়ির মতো ঝরে গেছে। মানুষটার রৌদ্রদগ্ধ মুখে ও রক্তের উচ্ছ্বাস দেখেছে, আগুনের শিখা জ্বলে উঠতে দেখেছে তার দক্ষিণী নীল চোখ দুটিতে। আর তার জবাবে ওর ভেতরে জেগে উঠেছে দুরন্ত আগুনের বন্যা। ওই কৃষক ওর কাছে এক জন্মদায়ক সূর্যস্নান হতে পারতো, আর জুলিয়েটও তাই-ই চেয়েছিলো।

তবু ওর পরবর্তী সন্তানটি হবে মরিসের। ধারাবাহিকতার নিদারুণ শৃঙ্খলই হবে তার কারণ।

মৃগয়া

আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ে

শিকাগোর এক শহরতলি ওক পার্কে ১৮৯৯ সালে জন্ম হয় হেমিংওয়ের। উপন্যাসের নায়কের মতোই বিচিত্র তাঁর জীবন। অ্যাম্বুলেন্স-চালক হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন ইতালির রণাঙ্গনে। পরবর্তীকালে স্পেনেও গেছেন সেখানকার গৃহযুদ্ধের সময়। ভালোবাসতেন বিপজ্জনক-ভাবে বেঁচে থাকতে, শিকার করতে, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে। ষাঁড়ের লড়াইতেও তাঁর আগ্রহ কম ছিলো না। জীবনের এই সমস্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অবিকল প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে তাঁর 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস', 'ফর হুম দ্য বেল টোলস', 'ডেথ ইন দ্য আফটারনুন', ইত্যাদি আশ্চর্য উপন্যাস ও বিভিন্ন ছোটোগল্পে। ১৯৫৪ সালে 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সি' তাঁকে নোবেল পুরস্কারের শিরোপা এনে দেয়। মৃত্যু আত্মহননে, ১৯৬১ সালে।

কানাডা থেকে হর্টনস বে-তে এসেছিলো জিম গিলমোর। কামারশালার দোকানটা সে কিনেছিলো বুড়ো হর্টনের কাছ থেকে। জিমের চেহারাটা বেঁটেখাটো, গায়ের রঙ ময়লা, গোঁফজোড়া মস্তবড়ো আর হাত দুটো বিশাল। ঘোড়ার খুরে নাল পরানোর কাজটা সে ভালোই করে, কিন্তু চামড়ার সজ্জারক্ষণীটা গায়ে চড়ালেও তাকে ঠিক কামার বলে মনে হয় না। কামারশালার ওপর-তলায় সে থাকে, আর খাওয়াদাওয়া করে ডি. জে. স্মিথের বাড়িতে।

লিজ কোটস স্মিথদের বাড়িতে কাজ করে। বিশাল চেহারার পরিচ্ছন্ন মহিলা মিসেস স্মিথ বলেন, লিজ কোটসের মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মেয়ে উনি আজ অব্দি দেখেননি। লিজের পা দুটি সুন্দর, সর্বদাই ও ডোরা-কাটা ফিটফাট সজ্জারক্ষণী পরে থাকে এবং জিম লক্ষ্য করেছে, ওর চুলগুলো সব সময়েই মাথার পেছন দিকে পরিপাটি করে বাঁধা। ভীষণ হাসিখুশি বলে ওর মুখখানা জিমের ভালো লাগে, কিন্তু সে কখনও ওর কথা তেমন করে চিন্তা করেনি।

এদিকে জিমকে লিজের ভীষণ পছন্দ। দোকান থেকে জিমের হেঁটে আসার ভঙ্গিটা ওর খুব ভালো লাগে এবং রাস্তা দিয়ে তার রওনা হবার দৃশ্যটা দেখবে বলে প্রায়ই ও রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। জিমের গোঁফজোড়াও ওর ভালো

লাগে। ভালো লাগে, হাসলে পরে তার ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো দেখতে। ভীষণ ভালো লাগে, মানুষটাকে দেখলে কর্মকার বলে মনে হয় না বলে। ভালো লাগে ডি. জে. স্মিথ আর মিসেস স্মিথ মানুষটাকে এত্তো ভালোবাসেন বলে। একদিন জিম বাড়ির বাইরের বেসিনে হাতমুখ ধোবার সময় লিজ আবিষ্কার করলো, জিমের হাতের লোমগুলো—যেগুলো বেশ কালো, অথচ রোদে-পোড়া অংশটার ঠিক ওপরেরগুলো একেবারের সাদা—ওর বেশ ভালো লাগছে এবং এই ভালো লাগার অনুভূতিটা ওর ভারি মজার বলে মনে হলো।

বয়নে সিটি আর শার্লেভোর মাঝখানকার প্রধান সড়কের ওপরে হর্টনস বে শহরটাতে বাড়ি মোটে পাঁচটি। মনিহারি দোকান ও কৃত্রিম উঁচু সদরওলা ডাকঘর সহ স্মিথের বাড়ি, স্ট্রাউডের বাড়ি, ডিলওয়ার্থের বাড়ি, হর্টনের বাড়ি ও ভ্যান হুসেনের বাড়ি। বাড়িগুলো এল্‌ম গাছের একটা বিশাল কুঞ্জের মধ্যে এবং রাস্তাটা ভীষণ বালিময়। রাস্তাটা ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলেই মেথডিস্ট গির্জা আর তার বিপরীত দিকে পেছিয়ে গেলে শহর এলাকার স্কুল। কামারশালাটা লাল রঙ করা এবং সেটা স্কুলটার মুখোমুখি।

বালুময় একটা খাড়াই রাস্তা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে উপসাগরের দিকে নেমে গেছে। স্মিথদের বাড়ির খিড়কি দরজা দিয়ে তাকালে দৃষ্টি চলে যায় হ্রদের ধার অব্দি বিস্তীর্ণ গাছগাছালি পেরিয়ে উপসাগরের ওধারে। বসন্তে ও গ্রীষ্মে ওখানকার দৃশ্য ভারি মনোরম—উপসাগরটা তখন নীল আর উজ্জ্বল, শার্লেভো আর মিচিগান হ্রদ থেকে ভেসে আসা বাতাসের দাপটে তরঙ্গে তরঙ্গে ফেনার মুকুট। স্মিথদের খিড়কি-দরজা দিয়ে লিজ দেখতে পায়, বড়ো বড়ো বজরা হ্রদ দিয়ে বয়নে সিটির দিকে এগিয়ে চলেছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় ওগুলো আদৌ নড়ছে না। কিন্তু ও যদি বাড়ির ভেতরে গিয়ে আরও কয়েকটা থালা-বাসন মুছেটুছে ফের বাইরে এসে দাঁড়ায়, তখন বজরাগুলোকে আর দেখতে পায় না।

ইদানীং লিজ সর্বদাই জিম গিলমোরের কথা চিন্তা করে। কিন্তু জিম ওকে খুব একটা লক্ষ্য করে বলে মনে হয় না। সে ডি. জে. স্মিথের সঙ্গে নিজের দোকান, রিপাবলিকান পার্টি এবং জেমস জি. ব্লেইনের সম্পর্কে কথাবার্তা বলে। সন্ধ্যা-বেলায় সামনের ঘরে বসে লম্ফের আলোয় 'দ্য টলেডো ব্লেড' এবং 'গ্র্যাণ্ড র‍্যাপিডটস' পত্রিকা পড়ে। কিংবা উপসাগরে কোচ দিয়ে মাছ শিকার করবে বলে একটা লণ্ঠন নিয়ে ডি. জে. স্মিথের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে যায়। শরৎকালে সে, স্মিথ ও চার্লি ওয়েম্যান একটা গাড়িতে তাঁবু, রসদপত্র, কুড়োল, রাইফেল আর দুটো

কুকুর নিয়ে ভ্যানডারবিল্ট পেরিয়ে পাইনের সমভূমিতে হরিণ শিকারে গেলো। ওরা রওনা হবার আগে লিজ ও মিসেস স্মিথ চারদিন ধরে ওদের জন্যে রান্নাবান্না করেছে। জিমের সঙ্গে দিয়ে দেবার জন্যে লিজের বিশেষ কোনো খাবার তৈরি করার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও তা করেনি—কারণ মিসেস স্মিথের কাছে ডিম আর ময়দা চাইতে ওর ভয় হয়েছে, আবার রান্না করার সময় মিসেস স্মিথ ধরে ফেলবেন বলে ও নিজেও সেগুলোকে নিয়ে আসতে ভয় পেয়েছে। মিসেস স্মিথ কিছুই বলতেন না, কিন্তু তবু লিজের ভয়।

হরিণ শিকারের সফরে জিম যতোদিন বাইরে ছিলো, লিজ সর্বদা তার কথা চিন্তা করেছে। ভয়ঙ্কর বিশ্রী কেটেছে দিনগুলো। জিমের কথা ভেবে ভেবে ও ভালো করে ঘুমোতে পারেনি—কিন্তু আবিষ্কার করেছে, মানুষটার কথা ভেবেও ওর সুখ। যেদিন ওদের ফেরার কথা, তার আগের রাতে লিজ আদৌ ঘুমোয়নি—তার মানে ও ভেবেছে ও ঘুমোয়নি, কারণ না-ঘুমোবার স্বপ্ন এবং সত্যি সত্যি না-ঘুমোনো—সবকিছুই মিলেঝুলে একাকার হয়ে গেছে। শেষ অব্দি ওদের গাড়িটাকে যখন রাস্তা ধরে এগিয়ে আসতে দেখলো, লিজের মনে হলো ওর ভেতরটা কেমন যেন দুর্বল আর ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। জিমকে দেখার জন্যে ওর আর তর সইছিলো না, মনে হচ্ছিল সে এলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। গাড়িটা বড়ো এল্‌ম গাছটার তলায় এসে দাঁড়াতেই মিসেস স্মিথ আর লিজ বাইরে বেরিয়ে এলো। তিনটে মানুষেরই গালে দাড়ি। গাড়ির পেছন দিকে তিনটে হরিণ, তাদের সরু সরু ঠ্যাংগুলো শক্ত হয়ে গাড়ির ডালা দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে। মিসেস স্মিথ ডি. জে. কে চুমু দিলেন, এবং তিনি ওঁকে জড়িয়ে ধরলেন। জিম 'কি খবর, লিজ' বলে মৃদু হাসলো। জিম ফিরে এলে কি হবে, লিজ তা সঠিক জানতো না—তবে একটা কিছু হবে, এ বিষয়ে ও সুনিশ্চিত ছিলো। কিন্তু কিছুই ঘটলো না। ওরা বাড়িতে ফিরে এসেছে—ব্যাস, শুধু এই। জিম হরিণগুলোর গায়ের ওপর থেকে চটের বস্তাগুলো টেনে সরিয়ে দিলো, লিজ তাকালো হরিণগুলোর দিকে। ওদের মধ্যে একটা বেশ বড়োসড়ো মদ্দা হরিণ। একেবারে শক্ত হয়ে গেছে, গাড়ি থেকে তুলে বের করে আনা কঠিন ব্যাপার।

'তুমিই এটাকে গুলি করেছিলে, জিম?' লিজ জিগেস করলো।

'হ্যাঁ। ভারি সুন্দর, তাই না?' হরিণটাকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে কাঁধে তুলে নিলো জিম।

সেদিন রাতে খাওয়াদাওয়ার জন্যে চার্লি ওয়েম্যান স্মিথদের বাড়িতেই রয়ে গেলেন। শার্লেভোতে ফেরার পক্ষে ততোক্ষণে অনেক রাত হয়ে গেছে।

ওঁরা তিনজনে হাতমুখ ধুয়ে সামনের ঘরে বসে নৈশভোজের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'জিম, ওই পাত্রটার মধ্যে একটু তলানি পড়ে আছে না?' ডি. জে. স্মিথ জিগেস করলেন। জিম গোলাবাড়িতে গিয়ে গাড়ি থেকে হুইস্কির পাত্রটা নিয়ে এলো। ওটাকে ওরা শিকারে নিয়ে গিয়েছিলো। চার গ্যালনের পাত্র, এখন একেবারে তলিতে সামান্য একটু ছলছল করছে। বাড়িতে ফেরার পথে জিম সেটা থেকে একটা লম্বা চুমুক মেরে নিলো। চুমুক দেবার পক্ষে এতো বড়ো একটা পাত্রকে ওপরে তুলে ধরাও কঠিন ব্যাপার। খানিকটা হুইস্কি তার জামার সামনের দিক দিয়ে গড়িয়ে নেমে এলো। জিম পাত্রটা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই অন্য পুরুষ দুটি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। ডি. জে. স্মিথ গ্লাস আনতে বললেন, লিজ নিয়ে এলো। ডি. জে. স্মিথ তিনটে গ্লাসে একটু বড়ো মাত্রায় পানীয় ঢাললেন।

'এই যে ডি. জে, তোমার পানে তাকিয়ে—তোমার উদ্দেশে,' চার্লি ওয়েম্যান বললেন।

'ওই হতচ্ছাড়া মদ্দা হরিণটার উদ্দেশে, জিম।' ডি. জে. বললেন।

'ডি. জে., যেগুলোকে আমরা মারতে পারিনি তাদের উদ্দেশে।' জিম নিজের পানীয়টুকু গলা দিয়ে নামিয়ে দিলো।

'পুরুষমানুষের কাছে স্বাদটা চমৎকার।'

'তোমার যে কোনো অসুস্থতাই থাক না কেন, বছরের এই সময়টাতে এর তুল্য জিনিস আর নেই!'

'আর একবার করে চলবে নাকি, বৎসগণ?'

'এই নাও, ডি. জি.।'

'নামিয়ে দাও, বৎসগণ!'

'এই যে, আগামী বৎসরের উদ্দেশে।'

জিমের দারুণ লাগতে শুরু করেছিলো। হুইস্কির স্বাদ এবং অনুভূতি—দুই-ই তার প্রিয়। আরামদায়ক শয্যা, গরম খাবার এবং নিজের দোকানের কাছে ফিরে আসতে পেরে দিব্যি আনন্দ হচ্ছিলো তার। আরও এক পাত্র পান করলো সে। মনে মনে নিবিড় উল্লাস কিন্তু আচরণে প্রচণ্ড ভদ্র-শোভনতা নিয়ে খেতে গেলেন তিনজনে। খাবারদাবার সাজিয়ে লিজও টেবিলে এসে বসলো এবং পরিবারটির সঙ্গেই খেয়ে নিলো। চমৎকার খানা। পুরুষরা গম্ভীরমুখে মনোযোগ দিয়ে খেলেন। খাওয়া দাওয়া সেরে ওঁরা ফের সামনের ঘরে চলে গেলেন এবং লিজ মিসেস স্মিথের সঙ্গে সাফসুফোর কাজ সেরে ফেললো। তারপর মিসেস স্মিথ ওপর-তলায় চলে

গেলেন এবং খুব শীগগিরই স্মিথও সামনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওপরে উঠে গেলেন। জিম আর চার্লি তখনও সামনের ঘরে। রান্নাঘরে স্টোভের পাশে বসে লিজ একখানা বই পড়ার ভান করছিলো আর জিমের কথা ভাবছিলো। ও তক্ষুণি শুতে যেতে চাইছিলো না, কারণ ও জানতো জিম ওই ঘরটা থেকে বেরুবে। জিম যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে, ও তখন তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলো—যাতে ও সেই পথ ধরে চলতে পারে যে পথে জিম ওকে নিয়ে শোবার উপায় খুঁজছে।

জিমের কথা ভীষণভাবে ভাবছিলো লিজ এবং তারপরেই জিম ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। জিমের চোখ দুটো চকচক করছে, মাথার চুল সামান্য এলোমেলো। নিজের বইটার দিকে চোখ নামালো লিজ। জিম ওর কুর্সির পেছনে এসে দাঁড়ালো। মানুষটার শ্বাস-প্রশ্বাস অনুভব করলো লিজ এবং তারপরেই সে দু হাতে ওকে জড়িয়ে ধরলো। দ্বিধাহীন এবং অদম্য বলে মনে হচ্ছিলো ওর স্তন দুটিকে, জিমের হাতের তলায় শক্ত হয়ে উঠেছিলো ওর স্তনবৃন্ত দুটি। লিজের ভীষণ ভয় করছিলো, আজ অব্দি কেউ কোনোদিনও ওকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু ও ভাবলো, 'তাহলে শেষমেষ ও আমার কাছে এসেছে…সত্যি সত্যিই এসেছে!'

নিজেকে আড়ষ্ট করে রাখলো লিজ—কারণ ওর ভীষণ ভয় করছিলো, বুঝতে পারছিলো না আড়ষ্ট হয়ে থাকা ছাড়া ও আর কি করবে। জিম শক্ত করে কুর্সির সঙ্গে ওকে চেপে ধরে চুমু খেলো। অনুভূতিটা এতো তীব্র, এতো তীক্ষ্ণ আর এতো যন্ত্রণাদায়ক যে লিজের মনে হলো ও যেন আর সহ্য করতে পারছে না। কুর্সির পেছন থেকেও জিমকে অনুভব করছিলো ও এবং ও তাও সহ্য করতে পারছিলো না। কিন্তু তার পরেই ওর ভেতরে যেন কি একটা হয়ে গেলো—ওর মনে হলো, এই অনুভূতিটা আগের চাইতে অনেক উষ্ণ আর নরম। জিম ওকে শক্ত করে কুর্সির সঙ্গে চেপে রেখেছে এবং এখন ও নিজেও তাই চাইছে। জিম ফিসফিসিয়ে বললো, 'চলো, একটু বেড়িয়ে আসি।'

রান্নাঘরের দেয়ালে লাগানো গোঁজ থেকে নিজের কোটটা তুলে নিলো লিজ, তারপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লো দুজনে। জিমের একখানা বাহু লিজকে ঘিরে রেখেছে। সামান্য খানিকটা করে পথ এগিয়েই ওরা বারবার থেমে যায়, নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে পরস্পরকে, লিজকে চুমু দেয় জিম। আকাশে চাঁদ নেই। বালুময় পথে গোড়ালি ডুবিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গাছগাছালির ভেতর দিয়ে ফেরিঘাট আর উপসাগরের তীরে গুদামঘরটার দিকে এগিয়ে যায় ওরা। উপসাগরের জল তীরের বেষ্টনী ছাপিয়ে এসেছে। এদিকটা অন্ধকার। আবহাওয়া ঠাণ্ডা, কিন্তু জিমের

সংস্পর্শে থাকায় লিজের সর্বাঙ্গে উষ্ণতা। গুদামের ছাউনিতে বসে ওকে নিজের কাছে একেবারে নিবিড় করে টেনে নেয় জিম। লিজ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। জিমের একখানা হাত ততোক্ষণে ওর পোশাকের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ওর স্তন দুটিতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, অন্য হাতখানা রয়েছে ওর কোলের ওপরে। লিজের প্রচণ্ড ভয় করে—বুঝতে পারে না, মানুষটা কি করে কি করবে—কিন্তু তবু ও নিবিড় সোহাগে মানুষটার সঙ্গে লেপটে থাকে। ওর কোলে রাখা যে হাতটাকে বড্ড বড়ো বলে মনে হচ্ছিলো, এবারে সেটা কোল থেকে সরে যায়···পায়ের ওপরে এসে বসে, তারপর উঠতে শুরু করে ওপরের দিকে।

'অমন কোরো না, জিম,' লিজ বলে। জিম নিজের হাতটাকে আস্তে আস্তে আরও ওপরের দিকে নিয়ে যায়।

'কোরো না জিম, অমন কোরো না বলছি!'

কিন্তু জিম বা জিমের বিশাল হাত—কেউই ওর কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না।

কাঠের পাটাতনগুলো বড্ড শক্ত। লিজের পোশাকটাকে ওপরের দিকে তুলে দিয়ে, জিম ওকে কিছু একটা করার চেষ্টা করছে। লিজ ভয় পায়, কিন্তু ও-ও তাই চায়। এটা ওকে পেতেই হবে, অথচ এটাই ওকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।

'ওসব কোরো না, জিম। তুমি কিছুতেই ওসব করবে না।'

'করবো—করতেই হবে,···তুমি তো জান, না করলে চলবে না।'

'না, চলবে। করতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। না না, এটা ঠিক নয়। উঃ, ওটা বড্ড বড়ো···ভীষণ লাগছে। কোরো না, জিম! ওহ্ জিম! জিম···ওহ্!'

ফেরিঘাটের হেমলকের পাটাতনগুলো বড্ড শক্ত, খোঁচাখোঁচা আর ঠাণ্ডা। জিমের শরীর ভারি হয়ে চেপে রয়েছে লিজের শরীরে এবং জিম ওকে ব্যথা দিয়েছে। লিজ ওকে ঠেলে দিলো—ভীষণ অস্বস্তি লাগছিলো ওর, সমস্ত শরীরে যেন খিল ধরে গেছে। কিন্তু জিম ঘুমিয়ে পড়েছে। নড়বে না। কষ্টেসৃষ্টে মানুষটার শরীরের নিচ থেকে বেরিয়ে এসে একটু বসলো লিজ। স্কার্ট আর কোটটাকে টেনেটুনে সোজা করে, চুলগুলোর একটা গতি করার চেষ্টা করলো। মুখটা সামান্য একটু খুলে ঘুমোচ্ছে জিম। নিচের দিকে ঝুঁকে মানুষটার গালে চুমু দিলো লিজ। জিম তখনও ঘুমোচ্ছে। লিজ ওর মাথাটা একটু তুলে ধরে ঝাঁকুনি দিলো। জিম মাথাটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ঢোক গিললো। লিজ কাঁদতে শুরু করলো। ফেরিঘাটের ধার অব্দি এগিয়ে গিয়ে, চোখ নামিয়ে জলের দিকে তাকালো ও। উপসাগর থেকে একটা আবছা কুয়াশা ওপরের দিকে উঠে আসছে। লিজের শীত করছিলো, ভীষণ দুঃখী বলে মনে হচ্ছিলো নিজেকে, মনে হচ্ছিলো ওর যথাসর্বস্ব

যেন হারিয়ে গেছে। জিম যেখানটাতে শুয়ে রয়েছে, ফের সেখানে হেঁটে গেলো ও এবং নিশ্চিত হবার জন্যে ফের একবার ঝাঁকুনি দিলো মানুষটাকে। লিজ তখনও কাঁদছে।

'জিম, জিম,' ডাকলো ও। 'জিম, শোনো লক্ষ্মীটি—'

জিম নড়ে চড়ে উঠে একটু গুটিসুটি হয়ে শুলো। নিজের গা থেকে কোটটা খুলে নিলো লিজ, একটু ঝুঁকে সেটা দিয়ে ঢেকে দিলো মানুষটাকে। সযত্নে, নিখুঁতভাবে কোটটাকে গুঁজে দিলো তার চতুর্দিকে। তারপর বিছানায় গিয়ে শোবে বলে ফেরিঘাট পেরিয়ে বালুময় খাড়াই রাস্তাটায় গিয়ে উঠলো। উপসাগর থেকে একটা হিমেল কুয়াশা তখনও গাছগাছালির ভেতর দিয়ে ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে আসছে।

আলোছায়া

এন্দ্রে ইলিজ

হাঙ্গেরির জনপ্রিয় সাহিত্যিক এন্দ্রে ইলিজের জন্ম ১৯০২ সালে। কিছুটা পরীক্ষামূলক, কিছুটা রোম্যান্টিক আঙ্গিকে লেখা তাঁর গল্পগুলি অনিবার্যভাবে পাঠকের মনে এক গভীর ছাপ রেখে যায়। যুদ্ধোত্তর হাঙ্গেরির আশা ও ভালোবাসা, ক্রোধ ও বিষাদ তাঁর সাহিত্যের একটি অন্যতম প্রিয় বিষয়বস্তু এবং আলোচ্য কাহিনীটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

'বেরিয়ে যাও বলছি!' স্নানঘর থেকে মহিলাটি বললো। কণ্ঠস্বরে বিব্রত বলে মনে হলো ওকে। 'আমি এখন ডুশটা ব্যবহার করবো।'

পুরুষটি ওর কথার প্রতিবাদ করলো না। বাইরে বেরিয়ে এলো।

ঘরে এসে প্রথমেই টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলো সে। টেবিলের ওপরে একটা টেপ-রেকর্ডার আর তার পাশে লেখা ও না-লেখা কিছু কাগজপত্র। লেখাগুলোতে চোখ বোলাবার কোনো ইচ্ছে তার ছিলো না, তাই দেয়াল-আলমারিটার দিকে এগুলো সে। ঘরটা বড়ো, বনেদী আমলের আসবাবে সাজানো। পুরুষটি স্পষ্টই বুঝতে লাগলো, বিগত যুগের আবহাওয়া এ ঘরে স্বচ্ছন্দে আজকের দিনের আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে গেছে। দেরাজ-আলমারিতে ঝকমকে খাপে ভরা রেকর্ডের এক বিশাল সংগ্রহ। একটা রেকর্ড টেনে বের করলো মানুষটি। গার্সউইনস্ নিগ্রো অপেরার পর্গি ও বেজ। অন্য একখানা রেকর্ড বের করলো সে। এটাতে লিওনেল হ্যাম্পটনের গাওয়া নিগ্রো ভক্তিগীতি। তৃতীয় একখানা রেকর্ড দেখার কৌতূহল হলো তার এবং এলোমেলো হাত বাড়িয়ে যেটা সে টেনে বের করলো, সেটা স্ত্রাভিনস্কির 'আগুনে-পাখি'।

মেয়েটির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে আজ ন দিন। পাঁচটা দিন ওরা লেক বালাটোনে কাটিয়েছে, বুদাপেস্টে ফিরে এসে তিনদিন পরস্পরের সঙ্গে দেখা করেনি এবং তারপর দূরভাষ যোগে আজই দেখা করার দিন স্থির করেছে। দরজার তকমায় মেয়েটির নামের নিচে লেখা আছে: 'প্রধান চিকিৎসা-উপদেষ্টা'। কিন্তু মানুষটা এতে বিস্মিত হয়নি, কারণ হ্রদের পর্যটন কেন্দ্রে পরিচয়ের প্রথম আধ-ঘণ্টাতেই সে এটা জেনে গিয়েছিলো। আসলে এখন সে যা খুঁজছিলো, তা হচ্ছে চিকিৎসকের পেশায় জড়িত থাকার কোনো ইঙ্গিত—এক্স-রে যন্ত্র, একটা

ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ কিংবা নিদেনপক্ষে চাবি বন্ধ করে রাখা একটা ওষুধের আলমারি। অথচ এতোক্ষণে সামান্য একটা স্টেথোস্কোপও সে দেখতে পায়নি। এবারে সংলগ্ন ঘরের দরজাটা খুললো সে। কিন্তু ওটা সে আগেই দেখেছে— কারণ এ ফ্ল্যাটের ওটাই প্রথম ঘর এবং এ দফার প্রথম ঘণ্টাটা সে ওই ঘরেই কাটিয়েছে।

'কি খুঁজছো তুমি?' আচমকা পেছন থেকে শুধালো মেয়েটি।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলো ও, পরনে স্নান-শেষের ঢিলে পোশাক, ঠাণ্ডা জলের ধারাস্নানে শরীরটা তখনও আর্দ্র।

পুরুষটি ঘুরে দাঁড়ালো, 'তুমি কি সঙ্গীতজ্ঞ, না কি ডাক্তার?'

'তুমি নিশ্চয়ই এ কথা বলতে চাইছো না যে তোমার ইচ্ছে, আমি তোমাকে পরীক্ষা করে দেখি?'

'তুমি? কিন্তু পরীক্ষাটা করবে কি দিয়ে, শুনি?'

'তা যেমন ধরো, এই টেপ-রেকর্ডারটা দিয়ে!'

মানুষটা ওর কথার কোনো অর্থ বুঝতে পারলো না।

'আমাকে বোকা সাজাবার চেষ্টা করছো, তাই না?'

'মোটেই না! এসো না, একবার চেষ্টা করে দেখা যাক…তুমি ওটা একটু চালিয়ে দেবে?'

মানুষটা টেপ-রেকর্ডারের বোতাম টিপে দিলো। প্রথমেই সে শুনতে পেলো জল ছলকে ওঠার আওয়াজ…তারপর ক্রমশ এগিয়ে আসা পদশব্দ। পদশব্দ দ্রুত ডুবে গেলো হাতুড়ি পেটানোর আওয়াজে। তারপর অনেকগুলো পায়ের ঘষটে ঘষটে চলার শব্দ…তারপর উখো দিয়ে কি যেন ঘষে ঘষে মসৃণ করার আওয়াজ… এবং তারপর আবার জলের ছলছলানি।

ঢিলে অঙ্গবাস দিয়ে স্তন আর বাহু দুটি মুছে নিলো মেয়েটি।

'এই মাত্র তুমি কি শুনলে, আমাকে বলবে?'

'কোনো রীতিবিরোধী সঙ্গীতাংশ—হয়তো বা এটা তোমার একটা প্রিয় রেকর্ড—কিংবা তোমারই স্বরারোপ।'

'আবার শোনো…একটু ভালো করে শোনো। দাঁড়াও, ফের এটাকে চালানো যাক!' টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলো মেয়েটি, একটু ঠিকঠাক করে নিলো টেপ-রেকর্ডারটাকে। পরক্ষণেই জলের সেই ছলাৎছলাৎ শোনা গেলো আবার।

জানলার কাঠামোয় হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করলো মানুষটা।

'কি শুনলে?' মেয়েটির কণ্ঠস্বরে কৌতূহলের সুর।

যা শুনেছে, বাধ্য ছেলের মতো মানুষটা তাই পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করলো।

'জলের ছলছল…পায়ের শব্দ। হাতুড়ি পেটানোর আওয়াজ। ঘষে ঘষে কিছু একটা পালিশ করা হচ্ছে।…তারপর আবার জলের সেই ছলছলানি।'

ঢিলে অঙ্গবাস পরা মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠলো, 'লজ্জার কথা! তুমি একটা অন্ধ মানুষের মতো জবাব দিলে।'

'কেন? অন্ধেরা কিভাবে জবাব দেয়?'

'তারা প্রাণপণে কান পেতে রাখে আর বাইরের পৃথিবী থেকে যে সমস্ত শব্দ তাদের কাছে গিয়ে পৌছোয়, সেগুলোকে শোনে। বাস্তবের ওপরে তারা ভীষণ-ভাবে নির্ভরশীল। যাকগে, এবারে শোনো—একুশ বছরের একটি বুদ্ধিমতী মেয়ে এই শব্দগুলোর সম্পর্কে কি জবাব দিয়েছে।'

একটা খাতার অংশবিশেষের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি পড়তে শুরু করলো, 'লোকগুলো একটা সেতুতে উঠছে। খুব কাছেই শ্রমিকরা হাতুড়ি পিটছে, কিন্তু দূর থেকে শব্দটা অনেক মৃদু শোনাচ্ছে। অনেক নিচ দিয়ে ফিসফিসিয়ে বয়ে যাচ্ছে ত্যানিয়ুব। শীতকাল, তাই জলোচ্ছ্বাসের শব্দটা এতো কম। ইতিমধ্যে একজন শ্রমিক তার হাতুড়িটা নামিয়ে রেখে, গলাটা সাফ করে নিলো। অন্যেরা হাতুড়ি পিটেই চলেছে।'

খাতা থেকে চোখ তুললো মেয়েটি, 'শুনলে? কি দারুণ উদ্ভাবনী জবাব, তাই না? মেয়েটি কিন্তু শব্দগুলোকে টুকরো টুকরো করে শোনেনি, বরং সহজে এবং সুদক্ষভাবে সেগুলোকে জোড়া দিয়ে নিয়েছে। কিন্তু যার কল্পনাশক্তি নেই, সে শুধু নিজের সঙ্কীর্ণ পৃথিবীটাকেই অনুভব করে।'

'তুমি কি 'সঙ্কীর্ণ পৃথিবী' বললে?' পুরুষটি যেন দিব্যি খোশ মেজাজে হাত তুলে প্রশ্ন করলো।

'ঠিক তাই।'

'যাক বাবা!…অবশেষে তাহলে আবিষ্কার করতে পারলাম, আসলে তুমি কি। তুমি হচ্ছো একজন মনোবিদ…আত্মার অনুসন্ধানকারী…'

এবারে পুরুষটির হাসার পালা। মেয়েটিও হাসলো তার সঙ্গে।

'খুব হয়েছে…যথেষ্ট হয়েছে! এতেই চলবে!'

পুরুষটি তবু অকরুণ ভঙ্গিতে বলে চললো, 'একজন মনস্তত্ত্ববিদ…মনঃসংস্কারক …ঈশ্বরতত্ত্বের শিক্ষক…'

'তা এখন তুমি কি নিয়ে কাজ করছো?' অনেকক্ষণ বাদে, নৈশভোজে বসে মেয়েটিকে জিগেস করলো সে।

পরস্পরের নাম—ইস্তভান আর ইলোনা—উচ্চারণ করতে ওরা এখনও অস্বস্তি অনুভব করে। তবে এখন ওরা নাম ধরেই ডাকে পরস্পরকে।

ঈষৎ লাল হয়ে উঠলো ইলোনা, কারণ এতোক্ষণে ইস্তভান বিষয়টাতে ফিরে এসেছে।

'তুমি কি সত্যিই এতে আগ্রহী?'

'হ্যাঁ।'

সংক্ষিপ্ত, প্রায় শীতল একটা জবাব—কিন্তু তাহলেও এটা একটা সুনির্দিষ্ট ইচ্ছাকে প্রকাশ করে। আসলে এই ভঙ্গিতেই ওরা কথা বলে…লেক অঞ্চলে এমনি সংক্ষিপ্ত বাহুল্যবর্জিত ভঙ্গিতেই পরস্পরের সঙ্গে প্রথম কথা বলতে শুরু করেছিলো ওরা।

'আমার কেউ নেই…' পরিচয়ের প্রথম দিনেই জানিয়ে দিয়েছিলো ইলোনা।

'আমারও নেই,' ইস্তভান জবাব দিয়েছিলো।

'আমি জটিলতাকে ভয় পাই বলেই কথাটা বললাম।'

'তোমাকে অতো…একেবারে সঠিক সময়েই আমাদের দেখা হয়েছে!'

ওদের প্রেম এই সুরেই বাঁধা হয়েছিলো। কারণ অনিশ্চিত এবং কপট হলেও এটা যে প্রেম, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিলো না। ওদের ভয় ছিলো, 'প্রেম' বললে এটা হয়তো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু তবু এটা ওরা উপভোগ করতো, সযত্নে রক্ষা করতো—যেমন সুরক্ষিত রাখতো পরস্পরকে।

মেয়েটির খুশিয়াল কণ্ঠস্বর শুনছিলো পুরুষটি:

'আমার কাছে এ রকম দশটা 'শব্দ-কল্প' আছে। আমি এগুলোকে 'শব্দ-ছবি' বলে থাকি। 'শব্দ-ছবি' বললে ব্যাপারটা অনেক বেশি সহজ বলে মনে হয়। প্রতিটা ছবির স্থায়িত্ব মাত্র এক মিনিট। আলাদা করে বোঝা যায়, এমন ছটা বা সাতটা ভিন্ন ধরনের শব্দ এবং সুরের সমন্বয়ে এগুলো গঠিত। শব্দগুলোর মধ্যে কোনো আন্তর-সংযোগ নেই, বিষয় বা ছন্দের দিক থেকে ওরা সম্পূর্ণ আলাদা—কিন্তু প্রত্যেকটাই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেকটার মধ্যেই একটা চাপা উত্তেজনা রয়ে গেছে।'

আচমকা যেন জলের তলা থেকে ভেসে উঠেছে ইস্তভান, তার কর্ণপটহে এখনও অন্য এক পৃথিবীর শব্দলহরী। নির্লিপ্ত মন নিয়ে মহিলার কথা শুনছিলো সে। বয়েস কতো মহিলার—চল্লিশ, না পঁয়ত্রিশ, নাকি আটত্রিশ? দীর্ঘ, ছিপছিপে শরীর। লিওনার্দো এ ধরনের কয়েকটি আশ্চর্য, আন্তরিক মুখ এঁকেছিলেন। একমাত্র দুঃখ এই কারণে যে ওর চোখ দুটি বড়ো চঞ্চল, হাঁ-মুখটা বড্ড বড়ো, আর

কপালটা যেন একটু বেশি উঁচু। দেহটি সুষম, কিন্তু বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতিহীন।

ইস্তভানের সামনে মোটা মোটা কয়েক টুকরো শুয়োরের মাংস রাখলো ইলোনা। তারপর চা ঢালতে ঢালতে বললো, 'অরেঞ্জ পিকো। গত বছর ইতালি থেকে কিনে এনেছিলাম।'

কড়া গন্ধওলা চা। চিনি ছাড়াই পান করলো ওরা। ইস্তভান একটু ব্র্যাণ্ডি চাইলো।

'বিশ্বাস করো,' ইলোনা বললো, 'এই শব্দ-পরীক্ষার মূল্যটা আমি যদি প্রমাণ করতে পারি, তাহলে তা রড়শাখ্ বা জোন্দি পরীক্ষার চাইতেও অনেক বেশি মূল্যবান হবে। প্রায় একশো কুড়িটা প. পা-র বক্তব্য আমার কাছে রেকর্ড করা আছে।'

'প. পা.—মানে?'

'তাও জানো না? প. পা. মানে পরীক্ষার পাত্র!'

'বেশ।' নিজে নিজেই খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে নিলো ইস্তভান, 'তারপর বলে যাও।'

'আর কিছু বলার নেই। তুমি আমার খাতাগুলো পড়লে বুঝতে পারবে, আমার প্রতিটা শব্দ-ছবির ফলাফল কি দুর্দান্ত! পরীক্ষার পাত্রদের আমি শুধু বলি: 'এই শব্দগুলো থেকে একটা কাহিনী তৈরি করো'। তারা যদি সত্যিই মন দিয়ে এগুলো শোনে, তাহলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারেই কাহিনীর মাধ্যমে নিজেদের মানসিক দ্বন্দ্বের কথাটা আমাকে বলে ফেলে…যে দ্বন্দ্বগুলো তারা নিজেদের কাছেও লুকিয়ে রাখে। তখন আমাকে যা করতে হয়, তা হচ্ছে শুধুমাত্র ওই সাঙ্কেতিক কাহিনীটার অর্থোদ্ধার করা।'

'তারপর?'

ইলোনা মানুষটার দিকে তাকালো।

'আর কিছু নেই।…কিন্তু তুমি মাতাল হয়ে গেছো।'

'আমি মাতাল নই…আমি শুধু একটা পরীক্ষার পাত্র। তুমি আমাকে নিয়ে একটা পরীক্ষা করো না কেন?'

'কারণ তুমি মাতাল।'

'আমি মাতাল নই!'

নবম শব্দ-ছবিতে একটা এঞ্জিনের গুঞ্জন, কতকগুলি কাচের পাত্র চুরমার হয়ে ভেঙে যাওয়ার শব্দ, দূরভাষের ব্যস্ত থাকার 'বিপ-বিপ' ধ্বনি, সশব্দে দরজা বন্ধ

হওয়ার আওয়াজ, বাতাসের গুমরে ওঠা এবং তারপর ফের একটা দরজার বন্ধ হয়ে যাওয়া।

'এই টেপটা কি সব চাইতে খারাপ?' জিগেস করলো মানুষটা।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ওটা আবার চালাও।'

দ্বিতীয় বার টেপটা শুনলো ওরা।

'এটা আমি তৃতীয়বার শুনতে পারি?'

'পারো, তবে নেহাতই নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে।'

'আমি নিজেই তো একটা ব্যতিক্রম।'

'তুমি বড্ড বেশি পান করে ফেলেছো···তোমার নেশা হয়েছে।'

এঞ্জিনের গুঞ্জনের সঙ্গে কি অর্থ মিশে আছে? আমার কাছে সেটা কিন্তু সর্বদাই মার্চ মাস···উনিশশো চুয়াল্লিশের মার্চ। ওই সময়েই জার্মানরা হাঙ্গেরিতে এসে ঢুকেছিলো। তার দু বছরেরও আগে থেকে আমি জুডিথকে ভালোবাসি। আসলে এখানে ওর নামটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। তবু যে নামটা বললাম তার কারণ, তাহলে আমার পক্ষে কাহিনীটা বলা সহজ হবে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম —তার দু বছরেরও আগে থেকে আমি জুডিথকে ভালোবাসতাম। জুডিথ ছিলো লম্বা চেহারার মেয়ে। তোমার মতোই লম্বা। ওকে দেখলে সর্বদাই মনে হতো, ও যেন কোনো সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে রয়েছে এবং ওই জন্যেই ওকে আরও বেশি করে মর্মস্পর্শী বলে মনে হতো। একবার ওর গলায় সামান্য একটু যন্ত্রণা হয়েছিলো, কিন্তু তাতেই ও মরতে বসেছিলো প্রায়। চমৎকার সাঁতার কাটতে পারতো, কিন্তু তা সত্ত্বেও আচমকা ওর পায়ে খিল ধরার কোনো ঘাটতি ছিলো না। কাজেই একবার ড্যানিয়ুবেও প্রায় ডুবেই যাচ্ছিলো, একেবারে শেষ মুহূর্তে লিনিফালু ঘাটে কোনো রকমে টেনে-হিঁচড়ে ওকে জল থেকে তোলা হয়। তারপর থেকে ওকে আর সাঁতার কাটতে দেওয়া হতো না। কিন্তু যতো সাবধানেই থাক, একদিন নিজের ঘরের মেঝেতে পিছলে পড়ে ও পা ভেঙে বসলো। ওদের পুরো পরিবার-টাই ছিলো ওই রকমের। ওর বাবা-মা কোনো একটা অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় একই দিনে মারা যান, অথচ রোগটাকে মনে করা হয়েছিলো নেহাতই সামান্য অসুস্থতা। ওর বিয়েটাও খুব জটিল হয়ে উঠেছিলো, শেষ পর্যন্ত ওদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

জুডিথ রোজগারপাতি ভালোই করতো। তোমার যে আসবাবপত্র রয়েছে,

ওরও সেই ধরনের আসবাব ছিলো—সেগুলো ও মা-বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলো। ওর সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয় তখন ও একটা বড়োসড়ো ব্যাঙ্কে কাজ করে—ম্যানেজারের সচিব। যা কিছু চেয়েছিলো, তার সবই ও তখন পেয়ে গেছে। শুধু আমাকে ও কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হয়নি। 'বিশ্বাস করো, আমি তোমার জীবনে শুধু অসুবিধেই বয়ে আনবো।' ও বলতো, 'এ অসম্ভব! তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা করো, লক্ষ্মীটি—এ একেবারে অসম্ভব!' আমি যতোই মিনতি করি না কেন, ও কিছুতেই টলবে না। অসংখ্য অজানা বিপদ ওর শরীরের মধ্যে আনাগোনা করতো, ঝিকিয়ে উঠতো ওর চোখ দুটিতে, ফুটে উঠতো ওর ত্বকের আভায়—মনে হতো যে কোনো মুহূর্তে তারা ওর অস্তিত্বে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে।

একেবারে শেষ সময়টুকু পর্যন্ত ও সুইমিং পুলে থাকতো। পুলের সমস্ত জল যতোক্ষণ বের করে দেওয়া না হতো, ততোক্ষণ ও সেখানেই অপেক্ষা করতো। সুইমিং পুলের জল যখন ছেড়ে দেওয়া হয় তখন—একেবারে শেষ সময়টাতে—পুলটাকে দেখে মনে হয় যেন একটা ফুটন্ত গোলাপ। দৃশ্যটা তুমি কখনও দেখেছো কি? তখন পুলের মধ্যে জলের অগভীর পাতলা চাদরে প্রতিফলিত বিজলির আলোয় মনে হয় যেন একটা বিশাল গোলাপের পাপড়িগুলো খুলে যাচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে নিজের চোখ দুটোকে ভরিয়ে তুলতে ভারি ভালোবাসতো জুডিথ।

সেবারের মার্চে, গিয়ার আর ব্রেকের তাড়নায় অসংখ্য লরির এঞ্জিনের গুমরে ওঠা গুঞ্জিত শব্দে মুখরিত দিনগুলোতে—টেলিফোন যখন সদাব্যস্ত, চারদিকে আতঙ্ক আর সন্ত্রাসের রাজত্ব—তখনও জুডিথ নিজের পোশাকে নির্যাতিতদের জন্যে নির্দিষ্ট 'হলুদ তারা' সেলাই করে নিতে রাজি হয়নি। তার চাইতে ও বরং নিজের ফ্ল্যাট থেকেই বেরুবে না। ও তখন রাস্তায় যেতো না, কিছু চাইতো না, এমন কি কারুর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে চাইতো না। আমি দিনে দু বার করে ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। খুব ভোরে, সারাটা রাত একা একা কাটাবার পর ও ভালো আছে কি না দেখতে। আর বিকেলে—অফিস থেকে সোজা ওর ফ্ল্যাটে গিয়ে মাঝরাত অব্দি আমি সেখানেই থাকতাম। একটা শামুকের মতো ও তখন নিজেকে গুটিয়ে রাখতো। আমাকে অসংখ্য প্রশ্ন করতো, কিন্তু আমার প্রশ্নগুলোর কোনো জবাবই দিতো না। তখনও আমি ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্সে কাজ করি, কাজেই আমার পক্ষে কোনো সুসংবাদ আনা সম্ভব হতো না—কারণ আমার ডিরেক্টার ছিলেন পুরোপুরি জার্মানদের পক্ষে। জুডিথ শিউরে উঠতো আর আমরা চুপচাপ বসে থাকতাম। এমনি করেই কেটে গেলো কয়েকটা সপ্তাহ।

তারপরেই একটা হুকুম জারি করা হলো। নির্দেশ দেওয়া হলো, হীনবর্ণের মানুষদের যূথবদ্ধভাবে একই ছাদের তলায় গিয়ে বাস করতে হবে। এই আদেশের ফলে জুডিথও আক্রান্ত হলো। ওর একটা বড়োসড়ো সুন্দর ফ্ল্যাট ছিলো, ফ্ল্যাটের সবকটা জানলা গ্যানিমুবের দিকে মুখ করা। কিন্তু এখন আমাদের স্থির করতে হবে, আমরা কি করবো—জুডিথ কোথায় গিয়ে গা ঢাকা দেবে। বৃথাই আমি ওকে অনুরোধ করলাম, মিনতি জানালাম—কিন্তু ও আমার কোনো কথারই জবাব দিলো না। তারপর আমি নানান রকমের পরিকল্পনা এনে হাজির করলাম, ও সেসব কানেও তুললো না। 'তোমার বাড়িতে গিয়ে উঠবো ? না না, সে প্রশ্নই ওঠে না। ও সব কথা ভুলে যাও।...অন্য কারুর বাড়িতে ? আচ্ছা, তুমি কি মনে করেছো বলো তো ? আমি তো এসমস্ত কথা ভাবতেও পারি না !...বুদাপেস্টেই থাকবো ? কোনোমতেই না।...গ্রামে যাবো ? না না, তা অসম্ভব ! জাল কাগজ-পত্র নিয়ে অন্য কারুর পরিচয়ে বেঁচে থাকবো ? মিথ্যে কথা বলবো ? নিজেকে অপমান করবো ? না, না, না !'

ও ফ্ল্যাটটা ছাড়ার আগে ওর যাত্রাটাকে বিলম্বিত করে তোলার ব্যবস্থা করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিলো না। আরও চারটে দিন ও ফ্ল্যাটে থেকে যেতে পারে। বহু চেষ্টার পর শেষ অব্দি ও অন্য কারুর কাগজপত্র নিয়ে, অন্য নামে, আমার ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠতে রাজি হলো। সুদীর্ঘ, উত্তপ্ত এবং ক্লান্তিকর বাকবিনিময়ের পরে তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় আমরা যখন এই রকম একটা জায়গায় গিয়ে পৌছলাম তখন দুজনেই একেবারে ক্লান্ত এবং নিঃশেষিত। বকতে বকতে গলা এমন ধরে গেছে যে পরস্পরের কথাও ভালোমতো শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমি ওকে ঘাড় নাড়তে দেখলাম। একেবারে শেষটাতে ও ঘাড় নেড়েছিলো—যার অর্থ 'হ্যাঁ'। আমি তখন এতোই ক্লান্ত যে ওর ওই ঘাড় নাড়ার অর্থটাও সঠিকভাবে বুঝতে পারছিলাম না। তারপরেই ওকে 'হ্যাঁ' বলতে শুনলাম। আমি যেন নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারও ঘাড় নাড়লো এবং পরিষ্কার ভাষায় বললো, 'হ্যাঁ...হ্যাঁ'।

সেদিন রাতে আমি বাড়িতে ফিরতে চাইছিলাম না, কিন্তু ও জোর করে আমাকে পাঠিয়ে দিলো। ঠিক হয়েছিলো, পরের দিন সকাল সাতটায় আমি ফের ওর ফ্ল্যাটে আসবো। সেই মতো সকাল সাতটায় গিয়ে ওর দরজায় ঘন্টি বাজালাম, কিন্তু কেউ কোনো সাড়া দিলো না। দ্বিতীয় বার বাজালাম—এবারেও চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। তবে কি ও এতো বেলা অব্দি ঘুমোচ্ছে ? ওর ঘুমটা ভাঙাতে ইচ্ছে করছিলো না। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো, আমার কাছেও ওর ফ্ল্যাটের

একটা চাবি আছে। তাই নিজের চাবিটা ব্যবহার করেই আমি ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম।

তুমি কি আমার কথাগুলো শুনছো, ইলোনা? এই পর্যন্ত যদি শুনে থাকো, তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে তারপরে কি ঘটেছিলো। কয়েক ঘণ্টা আগে আমি জুডিথকে যেভাবে রেখে গিয়েছিলাম, ও তখনও সেই একই ভঙ্গিমায় বসেছিলো ওর আরাম-কুর্সিতে। মাথা পেছন দিকে হেলানো, শরীরটা শক্ত—যেন লজ্জা আর যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে গেছে ওর শরীরটা। আমি ওকে গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম, তারপর শক্ত করে ওকে আঁকড়ে ধরে ফের ডাকলাম। কিন্তু আমার ডাকে সাড়া দেবার মতো শক্তি তখন আর ওর ছিলো না। ওর শরীর, ওর হৃৎপিণ্ড, ওর মস্তিষ্ক—সবই তখন বিষে সংপৃক্ত। ওকে নিজের শরীরের সঙ্গে চেপে ধরলাম আমি: তখনও ওর হৃৎপিণ্ডটা চলছে।

সে এক ভয়ঙ্কর সকাল, আরও ভয়ঙ্কর ছিলো সেদিনের বিকেলটা। টেলিফোন করে আমি ডাক্তার ডেকে পাঠিয়েছিলাম, সমস্ত রকমের চেষ্টাই করেছিলাম সকলে মিলে। ডাক্তাররা প্রথমে ওর শিরায় এবং তারপর হৃৎপিণ্ডেও নানান ধরনের ওষুধপত্র পাম্প করেছিলেন। কিন্তু ততোক্ষণে ও সমস্ত সাহায্যের বাইরে চলে গেছে। বেলা এগারোটা নাগাদ মারা গেলো ও।

তখন আমার কেমন লেগেছিলো? অনুভব করার মতো কোনো শক্তিই তখন আমার ছিলো না। আমি কিছুই অনুভব করছিলাম না। এমন কি তার পরের সপ্তাহেও না। যেটুকু প্রয়োজন ছিলো—অনুমতি নেওয়া, সমাধিস্থ করা—তার সবই আমি করেছিলাম। কিন্তু তা ছাড়া নিজেকে স্রেফ একটা মরা-গাছ বলে মনে হচ্ছিলো আমার—মনে হচ্ছিলো আমার ভেতরকার সমস্ত কিছুই যেন মরে গেছে। যে কোনো অনুভূতির কাছেই আমি তখন সম্পূর্ণ অভেদ্য হয়ে উঠেছিলাম। আমাকে দু টুকরো করে কেটে ফেললেও তখন আমি কিছু অনুভব করতে পারতাম না।

একটা সপ্তাহ আমি কোনো কিছুই চিন্তা করিনি। এমন কি ওর ফ্ল্যাটে একবার যাবার কথাও আমার মনে হয়নি, যদিও ওর দরজার একটা চাবি আমার কাছেই ছিলো। তারপর, বেশ কিছু দিন বাদে, হঠাৎ মনে পড়লো আমার চিঠিগুলো ওর ওখানে রয়েছে এবং তাছাড়া ওর জিনিসপত্রগুলোর দেখাশুনো করাও আমার কর্তব্য। তাই একদিন সকালে অফিসে যাবার পথে আমি আগের মতোই ওর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। সিঁড়ির বাঁকটায় পৌঁছেই কেমন যেন একটা অস্বস্তি লাগলো—জুডিথের দরজার ওধার থেকে আমি কাদের যেন

কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। দ্রুত হাতে দরজায় চাবিটা ঘুরিয়ে হলঘরে ঢুকতেই দেখি, আমার মুখোমুখি এক অপরিচিত মহিলা। বোকা বোকা দেখতে, ভয়-পাওয়া একটি স্বর্ণকেশী।

'আপনি কে?' তীক্ষ্ণ স্বরে আমি ওকে জিগেস করলাম।

আরও ভয় পেয়ে আমার কাছ থেকে পেছিয়ে গেলো মহিলা।

'কি করছেন আপনি এখানে?' পায়ে পায়ে ওকে অনুসরণ করলাম আমি।

মহিলা চিৎকার করে কিছু একটা বলে ঘরের মধ্যে ছুটে গেলো। কিন্তু ততোক্ষণে ঠিক দোরগোড়ায় পা রেখে দাঁড়াবার মতো সময়টুকু আমি পেয়ে গেছি।

'এটা আমাদের ফ্ল্যাট…' অবশেষে হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরের ভেতর থেকে বললো মহিলা।

সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেলো। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির অধিকারবলে এখানে নতুন ভাড়াটে বসানো হয়েছে এবং সেই সুবাদে অ্যারো-ক্রস পার্টির এক লেফটেন্যান্ট এখানে এসে আস্তানা গেড়েছে। রীতিনীতি বজায় রাখার ব্যাপারে লোকটা বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায়নি, কারণ আবাসন দপ্তর থেকে ফ্ল্যাটটা তাকে দেওয়া হয়নি—সে নিজে থেকেই এসে জুডিথের তিনটে ঘরের দখল নিয়ে বসেছে। বোকাটে চেহারার স্বর্ণকেশীটি তার স্ত্রী এবং আজ চারদিন হলো ওরা এখানে বসবাস করছে। লেফটেন্যান্টের স্ত্রী এইমাত্র ওদের পরিচারিকাকে দোকানে পাঠিয়েছে এবং সিঁড়ি থেকে আমি ওদেরই কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলাম।

মিনিট খানেকের মধ্যেই পরিচারিকাটি ফিরে এলো। ততোক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে লেফটেন্যান্টের স্ত্রী বললো, 'আমি পুলিস ডাকবো।'

'ডাকুন।'

আমি ওর দিকে তাকাইওনি—এক বিচিত্র কৌতূহলের তাড়নায় আমি তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম জুডিথের ঘরগুলোতে। দু-একবার, আমার পথ জুড়ে দাঁড়াচ্ছিলো বলে, ওই নির্বোধ বাচাল স্বর্ণকেশীটিকে আমায় ঠেলে সরিয়ে দিতে হয়েছিলো। সমস্ত কিছুই আমি পরীক্ষা করে দেখলাম। নিজের চোখ দুটোকে আমার বিশ্বাস হচ্ছিলো না, কিন্তু যা দেখলাম তা বিশ্বাস করা ছাড়া কিছু করারও ছিলো না।…দেখলাম ফ্ল্যাটে সত্যিই নতুন ভাড়াটেরা—তার মানে দখলদারেরা—বাস করছে। ছোটো একটা টেবিলে প্রাতরাশের অবশিষ্টাংশ ছড়ানো—সেখানে জুডিথের টেবিল-ক্লথ, জুডিথের পেয়ালা-পিরিচ। ওরা জুডিথের

বিছানায় শুয়েছে, জুডিথের চাদর ব্যবহার করেছে। ওরা জুডিথের রাখা টিনের কৌটো খুলে খাবার খেয়েছে, জুডিথের ভাঁড়ার লুঠপাট করেছে। ওই মহিলাটি জুডিথের সুগন্ধি নিজের অঙ্গে ছড়িয়েছে, জুড়িথের লিপস্টিক দিয়ে ঠোঁট রাঙিয়েছে। ওরা এখানে যে সিগারেটগুলো পেয়েছে সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে ধূমপান করেছে, আলমারিতে যে পোশাকগুলো দেখেছে সেগুলো নিজেরা পরেছে—কার জিনিস তা নিয়ে একটুও মাথা ঘামায়নি। আতঙ্কিত চোখের ওই যে মহিলাটি, ওর পরনে জুডিথেরই অঙ্গাবরণী, পাতলা ওই রাত্রিবাসটা আমি কতো বার দেখেছি জুডিথের গায়ে।…গোটা ফ্ল্যাটটা আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলাম। সমস্ত কিছুই পরিচিত বলে মনে হচ্ছিলো, কিন্তু সবকিছুতেই আমি ওই অপরিচিত মানুষগুলোর স্পর্শ অনুভব করছিলাম।…ওই একই গ্লাস থেকে ওরা পান করেছে, একই প্লেটে খেয়েছে।…

লেফটেন্যাণ্ট বাড়িতে ছিলো না। কিন্তু মহিলাটিকে আমি কি কিছু বলেছিলাম? জানি না। হয়তো কিছুই বলিনি।

ও হ্যাঁ। এবারে মনে পড়েছে, শেষ অব্দি একটা কথা বলেছিলাম বৈকি! বলেছিলাম, 'তোমরা রেহাই পাবে না'।

'তারপর?' প্রশ্ন করলো ইলোনা।

মানুষটা চুপ করে রইলো, কোনো জবাব দিলো না—মাথাটা হেলিয়ে রাখলো পেছন দিকে, যেন মাথাটা টলছে তার। তারপর ভীষণ রুক্ষ আর অপ্রত্যাশিতভাবে সে চিৎকার করে উঠলো, 'তুমি কেন কথাটা জানতে চাইলে? কেন তুমি শুনতে চাইছো যে অতো কাণ্ড করেও ওরা শেষ অব্দি রেহাই পেয়ে গিয়েছিলো? হ্যাঁ, ওরা পালাতে পেয়েছিলো—বন্যার পরে ওদের সমস্ত হদিশই হারিয়ে যায়। আমি ওদের খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।…মোটকথা রেহাই ওরা পেয়েছিলো, ব্যাস!'

নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো মানুষটা। পা দুটো যেন সীসের মতো ভারি। ইলোনার দিকে তাকিয়ে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সে।

'তুমি ঠিকই বলেছিলে…' অবশেষে বললো সে। 'আমার দ্বিধাদ্বন্দ্বের খবরটাও তুমি বের করে ফেলেছো। তোমার টেপটায় শেষের শব্দটা কি ছিলো যেন? সজোরে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ। ইলোনা, আমার ভয় হচ্ছে…মনে হচ্ছে যে আমরাও আমাদের দরজাটাকে সজোরে বন্ধ করে ফেলেছি। আমাদের এই ছোট্ট মধুর সম্পর্কটাকে আমরা নষ্ট করে ফেলেছি, ইলোনা! দোষ তোমার নয়… দোষ আমার, শুধু আমার!'…

দরজার দিকে এগিয়ে চললো মানুষটা।

'তুমি আমাকে এগিয়ে দিতে এসো না। হয়তো আমি তোমাকে একটা টেলিফোন করবো…কোনো একদিন…'

ঘর

জঁ। পল সার্ত্রে

আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের সম্ভবত সব চাইতে বিতর্কিত পুরুষ, মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী, অস্তিত্ববাদের অন্যতম প্রবক্তা জঁ। পল সার্ত্রের জন্ম পারীতে, ১৯০৫ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পারীর প্রতিরক্ষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রথম জীবনে শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাকলেও, পরবর্তী কালে শুধুমাত্র নিজের লেখা এবং একটি সাময়িক পত্রের সম্পাদনা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৬৪ সালে। নাটক ও দার্শনিক রচনাবলী ছাড়াও তাঁর 'নসিয়া' (১৯৩৮), 'দ্য এজ অফ রিজনস' (১৯৪৫), 'দ্য রিপ্রাইভ' (১৯৪৭), 'আয়রন ইন দ্য সোল' (১৯৪৯) ইত্যাদি উপন্যাস শুধু ফরাসী নয়, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যেরই অমূল্য রত্ন।

একটা মিঠাই আঙুলে করে তুলে নিলেন মাদাম দাবেদা। পাছে নিঃশ্বাসের বাতাসে মিঠাইটাকে মুড়ে রাখা চিনির সূক্ষ্ম কণাগুলো উড়ে যায়, সেই ভয়ে জিনিসটাকে সাবধানে ঠোঁটের কাছে তুলে দম বন্ধ করে রাখলেন উনি। 'একদম ঠিক আছে,' নিজের মনেই বললেন মাদাম। তারপর চট করে মিঠাইটার কাচের মতো স্বচ্ছ মাংসল অংশে কামড় দিতেই স্রোতহীনতার একটা নির্যাস ওঁর সমস্ত মুখখানাকে ভরিয়ে তুললো। 'অসুস্থতা যে কিভাবে মানুষের সংবেদনশক্তিকে তীক্ষ্ণ করে তোলে!' মসজিদ আর প্রাচ্যদেশের অত্যধিক আজ্ঞানুবর্তী মানুষগুলোর কথা (মধুচন্দ্রিমায় উনি আলজেরিয়ায় গিয়েছিলেন) ভাবতে শুরু করলেন মাদাম এবং ওঁর ফ্যাকাশে ঠোঁট দুটিতে এক টুকরো মৃদু হাসি ফুটে উঠতে শুরু করলো: মিঠাই-টাও খুব আজ্ঞানুবর্তী।

বইয়ের পৃষ্ঠাগুলোতে মাদামকে বেশ কয়েকবারই হাতের তালু বুলিয়ে নিতে হচ্ছিলো। কারণ উনি সাবধানতা নেওয়া সত্ত্বেও পৃষ্ঠাগুলো বারবার সাদা সাদা সূক্ষ্ম গুঁড়োর হালকা আস্তরণে ভরে উঠছিলো। হাতটা বইয়ের মসৃণ পৃষ্ঠায় ঘষটানি মেরে গড়িয়ে ফেলে দিচ্ছিলো চিনির সূক্ষ্ম দানাগুলিকে। 'আক্যাশতে সমুদ্রের ধারে বসে আমি যখন বই পড়তাম, তখনকার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।' ১৯০৭ সালের গ্রীষ্মটা উনি সমুদ্রসৈকতে কাটিয়েছিলেন। সবুজ ফিতে লাগানো

বিশাল একটা খড়ের টুপি মাথায় চাপিয়ে, জিপ কিংবা কোলেৎ উভয়ের একখানা উপন্যাস হাতে নিয়ে উনি তখন ফেরিঘাটের খুব কাছাকাছি গিয়ে বসতেন। দামাল বাতাস বালির ঘূর্ণিধারা ছড়িয়ে দিতো ওঁর পা দুটিতে এবং থেকে থেকেই বইয়ের প্রান্তগুলো ধরে বইটা ঝেড়ে নিতে হতো ওঁকে। অনুভূতিটা সেই একই রকম—শুধু বালির দানাগুলো ছিলো শুকনো আর চিনির সূক্ষ্ম গুঁড়োগুলো সামান্য লেগে রয়েছে আঙুলের প্রান্তগুলোতে। একটা কালো সমুদ্রের ওপরে ফের এক টুকরো মুক্তো-ধূসর আকাশ দেখতে পেলেন মাদাম। 'ইভ তখনও জন্মায়নি।' চন্দনকাঠে তৈরি রত্ন-পেটিকার মতো মহার্ঘ কিছু স্মৃতির বোঝায় নিজেকে প্রচণ্ড ভারাক্রান্ত বলে মনে হলো ওঁর। তখন যে বইটা পড়তেন, আচমকা তার নামটা মনে পড়ে গেলো : পেতিত মাদাম। আদৌ একঘেয়ে নয়। কিন্তু একটা অজ্ঞাত অসুস্থতা ঘরের মধ্যে ওঁকে বন্দী করে ফেলার পর থেকে উনি স্মৃতিকথা আর ঐতিহাসিক রচনা পড়তেই বেশি ভালোবাসেন।

উনি আশা করেন যন্ত্রণাভোগ, গভীর পড়াশুনো, স্মৃতির প্রতি সতর্ক মনোযোগ এবং চরম সৌন্দর্যময় অনুভূতি ওঁকে উদ্যানের উষ্ণ-কক্ষে রাখা ফলের মতো সুপরিপক্ক করে তুলবে।

খানিকটা বিরক্তি নিয়েই মাদাম ভাবলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁর স্বামী এসে দরজায় টোকা দেবেন। সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে তিনি শুধুমাত্র সন্ধ্যেবেলায় আসেন, নিঃশব্দে মাদামের কপালে চুমু দেন এবং আরাম-কুর্সিতে ওঁর মুখোমুখি হয়ে বসে ল্য তম্প-খানা পড়েন। কিন্তু বৃহস্পতিবারটা মঁ্যসিয় দাবেদার দিন: বৃহস্পতিবার সাধারণত তিনটে থেকে চারটে অব্দি এক ঘণ্টা সময় তিনি তাঁর মেয়ের সঙ্গে কাটান। সেখানে যাবার আগে একবার তিনি স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এ ঘরে আসেন এবং তখন দুজনে মিলে তিক্ততা সহকারে তাঁদের জামাতাটির সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। বৃহস্পতিবারের এই আলোচনাগুলো, যার সামান্যতম খুঁটিনাটিও আগে থেকে বলে যায়, মাদাম দাবেদাকে ক্লান্ত করে তোলে। মঁ্যসিয় দাবেদা নিজের উপস্থিতি দিয়ে এই নিরিবিলি ঘরখানাকে ভরাট করে তোলেন। তিনি কখনই বসেন না, ঘরের মধ্যে বৃত্তাকারে পায়চারি করতে থাকেন। তাঁর প্রতিটি বিস্ফোরণ কাচের তীক্ষ্ণ টুকরোর মতো মাদাম দাবেদাকে আঘাত করে। এই বিশেষ বৃহস্পতিবারটা আবার অন্যান্য সাধারণ বৃহস্পতিবারগুলোর চাইতেও খারাপ। খুব শীগগিরই ইভের স্বীকারোক্তিগুলো স্বামীর কাছে পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন হবে এবং তারপর দেখতে হবে, তাঁর বিশাল ভীতিপ্রদ শরীরটা রাগে

বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে—ভাবতেই মাদাম দাবেদার ঘাম ছুটে গেলো। পিরিচ থেকে একটা মিঠাই তুলে নিলেন উনি, খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সেটার দিকে, তারপর দুঃখিত ভঙ্গিতে সেটাকে নামিয়ে রাখলেন আবার—ওঁর স্বামী ওঁকে মিঠাই খেতে দেখবেন, উনি তা চান না।

দরজায় টোকা দেবার শব্দে চমকে উঠলেন মাদাম দাবেদা। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'ভেতরে এসো।'

পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলেন মঁ্যসিয়। তারপর প্রতি বৃহস্পতিবারের মতোই বললেন, 'আমি ইভের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

মাদাম দাবেদা তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, 'আমার হয়ে ওকে একটা চুমু দিও।'

মঁ্যসিও দাবেদা কোনো জবাব দিলেন না, তাঁর কপালে চিন্তার কুঞ্চন জাগলো : প্রতি বৃহস্পতিবার ঠিক এই সময়টাতে তাঁর বদহজমের বোঝার সঙ্গে কেমন যেন একটা চাপা বিরক্তি মিশে থাকে। 'ইভের কাছ থেকে ফেরার সময় আমি একবার ফ্রাঁশর সঙ্গে দেখা করে আসবো—যাতে সে ইভের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওকে ব্যাপারটা একটু বোঝাবার চেষ্টা করে।'

ডাক্তার ফ্রাঁশর সঙ্গে তিনি প্রায়ই দেখা করেন। কিন্তু বৃথাই। মাদাম দাবেদা নিজের ভুরু দুটিকে ওপরের দিকে তুললেন। আগে, যখন শরীর ভালো ছিলো, তখন উনি কাঁধ ঝাঁকাতেন। কিন্তু শরীরে অসুস্থতার বোঝা চেপে বসার পর থেকে, অঙ্গভঙ্গিগুলো শরীরকে ক্লান্ত করে তুলতে পারে বলে উনি সেগুলোর বদলে মুখে অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলেন। উনি চোখ দিয়ে বললেন 'হ্যাঁ' আর 'না' বললেন ঠোঁটের প্রান্ত দিয়ে : কাঁধের বদলে উঁচু করলেন ভুরু দুটিকে।

'ইভের কাছ থেকে ওটাকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে যাবার নিশ্চয়ই কোনো না কোনো পথ আছে।'

'আমি তোমাকে আগেই বলেছি, সেটা অসম্ভব। আর তা ছাড়া এ ব্যাপারে আইন-কানুনও ভীষণ বাজেভাবে করা হয়েছে। এই তো, এই সেদিনই ফ্রাঁশ আমাকে বলছিলো যে রোগীর পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে ওদের ওপরে ভীষণ ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা আসে। এমন অনেকেই আছে যারা মনস্থির করতে পারে না, রোগীকে বাড়িতে রেখে দিতে চায়। সেসব ক্ষেত্রে ডাক্তারের হাত বাঁধা। তারা শুধু কিছু দিন অন্তর পরামর্শ দিতে পারে—ব্যাস। কাজেই হয় সে নিজে কোনো কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি ঘটাবে, আর নয়তো ইভকেই মুখ ফুটে বলতে হবে যাতে মানুষ-টাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।'

'এবং সেটা আসছে কালই ঘটছে না,' মাদাম বললেন।

'না,' মঁ্যসিয় দাবেদা আরশির দিকে ফিরে নিজের দাড়িতে আঙুল চালাতে শুরু করলেন। মমতাহীন দৃষ্টিতে স্বামীর বলিষ্ঠ রক্তিম ঘাড়ের দিকে তাকালেন মাদাম।

'ও যদি এইভাবে চলে, তাহলে ও পিয়েরের চাইতেও বেশি পাগল হয়ে যাবে।' মঁ্যসিয় বললেন, 'ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর। ও মানুষটার কাছ থেকে নড়ে না, শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসার জন্যে বাড়ি থেকে বেরোয়। ওর সঙ্গে কেউ দেখা করতে যায় না। ঘরটার বাতাস নিঃশ্বাস নেবার পক্ষে স্রেফ অনুপযুক্ত। কিন্তু তবু জানলাটা কক্ষণো খোলে না—কারণ পিয়ের চায় না জানলাটা খোলা হোক। সত্যি বলছি, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়…ওর চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন অদ্ভুত…বুঝলে!'

'আমি তেমন কিছু লক্ষ্য করিনি,' মাদাম দাবেদা বললেন। 'ওকে তো আমার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। তবে স্পষ্টতই ওকে মনমরা দেখায়।'

'ওর মুখটা কবর-না-দেওয়া একটা মরামানুষের মুখের মতো। ও কি কখনও খায়? ঘুমোয়? কিন্তু আমাদের পক্ষে এই সমস্ত কথাগুলো ওকে জিগেস করাও ঠিক নয়। তবে আমার ধারণা, পিয়েরের মতো একটা লোককে পাশে নিয়ে ও সারা রাত এক ফোঁটাও ঘুমোয় না।' মঁ্যসিয় দাবেদা দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললেন, 'আমার অবাক লাগে এই ভেবে যে, আমরা ওর বাবা-মা—অথচ ওর নিজের কাছ থেকে ওকে বাঁচাবার কোনো অধিকারই আমাদের নেই। আমি জানি, ফ্রাঁশ পিয়েরকে অনেক বেশি ভালোভাবে তত্ত্বাবধান করতে পারবে। ওখানে একটা বড়োসড়ো পার্ক আছে। তা ছাড়া আমার ধারণা,' সামান্য হেসে মঁ্যসিয় বললেন, 'সমগোত্রীয় মানুষের সঙ্গে সে অনেক বেশি ভালো থাকবে। ওই ধরনের মানুষগুলো শিশুর মতো, তাদের মধ্যেই ওদের ছেড়ে দিতে হয়—ওরা নিজেদের মধ্যে এক ধরনের সহমর্মিতা গড়ে তোলে। আমি তো বলবো প্রথম দিনই পিয়েরকে সেখানে রেখে আসা উচিত ছিলো এবং সেটা ওরই ভালোর জন্যে।'

এক মুহূর্ত পরে মঁ্যসিয় ফের বললেন, 'শোনো, ইভ যে একা পিয়েরের সঙ্গে থাকে—বিশেষ করে রাত্তিরটা—এটা আমার মোটেও ভালো লাগে না। ধরো, তেমন কিছু যদি হয়ে যায়! পিয়েরের মধ্যে একটা ভীষণ ধূর্ততা আছে।'

'দুশ্চিন্তা করার মতো কোনো কারণ আছে কি না, আমি জানি না। পিয়েরের হাবভাব চিরদিনই ওই রকম। সর্বদাই সে যেন গোটা দুনিয়াটাকে নিয়ে

মজা করতো। বেচারা! অতো অহংকার—আর শেষে এই তার পরিণতি!' মাদাম দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'নিজেকে সে আমাদের মধ্যে সব চাইতে বেশি চতুর বলে মনে করতো। নিজস্ব ভঙ্গিতে 'আপনি ঠিকই বলেছেন' বলতো—স্রেফ কোনো বিতর্কে ইতি টানার জন্যে।...নিজের অবস্থাটা সে যে এখন বুঝতে পারছে না, এটা তার কাছে একটা আশীর্বাদ।'

খানিকটা বিরক্তি নিয়ে পিয়েরের সেই লম্বা, বিদ্রূপমাখা, সর্বদা এক ধারে সামান্য ঘোরানো মুখটার কথা মনে করলেন মাদাম। ইভের বিয়ের পর প্রথম দিককার দিনগুলোতে মাদাম দাবেদা জামাতার কাছে সামান্য একটু অন্তরঙ্গতা ছাড়া আর কিছুই চাননি। কিন্তু মাদামকে সে নিরুৎসাহ করেছে: মুখ প্রায় কখনই খোলেনি, সর্বদা সমস্ত কথায় দ্রুত সায় দিয়ে গেছে এবং তাও অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে।

'ফ্রাঁশ তার আরোগ্যশালাটা আমাকে দেখিয়েছে', ম্যঁসিয় দাবেদা নিজের অভিপ্রায়টিকে সফল করে তোলার চেষ্টায় লেগে রইলেন। 'অপূর্ব জায়গা। রোগীদের নিজস্ব ঘর রয়েছে। ঘরে চামড়ায় মোড়া আরাম-কুর্সি—ইচ্ছে হলে বসবে—আর দিনের শয্যা। ওদের একটা টেনিস-কোর্টও আছে, বুঝলে। আর শীগগিরই একটা সাঁতার-দীঘিও তৈরি করবে।'

জানলার ধারে বসেছিলেন ম্যঁসিয়, দৃষ্টি বাইরের দিকে, ভাঁজ করে রাখা পা দুটি নাচাচ্ছিলেন মৃদু মৃদু। আচমকা তিনি চট করে ঘুরে দাঁড়ালেন—কাঁধ দুটো আনত, দুই হাত পকেটে গোঁজা। মাদাম দাবেদার মনে হলো, এক্ষুণি উনি ঘামতে শুরু করবেন: প্রতিবার এই একই ঘটনা: ওই তো, পিঞ্জরাবদ্ধ ভালুকের মতো ম্যঁসিয় ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন আর প্রতিটা পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে কচমচ করে উঠছে তাঁর পায়ের জুতো জোড়া।

'লক্ষীটি, তুমি একটু স্থির হয়ে বসো। তুমি আমাকে ক্লান্ত করে তুলছো!' দ্বিধান্বিত স্বরে মাদাম বললেন, 'তোমাকে আমার একটা জরুরি কথা বলার আছে।'

ম্যঁসিয় দাবেদা আরাম-কুর্সিতে বসে হাত দুটোকে হাঁটুর ওপরে রাখলেন। মাদাম দাবেদার শিরদাঁড়া বেয়ে সামান্য একটা শিরশিরে অনুভূতি ওপরের দিকে উঠে গেলো: সময় এসে গেছে, এবারে কথাটা ওঁকে বলতেই হবে।

'তুমি তো জানো,' বিব্রত কাশি দিয়ে মাদাম বললেন, 'মঙ্গলবার ইভের সঙ্গে দেখা আমার হয়েছিলো।'

'হ্যাঁ।'

'সেদিন আমরা নানান বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছি। বহুদিন ইভ আমার কাছে অমন মন খুলে কথা বলেনি। তারপর আমি ওকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করলাম, ওর মুখ দিয়ে পিয়েরের সম্পর্কে কথা বের করলাম। তাতে দেখলাম,' মাদাম ফের বিব্রত হয়ে উঠলেন, 'ও পিয়েরের ওপরে 'ভীষণ' অনুরক্ত।'

'সেটা আমি খুব ভালোভাবেই জানি,' ম্যঁসিয় দাবেদা বললেন।

মাদাম দাবেদাকে তিনি সামান্য বিরক্ত করে তুললেন: মাদামকে সর্বদা প্রতিটা বিষয় একেবারে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। অথচ মাদাম এমন একটি সূক্ষ্ম এবং সুবেদী মানুষের সংসর্গে জীবন যাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যিনি ওঁর সামান্য একটি শব্দেরও অর্থ বুঝে নিতে পারবেন।

'কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে আমরা যেমনটি ভেবেছিলাম, ও মানুষটার সঙ্গে তার চাইতে অন্যরকমভাবে আসক্ত।'

ম্যঁসিয় দাবেদা তাঁর হিংস্র উদ্বিগ্ন চোখ দুটিকে বিস্ফারিত করে তুললেন— কোনো নতুন বিষয় অথবা কোনো তির্যক উক্তি কোনোমতেই পুরোপুরি বুঝতে না পারলে তিনি চিরদিনই যা করে থাকেন।

'এ সমস্ত কথার অর্থ?'

'চার্লস, তুমি আমাকে ক্লান্ত করে তুলো না! তোমার বোঝা উচিত যে একজন মায়ের পক্ষে কিছু কিছু বিষয় মুখে বলা কঠিন।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছিনে,' ম্যঁসিয় দাবেদার কণ্ঠে একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ে। 'তুমি নিশ্চয়ই বলতে চাইছো না যে…'

'হ্যাঁ।'

'ওরা এখনও…মানে, এখনও…?'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ! হ্যাঁ!' বিরক্তিময় এবং শুকনো তিনটি ছোটো ছোটো ঝাঁকুনি তুলে জবাব দিলেন মাদাম।

ম্যঁসিয় দাবেদা দু হাত ছড়িয়ে, মাথা নিচু করে নিশ্চুপ হয়ে রইলেন।

'চার্লস,' মাদাম উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'কথাটা তোমাকে বলা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু এটা আমি নিজের মধ্যে চেপে রাখতে পারিনি!'

'আমাদের সন্তান,' ম্যঁসিয় আস্তে আস্তে বললেন। 'ওই পাগলটার সঙ্গে! সে তো এখন আর ওকে চিনতেও পারে না! ওকে আগাথা বলে ডাকে! ও নিশ্চয়ই নিজের মর্যাদা সম্পর্কে সমস্ত বোধ বুদ্ধি খুইয়ে ফেলেছে।' মাথা তুলে তীব্র দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন উনি, 'তুমি ঠিক জানো, তুমি কোনো ভুল করোনি?'

'কোনো রকম সন্দেহেরই সম্ভাবনা নেই। তোমার মতো আমিও ওর কথাটা

বিশ্বাস করতে পারিনি এবং এখনও পারছি না। ওই হতভাগাটা গায়ে হাত দিয়েছে ভাবলেই…' মাদাম দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'আমার মনে হয় ওইভাবেই সে মেয়েটাকে ধরে রেখেছে।'

'পিয়ের যখন এসে ওকে বিয়ে করার জন্যে প্রস্তাব জানালো, তখন আমি তোমাকে কি বলেছিলাম—মনে আছে? বলেছিলাম, আমার ধারণা ছেলেটা ইভকে 'বড্ড বেশি' তুষ্ট করেছে। তুমি তখন আমার কথা বিশ্বাস করোনি।' আচমকা মঁ্যাসিয় টেবিলটাতে আঘাত করলেন, লাল হয়ে উঠলেন ভীষণভাবে। 'এটা তো বিকৃতি! সে ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে, চুমু দেয়, আগাথা বলে ডাকে, উড়ন্ত পাথরের মূর্তি এবং ঈশ্বর জানেন আরও কতো কি অর্থহীন আজেবাজে কথা বলে ওর সঙ্গে ছলনা করে! ও একটিও কথা বলে না! কিন্তু ওদের দুজনের মধ্যে আছেটা কি? ইভ মানুষটার জন্যে দুঃখ করুক, তাকে একটা স্বাস্থ্যনিবাসে রাখুক, প্রতিদিন তাকে দেখতে যাক—ঠিক আছে, ভালো কথা। কিন্তু আমি কোনোদিনও ভাবিনি…আমি ওকে একটা বিধবা বলে মনে করি। শোনো জানেৎ,' মঁ্যাসিয় গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি তোমাকে খোলাখুলি বলছি। ওর যদি বোধ বুদ্ধি কিছু থেকে থাকে, আমি চাইবো ও বরঞ্চ একটি প্রেমিককে বেছে নিক।'

'তুমি চুপ করো, চার্লস!' মাদাম দাবেদা চিৎকার করে উঠলেন।

টুলের ওপরে রেখে দেওয়া টুপি আর বেতের ছড়িটাকে ক্লান্ত ভঙ্গিতে তুলে নিলেন মঁ্যাসিয় দাবেদা, 'এইমাত্র তুমি আমাকে যা বললে, তাতে আমার মনে আশা বলতে তেমন কিছু নেই। যাই হোক, তবু আমি একবারটি ওর সঙ্গে কথা বলে দেখবো—কারণ সেটা আমার কর্তব্য।'

'আমার মনে হয়, অন্য যে কোনো জিনিসের চাইতে ইভের মধ্যে একগুঁয়েমিটা একটু বেশি—বুঝলে।' মঁ্যাসিয়কে উৎসাহী করে তুলতে মাদাম দাবেদা বললেন, 'ও জানে যে পিয়ের কোনোদিনও সেরে উঠবে না, কিন্তু তবু ও নিজের জেদটাকেই ধরে রেখেছে…ও নিজের ভুল স্বীকার করতে চায় না।'

'একগুঁয়ে? হয়তো তাই।' মঁ্যাসিয় দাবেদা অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে দাড়িতে হাত বোলান, 'তুমি যদি ঠিক বলে থাকো, তাহলে শেষ অব্দি ও এসবে ক্লান্ত হয়ে উঠবে। পিয়ের সর্বদা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না, কথাবার্তাও খুব একটা বলে না। আমি তার সঙ্গে দেখা করলে, সে আমার সঙ্গে শুধু করমর্দন করে—একটি কথাও বলে না। আমার ধারণা, একা হওয়া মাত্রই ওরা দুজনে মিলে পিয়েরের সেই মোহাচ্ছন্নতার মধ্যে ফিরে যায়। ইভ আমাকে বলেছে: অলীক দৃশ্য দেখে মাঝে মাঝে পিয়ের এমন চিৎকার করে, যেন তার গলাটাকে কেটে ফেলা হচ্ছে।

সে নানান মূর্তিটুর্তি দেখতে পায়। দেখে ভয় পায়, কারণ মূর্তিগুলো অস্পষ্ট গুঞ্জন-ধ্বনি জাগিয়ে তোলে। পিয়ের বলে, তারা চতুর্দিকে উড়ে বেড়ায় এবং সন্দেহজনক দৃষ্টিতে পিয়েরের দিকে তাকায়।'

দস্তানাজোড়া হাতে গলিয়ে নিয়ে মঁ্যসিয় ফের বললেন, 'ইভ এসবে ক্লান্ত হয়ে উঠবে। ক্লান্ত হবে না, তা আমি বলছি না—কিন্তু ধরো তার আগে ও নিজেই যদি পাগল হয়ে যায়? আমার মনে হয়, ও একটু-আধটু বাইরে বেরুলে ভালো করবে। বাইরে বেরুক, লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করুক: তাহলে হয়তো কোনো মার্জিত যুবকের সঙ্গে ওর আলাপ-পরিচয় হয়ে যাবে…ধরো, স্কদের মতো কোনো যুবক…কোনো এঞ্জিনিয়র…যার একটা ভবিষ্যৎ আছে—তার সঙ্গে ও এখানে-সেখানে এক-আধটু দেখাসাক্ষাৎ করতে পারে এবং তাহলেই ও নিজের জন্যে একটা নতুন জীবন তৈরি করার চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।'

আলোচনাটা ফের শুরু হবার আশঙ্কায় মাদাম দাবেদা কোনো জবাব দিলেন না। ওঁর স্বামী ওঁর সামনে ঝুঁকে দাঁড়ালেন, 'তাহলে এবারে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে।'

'বিদায় বাপি,' স্বামীর দিকে নিজের ললাটখানা তুলে ধরলেন মাদাম। 'আমার হয়ে তুমি ওকে একটা চুমু দিও আর বোলো, আমার কাছে ও একটা লক্ষ্মী সোনা!'

স্বামী চলে যেতেই মাদাম দাবেদা ক্লান্ত হয়ে আরাম-কুর্সির গভীরে শরীরটাকে তলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলেন। 'ওহ্ কি প্রাণশক্তি,' বিরক্ত হয়ে ভাবলেন উনি। তারপর দেহে সামান্য একটু শক্তি ফিরে পেতেই ধীরেসুস্থে একখানা ফ্যাকাশে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং চোখ না খুলেই অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে পিরিচ থেকে একটা মিঠাই তুলে নিলেন।

রু দ্যু বাকে একটা পুরনো বাড়ির সাত তলায় স্বামীর সঙ্গে বাস করে ইভ। ধীরেসুস্থে সিঁড়ির একশো বারোটা ধাপ ভেঙে ওপরে উঠলেন মঁ্যসিয় দাবেদা। ঘণ্টি বাজবার বোতামটাতে যখন চাপ দিলেন, তখনও তাঁর দম ফুরোয়নি। 'সত্যি চার্লস, তোমার যা বয়েস তার তুলনায় তুমি স্রেফ দারুণ,' পরিতুষ্ট মনে মাদমোয়াজেল দরমের কথাগুলো মনে করলেন তিনি। বৃহস্পতিবারের মতো নিজেকে তাঁর এতো বলিষ্ঠ আর এতো স্বাস্থ্যবান আর কখনও মনে হয় না, বিশেষ করে এই বলপ্রদ সিঁড়ি ভাঙার পর।

ইভ দরজাটা খুললো: হ্যাঁ, ঠিক তাই—কারণ ওর কোনো পরিচারিকা নেই।

কোনো মেয়েই ওর কাছে থাকতে পারে না। আমি নিজেকে তাদের জায়গায় রেখে বুঝতে পারি। ওকে চুমু দিলেন তিনি, 'কেমন আছো, বাছা ?'

এক ধরনের হিমতা নিয়ে ইভ তাঁকে সম্ভাষণ জানালো।

'তোমাকে একটু ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে,' ওর গাল স্পর্শ করে ম্যঁসিয় বললেন। 'তোমার যথেষ্ট শারীরিক ব্যায়াম হয় না।'

তারপর এক মুহূর্তের নীরবতা।

'মা ভালো আছে ?' জিগেস করলো ইভ।

'ভালো নয়, খুব খারাপও নয়। মঙ্গলবার ওর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিলো তো ? সেই একই রকম আছে। গতকাল তোমার লুই কাকী ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো, তাতে ও খুব খুশী হয়েছে। আসলে ও চায়, সবাই ওর সঙ্গে দেখা করতে আসুক—কিন্তু কেউই তো খুব বেশিক্ষণ থাকতে পারে না! লুই কাকী সেই বন্ধকির ব্যাপারটার জন্যে পারীতে এসেছিলো। ব্যাপারটা আমি বোধ-হয় তোমাকে বলেছিলাম, ভারি অদ্ভুত ঘটনা। আমার পরামর্শ নিতে ও পথে আমার অফিসে এসে হাজির হয়। আমি ওকে বলেছিলাম যে করার মতো একটা কাজই আছে: বিক্কিরি করে দেওয়া। ও হ্যাঁ, ও একজন খদ্দেরও পেয়েছে: ব্রেতনে। তাকে তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই ? সে এখন ব্যবসা থেকে অবসর নিয়েছে।'

বলতে বলতে আচমকা থেমে গেলেন ম্যঁসিয় দাবেদা: ইভ প্রায় কিছুই শোনেনি। দুঃখিত হয়ে উনি ভাবলেন, আজকাল আর কোনো কিছুই ওর মনে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারে না। যেমন বই। আগে ওর কাছ থেকে বই কেড়ে নিতে হতো। এখন ও আর কিছু পড়েও না।

'পিয়ের কেমন আছে ?'

'ভালো,' ইভ বললো। 'তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাও ?'

'অবশ্যই,' ম্যঁসিয় উচ্ছল স্বরে বললেন।

ওই হতভাগা যুবকটির সম্পর্কে তাঁর মন সহানুভূতিতে ভরা, কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলেই তাঁর মনটা বিমুখ-বিরক্তিতে ভরে ওঠে। 'স্বাস্থ্যহীন রুগ্ন মানুষদের আমি অপছন্দ করি।' ত্রুটিটা অবশ্যই পিয়েরের নয়। কিন্তু এই ত্রুটিটাকে সে চিরদিন নিজের মধ্যে বহন করেছে: সেটা তার চরিত্রের বুনিয়াদ গড়ে তুলেছে: সেটা ক্যানসার বা ক্ষয়রোগের মতো নয়—মানুষকে বিচার করতে চাইলে যেগুলোকে সহজেই এক পাশে সরিয়ে রাখা যেতে পারে। তার বিচলিত মাধুর্য, এই দুর্বোধ্যতা—প্রাগ-বিবাহ মেলামেশার সময় যেগুলো ইভকে অতোটা

মুগ্ধ করেছিলো—তা আসলে উন্মত্ততার কুসুম। ইভকে যখন সে বিয়ে করে তখনই সে পাগল ছিলো, তবে সেটা বোঝা যায়নি।

'দায়িত্ব যে কোথায় শুরু হয় আর কোথায় যে তার শেষ, ভেবে পাইনে,' ম্যঁসিয় ভাবলেন। তবে যাই হোক না কেন, পিয়ের চিরদিনই নিজেকে বড্ড বেশি বিশ্লেষণ করতো, সর্বদা নিজের গভীরে ডুবে থাকতো। কিন্তু সেটা কি তার অসুস্থতার কারণ, না কি ফল? একটা দীর্ঘ স্বল্পালোকিত বারান্দা ধরে মেয়েকে অনুসরণ করতে করতে ম্যঁসিয় বললেন, 'এই অ্যাপার্টমেণ্টটা তোমাদের পক্ষে বড্ড বড়ো। এখান থেকে তোমাদের অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত।'

'প্রতিবারই তুমি এটা বলো, বাপি।' ইভ জবাব দিলো, 'কিন্তু আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি যে পিয়ের তার ঘরটাকে ছাড়তে চায় না।'

ইভ ভারি অদ্ভুত। এতো অদ্ভুত যে সন্দেহ হয়, ওর স্বামীর প্রকৃত অবস্থাটা ও বুঝতে পারছে কি না। পিয়েরের উন্মত্ততা এখন তাকে স্ট্রেইটজ্যাকেটে ঢুকিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট, অথচ ইভ এখনও তার সিদ্ধান্ত এবং পরামর্শগুলোকে সম্মান দিয়ে চলে—যেন সে স্বাভাবিকই আছে।

'আমি যা বলছি তা তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।' খানিকটা বিরক্ত হয়ে ম্যঁসিয় দাবেদা বলতে লাগলেন, 'আমার তো মনে হচ্ছে, আমি যদি মহিলা হতাম তাহলে এই মিটমিটে আলোয় ভরা পুরনো ঘরগুলো আমাকে আতঙ্কিত করে তুলতো। আমি তোমাকে একটা ঝলমলে ফ্ল্যাটে দেখতে চাই—অত্‌উইলের কাছাকাছি ওই ফ্ল্যাটগুলোর মতো—আলো-বাতাস ভরা ছোটো ছোটো তিনটে ঘর। ভাড়াটে পাচ্ছে না বলে ওগুলোর ভাড়াও ওরা কমিয়ে দিয়েছে। এখনই সঠিক সময়।'

ইভ নিঃশব্দে দরজার হাতল ঘোরালো, ঘরে গিয়ে ঢুকলো দুজনে। ধূপের চড়া গন্ধে ম্যঁসিয় দাবেদার গলা বন্ধ হয়ে এলো। ঘরের পর্দাগুলো টানা। ছায়ার মধ্যেও একটা আরাম-কুর্সির পিঠের ওপরে সরু একটা ঘাড় দেখতে পেলেন ম্যঁসিয়। পিয়ের পেছন ফিরে বসে রয়েছে। খাচ্ছে।

'কি হে, পিয়ের!' কণ্ঠস্বর চড়িয়ে ম্যঁসিয় দাবেদা প্রশ্ন করলেন, 'আজ কেমন আছি আমরা?' পিয়েরের কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। ছোট্ট একটা টেবিলের সামনে বসে রয়েছে অসুস্থ মানুষটা। ধূর্ত দেখাচ্ছে ওকে।

'ও, আজ আমরা দেখছি নরম করে সিদ্ধ করা ডিম খেয়েছি।' কণ্ঠস্বর সামান্য উঁচু করলেন ম্যঁসিয়, 'বাঃ বেশ!'

'আমি কালা নই,' পিয়ের শান্ত গলায় বললো।

বিরক্ত হয়ে মঁ্যসিয় দাবেদা সাক্ষী মানার জন্যে চোখ ফিরিয়ে ইভের দিকে তাকালেন। কিন্তু ইভ কঠিন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালো এবং নিশ্চুপ হয়ে রইলো। মঁ্যসিয় বুঝতে পারলেন, তিনি মেয়েকে আঘাত দিয়েছেন। এটা ইভের খুব অন্যায়। কারণ এই ছেলেটির পক্ষে উপযুক্ত সঠিক স্বরভঙ্গি খুঁজে বের করা একেবারে অসম্ভব। ওর বোধশক্তি একটা চার বছরের শিশুর চাইতেও কম, অথচ ইভ চায় ওর সঙ্গে একটা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মতো ব্যবহার। মঁ্যসিয় অধৈর্য হয়ে সেই মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন, যখন এই হাস্যকর কাণ্ড-কারখানাটির সমাপ্তি ঘটবে। অসুস্থ মানুষ চিরদিনই তাঁকে সামান্য বিরক্ত করে তোলে—বিশেষ করে উন্মাদরা, কারণ তারা ভ্রান্ত। যেমন পিয়ের। বেচারার সবটাই ভুলে ভরা, যুক্তিপূর্ণ একটি কথাও সে বলতে পারে না—অথচ তার দিক থেকে সামান্যতম নম্রতা কিংবা কালেভদ্রে নিজের ত্রুটি স্বীকারের আশা করাও নিরর্থক।

টেবিল থেকে ডিমের খোসা আর পেয়ালাটা সরিয়ে পিয়েরের সামনে একটা ছুরি আর কাঁটা-চামচ রাখলো ইভ।

'এখন ও কি খাবে?' উচ্ছল স্বরে জিগেস করলেন মঁ্যসিয়।

'এক টুকরো মাংস।'

ততোক্ষণে পিয়ের নিজের দীর্ঘ, পাংশুল আঙুলগুলোর প্রান্তে কাঁটা-চামচটাকে তুলে ধরেছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিনিসটাকে লক্ষ্য করলো সে, তারপর সামান্য একটু হাসলো।

'এবারে ওরা আমাকে কায়দা করতে পারবে না,' অস্ফুট উক্তি করে কাঁটাটাকে নামিয়ে রাখলো সে। 'আমি আগেই সাবধানী-সংকেত পেয়ে গেছি।'

ইভ কাছে এসে এক নিবিড় আবেগময় আগ্রহ নিয়ে কাঁটা-চামচটার দিকে তাকালো।

'আগাথা,' পিয়ের বললো, 'আমাকে অন্য একটা দাও।'

ইভ তার আদেশ পালন করলো এবং পিয়েরও খেতে শুরু করলো। ইতিমধ্যে ইভ সেই সন্দেহজনক কাঁটাটাকে তুলে নিয়ে শক্ত মুঠোয় সেটাকে ধরে রেখেছে, মুহূর্তের জন্যেও সেটার দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না। মনে হচ্ছিলো, ও যেন একটা প্রচণ্ড প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওদের ভাবভঙ্গি, পারস্পরিক আচরণ—সমস্ত কিছুই কি সাংঘাতিক সন্দেহজনক! ভাবলেন মঁ্যসিয়। তিনি অস্বস্তি অনুভব করছিলেন।

'সাবধান,' পিয়ের বললো, 'নখ রয়েছে কিন্তু—ওটাকে মাঝখান দিয়ে ধরো।'

ইভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁটা-চামচটাকে পরিবেশনের টেবিলে রাখলো। ম্যঁসিয় দাবেদা অনুভব করলেন, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন। এই হতভাগ্য মানুষটার সমস্ত খামখেয়ালের কাছে আত্মসমর্পণ করাটাকে তিনি ভালো বলে মনে করেন না— এমন কি পিয়েরের দিক থেকেও সেটা মারাত্মক ক্ষতিকর। ফ্রাঁশ একদিন বলেছিলো: 'কক্ষণো পাগলের প্রলাপে কান দেওয়া উচিত নয়।' অন্য একটা কাঁটা না দিয়ে অনেক ভালো হতো শান্তভাবে যুক্তি দিয়ে পিয়েরকে বোঝানো যে প্রথম কাঁটাটা আসলে অন্যগুলোর মতোই নির্দোষ।

পরিবেশনের টেবিলের কাছে গিয়ে কৃত্রিম জাঁক দেখানোর ভঙ্গিতে কাঁটা-চামচটাকে তুলে নিলেন ম্যঁসিয় দাবেদা, আঙুলের আলতো ছোঁয়ায় পরীক্ষা করলেন কাঁটাগুলোকে, তারপর ঘুরে তাকালেন পিয়েরের দিকে। শেষোক্ত জন তখন শান্ত ভঙ্গিতে মাংসের টুকরোটাকে কাটছে: অমায়িক, অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টিতে একবার শ্বশ্রুপিতার দিকে তাকালো সে।

'তোমার সঙ্গে আমি ছোট্ট করে একটা আলোচনা করে নিতে চাই,' ইভকে বললেন ম্যঁসিয় দাবেদা।

বাধ্য মেয়ের মতো ইভ বাবাকে অনুসরণ করে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সোফায় বসে ম্যঁসিয় দাবেদা বুঝতে পারলেন, কাঁটা-চামচটাকে তিনি তখনও হাতে ধরে রেখেছেন। টেবিলের ওপরে সেটাকে ছুঁড়ে দিলেন উনি।

'এখানটা অনেক ভালো,' ম্যঁসিয় বললেন।

'আমি কক্ষণো এখানে আসি না।'

'ধূমপান করা যাবে তো?'

'অবশ্যই,' ইভ দ্রুত জবাব দিলো। 'একটা চুরুট নেবে?'

ম্যঁসিয় দাবেদা পাকানো সিগারেট বেশি পছন্দ করেন। অবিলম্বে শুরু করতে যাওয়া আলোচনাটার কথা আকুল ব্যগ্রতায় চিন্তা করে নিলেন তিনি। একটা শিশুর সঙ্গে খেলা করার সময় একটা দৈত্য যেমন নিজের শারীরিক শক্তি সম্পর্কে বিব্রত বোধ করে, পিয়েরের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে ম্যঁসিয়ও তেমনি নিজের যুক্তি সম্পর্কে কুণ্ঠা অনুভব করছিলেন। স্পষ্টতা, তীক্ষ্নতা, নির্ভুলতা—নিজের সমস্ত গুণগুলোই তাঁর বিরুদ্ধাচারী হয়ে উঠলো: 'স্বীকার করতেই হবে, বেচারী জানেত্তের সঙ্গে এটা অনেকটাই এক রকম।' মাদাম দাবেদা অবশ্যই পাগল নন, কিন্তু ওঁর ওই অসুস্থতা···ওটা ওঁকে কেমন যেন নির্বোধ করে দিয়েছে। অন্যদিকে ইভ ওর বাবার মতো···অকপট, যুক্তিপূর্ণ স্বভাব। ওর সঙ্গে কোনো আলোচনা করা আনন্দের বিষয়। 'সেই জন্যেই আমি চাই না ও নষ্ট হয়ে যাক।' ম্যঁসিয়

দাবেদা চোখ তুলে তাকালেন, ফের তিনি মেয়ের সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানা দেখতে চাইছিলেন। কিন্তু ওর এই মুখ ম্যঁসিয়কে হতাশ করে তুললো। একসময় যে মুখ অমন স্বচ্ছ আর যুক্তিসম্পন্ন ছিলো, এখন তা কেমন যেন মেঘলা আর অনচ্ছ। ইভ বরাবরই সুন্দরী। ম্যঁসিয় দাবেদা লক্ষ্য করলেন, প্রচণ্ড যত্ন নিয়ে—প্রায় জমকালোভাবেই—ও রূপচর্চা করেছে। চোখের পাতা দুটিকে ও নীল করে তুলেছে, মাস্কারা লাগিয়েছে দীর্ঘ অক্ষিপক্ষ্মগুলিতে। এই প্রচণ্ড এবং নিখুঁত রূপ-চর্চা ওর বাবার মনে একটা করুণ ছাপ ফেলে দিলো।

'রুজের নিচে তোমার রঙটা ফ্যাকাশে,' ম্যঁসিয় দাবেদা মেয়েকে বললেন। 'আমার আশঙ্কা, তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ছো। এখন তোমার সাজগোছেরও কতো ঘটা! অথচ এক সময় তুমি কত্তো বিচক্ষণ ছিলে!' ইভ কোনো জবাব দিলো না এবং একটি বিহ্বল মুহূর্ত ম্যঁসিয় একরাশ কালো চুলের নিচে ইভের ওই অপরূপ, শুকিয়ে ওঠা মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনে হলো, ইভকে কোনো বিয়োগান্ত নাটকের অভিনেত্রীর মতো দেখাচ্ছে। 'কার মতো দেখাচ্ছে, আমি তাও জানি। সেই মহিলাটি···ম্যুর দরেঞ্জে ফরাসী ভাষায় যে রুমানিয় মহিলাটি ফেদ্রের ভূমিকাটা করেছিলো—তার মতো।' এই বিসদৃশ মন্তব্যটার জন্যে অনুতাপ হলো তাঁর : 'আচমকা হয়ে গেছে! যাক গে, এই সমস্ত ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে ওকে জ্বালাতন না করাই ভালো।'

'কিছু মনে কোরো না,' স্মিত মুখে ম্যঁসিয় বললেন। 'তুমি তো জানো, আমি সেই পুরনো যুগের রুচিবাগীশ মানুষ। আজকাল মেয়েরা মুখে ওই যে সমস্ত ক্রিম আর রঙচঙ মাখে—ওগুলো আমি ঠিক পছন্দ করি না। কিন্তু আমারই ভুল। তোমাকে তোমার সময় অনুযায়ী বাঁচতে হবে।'

ইভ বাবার দিকে তাকিয়ে সৌজন্যের হাসি ছড়ালো। ম্যঁসিয় সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটা টান মেরে বলতে শুরু করলেন, 'শোনো বাছা, আমি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই—যেভাবে আগে আমরা দুটিতে কথা বলতাম। এসো, এখানে বসে লক্ষ্মী হয়ে আমার কথাগুলো শোনো। বুড়ো বাবার ওপরে তোমাকে আস্থা রাখতেই হবে।'

'আমি বরঞ্চ দাঁড়াই। বলো, তুমি কি বলতে চাও আমাকে।'

'আমি তোমাকে একটি মাত্র প্রশ্ন করবো,' ম্যঁসিয় দাবেদা আরও একটু শুকনো গলায় বললেন। 'এসব শেষ অব্দি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?'

'এসব বলতে?' ইভের প্রশ্নে বিস্ময়ের সুর।

'হ্যাঁ···এই পুরো জীবনটা, যা তুমি নিজের জন্যে গড়ে তুলেছো। শোনো, মনে

কোরো না যে আমি তোমাকে বুঝতে পারি না (আচমকাই উনি বুঝতে পেরেছিলেন)—কিন্তু তুমি যা করতে চাইছো তা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। তুমি শুধুমাত্র কল্পনা নিয়ে বেঁচে থাকতে চাও, তাই নয় কি ? তুমি স্বীকার করতে চাও না যে মানুষটা অসুস্থ। তুমি আজকের পিয়েরকে দেখতে চাও না, তাই না ? তোমার চোখের সামনে শুধুমাত্র আগেকার সেই পিয়ের। কিন্তু মাগো, এ বাজিতে জেতা যে একেবারে অসম্ভব !' ম্যঁসিয় বলতে লাগলেন, 'এবারে আমি তোমাকে একটা গল্প বলবো—গল্পটা হয়তো তুমি জানো না। আমরা যখন স্তবল-দলনে থাকতাম, তোমার বয়েস তখন তিন—তখন অল্পবয়সী একটি সুন্দরী মহিলার সঙ্গে তোমার মায়ের আলাপ হয়েছিলো। মহিলার একটি ছোট্ট ছেলে ছিলো, চমৎকার ছেলে। তুমি সমুদ্রের ধারে ওই বাচ্চা ছেলেটির সঙ্গে খেলা করতে, ঠিক করেছিলে তাকে বিয়ে করবে। কিছুদিন বাদে তোমার মা পারীতে ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনতে পায়, ওর জীবনে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। একটা গাড়ি সেই ছোট্ট ছেলেটির মাথাটাকে ধর থেকে আলাদা করে দিয়েছে। সবাই তোমার মাকে বললো, 'আপনি গিয়ে মহিলার সঙ্গে দেখা করুন, কিন্তু ওঁর বাচ্চার মৃত্যু-সম্পর্কে ওঁর কাছে একটি কথাও বলবেন না—কারণ উনি বিশ্বাসই করবেন না যে ওঁর ছেলে মারা গেছে'। তোমার মা গিয়ে একটি অর্ধ-উন্মাদ জীবকে দেখতে পায় : মহিলার বিশ্বাস ওঁর ছেলে তখনও জীবিত…উনি তার সঙ্গে কথা বলেন, টেবিলে তার জন্যে খাওয়ার জায়গা সাজান। তখন উনি এমন এক চাপা উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে বাস করছিলেন যে ছ মাস পরে ওঁকে জোর করে একটা স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠিয়ে দিতে হয় এবং সেখানে উনি তিনটে বছর কাটিয়ে আসেন। না বাছা,' ম্যঁসিয় দাবেদা মাথা নাড়লেন, 'এ সমস্ত জিনিস একেবারে অসম্ভব। ওই ভদ্রমহিলা যদি সাহস করে প্রকৃত সত্যকে মেনে নিতে পারতেন, তাহলে সেটা ওঁর পক্ষে অনেক বেশি ভালো হতো। তাহলে উনি একবারই কষ্ট পেতেন, তারপর সময় ওঁর সেই অতীতটাকে মুছে দিতো। বিশ্বাস করো, সরাসরি সমস্ত কিছুর মুখোমুখি হওয়াটাই সব চাইতে ভালো।'

'তুমি ভুল করছো,' সচেষ্ট প্রয়াসে ইভ বললো। 'আমি ভালো করেই জানি যে পিয়ের…'

শব্দটা ওর মুখ থেকে বেরুলো না। শরীরটাকে ভীষণ ঋজু করে আরাম-কুর্সির পিঠে হাত রাখলো ইভ। ওর মুখের নিচের দিকটাতে শুকিয়ে যাওয়া একটা কুৎসিত দাগ।

'তাহলে…?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন ম্যঁসিয়।

'তাহলে…কি ?'

'তুমি…?'

'ও যেমনটি আছে, আমি সেইমতোই ওকে ভালোবাসি,' উত্তেজিত দৃষ্টি নিয়ে দ্রুত জবাব দিলো ইভ।

'কথাটা সত্যি নয়,' মঁ্যসিয় দাবেদা জোর গলায় বললেন। 'তুমি ওকে ভালোবাসো না, বাসতে পারো না। শুধুমাত্র একটা স্বাস্থ্যবান স্বাভাবিক মানুষ সম্পর্কেই তোমার মনে তেমন অনুভূতি জাগতে পারে। তুমি পিয়েরকে করুণা করো, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তিনটে বছর যে সুখ সে তোমাকে দিয়েছিলো তার স্মৃতি নিশ্চয়ই তোমার মনে রয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে আমাকে বলতে এসো না যে তুমি ওকে ভালোবাসো। আমি তা বিশ্বাস করবো না।'

ইভ নিশ্চুপ হয়ে রইলো, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলো গালচের দিকে।

'অন্তত আমার কথার জবাবটা তো তুমি দিতে পারো!' শীতল কণ্ঠে মঁ্যসিয় বললেন। 'মনে কোরো না যে এই আলোচনাটা তোমার পক্ষে যতোটা যন্ত্রণাদায়ক, আমার কাছে তার চাইতে কম কিছু।'

'তুমি যতোটা মনে করছো, তার চাইতে বেশি।'

'তাহলে শোনো,' প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে মঁ্যসিয় দাবেদা গলা চড়ালেন, 'তুমি যদি এখনও ওকে ভালোবেসে থাকো তাহলে সেটা আমার পক্ষে, তোমার পক্ষে এবং তোমার হতভাগিনী মায়ের পক্ষে গভীর দুর্ভাগ্যের বিষয়। কারণ এবারে আমি তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি, সেটা হয়তো তোমার কাছে লুকিয়ে রাখলেই ভালো হতো। আর তিনটে বছর কাটার আগেই পিয়ের সম্পূর্ণ চিত্তভ্রংশতায় ডুবে যাবে, সে একটা পশুর মতো হয়ে উঠবে।'

কঠোর দৃষ্টিতে মেয়েকে লক্ষ্য করতে লাগলেন মঁ্যসিয়। ওর ওপরে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, কারণ ওর একগুঁয়েমির জন্যেই তাঁকে বাধ্য হয়ে এই মর্মান্তিক সত্যটা প্রকাশ করে দিতে হয়েছে।

ইভ তখনও অনড়, এমন কি নিজের চোখ দুটোও ও তুলে তাকালো না।

'আমি জানতাম।'

'কে বলেছে তোমাকে ?' মঁ্যসিয় বিহ্বল হয়ে উঠলেন।

'ফ্রাঁশ। ছ মাস আগেই জেনেছি।'

'অথচ তোমার সম্পর্কে আমি তাকে সতর্ক থাকতে বলেছিলাম,' মঁ্যসিয় দাবেদার কণ্ঠস্বরে তিক্ততার স্বর ফুটে উঠলো। 'হয়তো এটাই ভালো হয়েছে। তবে তেমন পরিস্থিতিতে পিয়েরকে তোমার সঙ্গে রাখাটা অমার্জনীয় অপরাধ হবে,

এটা তোমার অবশ্যই বোঝা উচিত। যে সংগ্রামকে তুমি বরণ করে নিয়েছো তা বিফল হতে বাধ্য। ওর অসুস্থতা ওকে কিছুতেই রেহাই দেবে না। যদি কিছু করার থাকতো, যদি যত্ন দিয়ে ওকে রক্ষা করা যেতো—তাহলে আমি এতে সায় দিতাম। কিন্তু ভেবে দ্যাখো : তুমি সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, প্রাণচঞ্চল—তুমি স্বেচ্ছায় এবং বিনা কারণে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলছো। আমি জানি তুমি যা করেছো তা প্রশংসনীয়…কিন্তু এখন সব শেষ হয়ে গেছে। তোমার যা কর্তব্য, তুমি তার চাইতে অনেক বেশি করেছো। এর পরেও এসব চালিয়ে যাওয়াটা অনৈতিক কাজ হবে। নিজেদের প্রতিও আমাদের কর্তব্য আছে, বাছা! তাছাড়া তুমি আমাদের দিকটা চিন্তা করছো না।' প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে দিয়ে মঁ্যসিয় বললেন, 'পিয়েরকে তুমি ক্রঁাশর আরোগ্যশালায় পাঠিয়ে দাও। তারপর এই অ্যাপার্টমেণ্টটা—এখানে তুমি দুঃখ ছাড়া আর কিছুই পাওনি—এটাকে ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে, আমাদের কাছে চলে এসো। তুমি যদি নিজেকে কাজে লাগাতে চাও, অন্য কারুর জ্বালা-যন্ত্রণা লাঘব করতে চাও—তাহলে তোমার মা রয়েছেন। বেচারীকে নার্সরা সেবা শুশ্রূষা করে, কিন্তু ওঁর দরকার কোনো ঘনিষ্ঠজনকে।'

এক দীর্ঘ নীরবতা। মঁ্যসিয় শুনতে পেলেন, পাশের ঘরে পিয়ের গান গাইছে। গান না বলে বরঞ্চ বলা যায়, তীক্ষ্ণ গলায় এক ধরনের দ্রুত আবৃত্তি। মঁ্যসিয় দাবেদা চোখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালেন।

'তাহলে কি, না?'

'পিয়ের আমার 'সঙ্গেই থাকবে,' ইভ শান্ত গলায় বললো। 'আমি ওর সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে থাকি।'

'সারা দিন ধরে জন্তুর মতো জীবন যাপন করে?'

ইভ মৃদু হেসে চকিতে বাবার দিকে এক ঝলক তাকালো। বিচিত্র, বিদ্রূপময়, প্রায় চপল দৃষ্টি। 'তাহলে কথাটা সত্যি,' ক্রোধে উন্মাদ হয়ে মঁ্যসিয় দাবেদা ভাবলেন : 'শুধু একসঙ্গে থাকা নয়, ওরা একসঙ্গেই শোয়!'

'তুমি সম্পূর্ণ উন্মাদ,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে উনি বললেন।

ইভ বিষণ্ন হেসে অস্ফুটে যেন নিজেকেই বললো, 'অতোটা নই।'

'অতোটা নও? আমি তোমাকে শুধু একটি কথাই বলতে পারি, বাছা। তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছো।'

দ্রুত ওকে চুমু দিয়ে বেরিয়ে গেলেন মঁ্যসিয়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবলেন, 'আমাদের উচিত, দুটো বলিষ্ঠ মানুষকে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া। তারা

কোনো মতামত জিগেস না করে ওই জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে, ধারাযন্ত্রে জলের নিচে ঠেসে রেখে দেবে।'

শরতের শান্ত, সুন্দর, রহস্যহীন দিন। পথচারীদের মুখগুলোতে সোনা-রোদের ঝলকানি। মুখগুলোর সরলতায় মুগ্ধ হলেন ম'ঁ্যসিয় দাবেদা। কিছু কিছু মুখ রোদ-বৃষ্টি-বাতাসে নিপীড়িত, অন্যগুলো মসৃণ—কিন্তু সবগুলোতেই তাবৎ সুখ আর উদ্বেগের স্পষ্ট প্রতিফলন, যা তাঁর কাছে এতো পরিচিত।

'ইভের কোন্ জিনিসটা আমার অপছন্দ, আমি তা সঠিকভাবেই জানি।' বুলেভা সাঁ জারমেঁতে ঢুকতে ঢুকতে ম'ঁ্যসিয় দাবেদা নিজের মনে বললেন, 'মানুষের স্বাভাবিক সদ্‌গুণাবলীর সীমার বাইরে ওর জীবনযাত্রা—সেটাই আমার অপছন্দ। পিয়ের এখন আর মানুষ নেই। ইভ তাকে যতোটা আদর-যত্ন আর ভালোবাসা দেয়, তা মানবজাতিকে সামান্য একটু বঞ্চিত করেই দেয়। পৃথিবীর কাছে নিজেদের পরিত্যক্ত করে তোলার কোনো অধিকার আমাদের নেই। আর যাই হোক, আমরা সমাজে বাস করি।'

সহানুভূতি সহকারে পথচারীদের মুখগুলো লক্ষ্য করছিলেন ম'ঁ্যসিয় দাবেদা। মুখগুলোর স্বচ্ছ সুগম্ভীর অভিব্যক্তি ভালো লাগছিলো তাঁর। এই রোদ-ঝলমলে রাস্তাঘাটে জনারণ্যের মধ্যে নিজেকে ভারি নিরাপদ বলে মনে হয়—একটা বড়ো সংসারে থাকলে যেমনটি হয়, ঠিক তেমনি।

একটা মুক্তাঙ্গন দোকানের সামনে একটি মহিলা আচমকা থমকে দাঁড়ালেন। একটি বাচ্চা মেয়ের হাত ধরে রেখেছেন মহিলা।

'ওটা কি ?' একটা রেডিওর দিকে আঙুল তুলে জিগেস করলো ছোট্ট মেয়েটি।

'হাত দিও না,' ওর মা বললেন, 'ওটা একটা রেডিও। ওতে গান বাজে।'

এক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে আবিষ্টের মতো দাঁড়িয়ে রইলো দুটিতে। দৃশ্যটা ম'ঁ্যসিয় দাবেদার মর্ম স্পর্শ করলো। ছোট্ট মেয়েটির কাছে গিয়ে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসলেন তিনি।

'চলে গেছে।' একটা শুকনো, তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে যায় দরজাটা। বৈঠকখানা ঘরে একা ইভ। 'ও মরে গেলেই ভালো হয়।'

দু হাতে আরাম-কুর্সির পিঠটা আঁকড়ে ধরে ইভ। বাবার চোখ দুটোকে মনে পড়ে ওর। সক্ষম মানুষের মাতব্বরি ভঙ্গিতে পিয়েরের সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ম'ঁ্যসিয় দাবেদা বলেছিলেন, 'বাঃ বেশ!' যেভাবে মানুষ কোনো অক্ষম পঙ্গুর সঙ্গে কথা বলে। উনি তাকিয়েছিলেন আর ওঁর তীক্ষ্ণ বিস্ফারিত চোখ দুটোর গভীরে

তখন পিয়েরের মুখখানা আঁকা হয়ে গিয়েছিলো। 'বাবা যখন ওর দিকে তাকায়, যখন আমার মনে হয় বাবা ওকে দেখছে—তখন বাবাকে আমার বিচ্ছিরি লাগে।'

ইভের হাত আরম-কুর্সির গা বেয়ে নিচে নেমে আসতে থাকে, জানলাটার দিকে ফিরে তাকায় ও। চোখে ধাঁধা লাগে। সারাটা ঘর সূর্যের আলোয় ভরে গেছে—গালচেতে ছড়িয়ে আছে হালকা প্রলেপের মতো, বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে যেন ঝিলমিলে স্বর্ণরেণু। চতুর্দিক থেকে আলো ছুটে আসছে, উজ্জ্বল করে তুলছে ঘরের প্রতিটি কোণ, যেন ব্যস্ত গৃহকর্ত্রীর মতো ঘষে মুছে ঝকঝকে করে তুলছে প্রতিটা আসবাব। এমন তৎপর, বেহিসেবী আলোয় অভ্যস্ত নয় ইভ। তবু জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে শার্শির গায়ে ঝুলতে থাকা মসলিনের পর্দাটাকে তুলে ধরে ও। ঠিক সেই মুহূর্তেই মঁ্যসিয় দাবেদা বাড়িটা থেকে বেরিয়ে গেলেন, আচমকা ইভ তাঁর চওড়া কাঁধ দুটিকে দেখতে পেলো। মঁ্যসিয় দাবেদা মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালেন, কয়েকবার চোখ পিটপিট করলেন, তারপর হেঁটে চলে গেলেন একজন যুবকের মতো দীর্ঘ পদক্ষেপে। 'বাবা জোর করে নিজেকে চাপ দিচ্ছে,' ইভ ভাবলো, 'একটু বাদেই পাঁজরে খিল ধরবে।' এখন বাবার সম্পর্কে ওর সেই প্রতিকূল মনোভাবটা নেই। আসলে ওই মাথাটাতে বস্তু আছে সামান্যই। শুধু নিজেকে যুবক দেখাচ্ছে কি না, সে বিষয়ে সামান্য একটু উদ্বেগ। কিন্তু ব্যুলেভা সাঁ জারমেঁর মোড় ঘুরে মানুষটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই ক্রোধ ফের ইভকে অধিকার করে নেয়। 'বাবা এখন পিয়েরের কথা ভাবছে।' ওদের জীবনের ছোট্ট একটুখানি অংশ ওই বন্ধ ঘরটা থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছে এবং এখন তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে উন্মুক্ত রাস্তা দিয়ে, রোদের মধ্যে, লোকজনের মাঝখানে। 'ওরা কি কিছুতেই আমাদের কথা ভুলে যেতে পারে না?'

র‍্যু দ্যু বাক প্রায় জনশূন্য। এক বৃদ্ধা কায়দা দেখানো ঢঙে রাস্তাটা পার হলেন। তিনটি মেয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলো। কয়েকজন পুরুষমানুষ চলে গেলো নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে—বলিষ্ঠ চেহারা, গম্ভীর মুখ, হাতে ব্রিফকেস। 'স্বাভাবিক মানুষ', ভাবলো ইভ এবং নিজের মনের গভীরে এমন একটা নিদারুণ ঘৃণার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে অবাক হলো ও। একটি মোটাসোটা সুন্দরী মহিলা ভারি পদক্ষেপে এক সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোকের দিকে ছুটে গেলেন। ভদ্রলোক দু হাতে জড়িয়ে ধরে মহিলার ঠোঁটে চুমু খেলেন। এক টুকরো নির্মম হাসি ফুটিয়ে পর্দাটা ফেলে দিলো ইভ।

পিয়ের এখন আর গান গাইছে না, তবে পাঁচ তলার মহিলাটি পিয়ানো বাজাচ্ছেন। শঁপার এতুদ। নিজেকে অনেকটা শান্ত বলে মনে হয় ইভের।

পয়েরের ঘরের দিকে এক পা এগোয় ও, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গিয়ে এক নিদারুণ উৎকণ্ঠায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। যতোবার ও ওই ঘরটা থেকে বেরোয়, ততোবারই ফের ওখানে গিয়ে ঢোকার চিন্তাটা ওকে আতঙ্কিত করে তোলে। অথচ ও জানে, অন্য কোথাও গিয়ে ও থাকতে পারবে না। ওই ঘরটাকে ও ভালোবাসে। যেন সামান্য একটুখানি সময় অর্জন করে নেবার তাগিদেই এক হিম-কৌতুহল নিয়ে ইভ চতুর্দিকে তাকায়—নিজের সাহসটা ফিরে আসবে বলে অপেক্ষা করতে থাকে এই ছায়াহীন নির্যাসহীন ঘরটাতে। 'মনে হয় যেন কোনো দাঁতের ডাক্তারের প্রতীক্ষা-কক্ষ।' গোলাপী রঙের রেশমী আরাম-কুর্সি, ডিভান—সবই কেমন যেন বিষণ্ণ আর সতর্ক—খানিকটা পিতৃসুলভ। মানুষের সব চাইতে সেরা বন্ধু। হালকা রঙের স্যুট পরা সেই সুগম্ভীর মানুষগুলোর কথা চিন্তা করে ইভ। জানলা থেকে ও যাদের দেখেছিলো, তারাই যেন তেমনি কথাবার্তা বলতে বলতে ঘরে এসে ঢোকে। প্রাথমিকভাবে একবার তাকিয়ে দেখার সময়টুকু পর্যন্ত না নিয়ে ওরা দৃঢ় পদক্ষেপে ঘরের মাঝামাঝি জায়গাটার দিকে এগিয়ে যায়। ওদের মধ্যে একজন নিজের একটা হাত পেছন দিকে ছড়িয়ে রেখেছে ধাবমান জাহাজের পেছনে জেগে ওঠা ফেনিল জলরাশির মতো, সেই হাতের সঙ্গে ধাক্কা লাগছে সোফার গদি আর টেবিলে রাখা জিনিসপত্রগুলোর, অথচ তাতে কোনো ভাবান্তর হচ্ছে না মানুষটার। এগুবার পথে কোনো আসবাবপত্র পড়লে ওই সুস্থির মানুষগুলো সেগুলোকে এড়াবার জন্যে ঘুরপথে না গিয়ে, আসবাবগুলোকেই সরিয়ে রাখছে অন্যত্র। শেষ অব্দি লোকগুলো বসে পড়ে, তখনও তারা নিজেদের আলোচনায় মগ্ন, একবার পেছনে ফিরে তাকায় না পর্যন্ত। 'স্বাভাবিক-মানুষের বৈঠকখানা ঘর', ইভ ভাবে। বন্ধ দরজার হাতলটার দিকে তাকিয়ে এক প্রবল উৎকণ্ঠায় নিজের গলাটা চেপে ধরে ও: 'আমাকে ফিরে যেতে হবেই। আমি কোনোদিনও ওকে এতোক্ষণ একা রাখিনি।' এখন ওকে দরজাটা খুলতে হবে, তারপর ভেতরের ছায়ার সঙ্গে চোখ দুটোকে ধাতস্থ করে নেবার চেষ্টায় এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে দোরগোড়ায়—আর ঘরটা তখন সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে পেছন দিকে ঠেলে দেবে। এই প্রতিরোধকে জয় করে সোজা ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকতে হবে ইভকে। হঠাৎ পিয়েরকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করলো ওর। কিন্তু ওকে পিয়েরের কোনো প্রয়োজন নেই। ওর জন্যে পিয়েরের মনে সঞ্চিত সাদর অভ্যর্থনা ও অনুভব করতে পারে না। আচমকা এক ধরনের গর্বিত ভাবনায় ওর মনে হয়, আসলে কোথাও ওর কোনো জায়গা নেই। 'স্বাভাবিক মানুষেরা মনে করে, আমি তাদের একজন। কিন্তু আমি একটা ঘণ্টাও তাদের সঙ্গে থাকতে

পারি না। আমার থাকার প্রয়োজন ওখানে…দেয়ালটার ওধারে। কিন্তু ওরা আমাকে সেখানে যেতে দিতে চায় না।'

ইভের চতুর্দিকে একটা নিগূঢ় পরিবর্তন ঘটছিলো। ইতিমধ্যে আলোটা বয়স্ক ও ধূসর হয়ে উঠেছে: ঘন হয়েছে—ঠিক একদিন না বদলানো ফুলদানির জলের মতো। এই জীর্ণ আলোয় ইভ বহুদিন আগে ভুলে যাওয়া এক বিষণ্ণতাকে খুঁজে পেল: ফুরিয়ে যেতে থাকা এক শারদ অপরাহ্নের বিষণ্ণতা। দ্বিধাগ্রস্ত, প্রায় ভীরু ভঙ্গিমায় চতুর্দিকে তাকালো ও: সমস্ত কিছুই তো কতো দূরের ছিলো: অথচ এখন এ ঘরে দিন নেই রাতও নেই, ঋতু নেই বিষাদও নেই। দূর অতীতের শরৎকালগুলোর কথা আবছা আবছা মনে পড়লো ওর, মনে পড়লো ওর শৈশবের শরৎকালগুলোর কথা এবং তারপরেই আচমকা আড়ষ্ট হয়ে উঠলো ও: স্মৃতিকে ও ভয় পায়।

পিয়েরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো ইভ, 'আগাথা! তুমি কোথায়?'

'আসছি!' চিৎকার করে জবাব দিলো ইভ।

দরজা খুলে ঘরে গিয়ে ঢুকলো ও।

চোখ খুলতেই ধূপের ভারি নির্ঘাস ইভের মুখ ও নাসারন্ধ্রকে ভরিয়ে তুললো—দীর্ঘদিন ধরে সুগন্ধ আর ছায়া বলতে ও একটিমাত্র বস্তুকেই বোঝে—যা ঝাঁঝালো এবং ভারি, যা জল বাতাস বা আগুনের মতোই সাধারণ ও সুপরিচিত। ঘরের মধ্যে পিয়েরের মুখটা যেন কুয়াশায় ভাসমান একটা অস্পষ্ট ছায়া: তার পোশাক-পরিচ্ছদ (অসুস্থ হবার পর থেকে মানুষটা কালো পোশাক পরে) যেন গলে গেছে দুর্বোধ্য অস্পষ্টতায়। হাত দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ইভ বিচক্ষণের মতো এগুতে থাকে মানুষটার দিকে। মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে, চোখ দুটোকে বন্ধ করে রেখেছে পিয়ের। মানুষটা সুদর্শন। তার দীর্ঘ, বঙ্কিম অক্ষিপক্ষ্মগুলোর দিকে তাকায় ইভ। তারপর তার কাছাকাছি হয়ে নিচু কুর্সিটাতে গিয়ে বসে। 'মনে হচ্ছে ও কষ্ট পাচ্ছে,' চিন্তা করে ইভ। একটু একটু করে ওর চোখ দুটো ছায়ার আঁধারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। প্রথমে ফুটে ওঠে লেখার টেবিলটা, তারপর খাট, তারপর পিয়েরের ব্যক্তিগত জিনিসগুলো: কাঁচি, আঠার পাত্র, বই আর লতাপাতার সংগ্রহ—যেগুলো আরাম-কুর্সিটার কাছে গালচের ওপরে পাতা খসিয়ে ফেলে

'আগাথা?'

পিয়ের চোখ খুলেছে। লক্ষ্য করছে ইভকে। হাসছে মৃদু মৃদু।

'ওই কাঁটা-চামচের ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পেরেছো?' পিয়ের বলে, 'আসলে

ওই লোকটাকে ভয় খাওয়াবার জন্যেই আমি অমনটি করেছিলাম। কাঁটাটাতে কিন্তু বলতে গেলে তেমন কিছুই ছিলো না!'

ইভের আশঙ্কা দূর হয়ে যায়, হালকা করে একটু হাসে।

'তুমি সফল হয়েছো। তুমি ওঁর মাথাটা পুরো বিগড়ে দিয়েছিলে।'

'তুমি লক্ষ্য করেছিলে?' পিয়ের মৃদু হাসে, 'লোকটা অনেকক্ষণ কাঁটা-চামচটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে। একেবারে হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছিলো জিনিসটাকে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, জিনিসপত্র কিভাবে ধরতে হয় তা ওরা জানে না—সবই আঁকড়ে ধরে।'

'ঠিক বলেছো।'

'এটাকে দিয়ে ওরা ধরে,' ডান হাতের তর্জনি দিয়ে বাঁ হাতের তালুতে টোকা দেয় পিয়ের। 'প্রথমে আঙুলগুলোকে বাড়ায়। তারপর কোনো কিছুকে ধরার পর, সেটাকে টিপে মারার জন্যে সাপটে ধরে।'

দ্রুত এবং ঠোঁট দুটো প্রায় না নেড়েই কথা বলছিলো পিয়ের। বিহ্বল দেখাচ্ছিলো ওকে। 'জানি না ওরা কি চায়,' শেষ অব্দি ফের বলতে শুরু করে সে। 'ওই লোকটা আগেও এখানে এসেছে। ওরা কেন ওই লোকটাকে আমার কাছে পাঠায়? ওরা যদি জানতে চায় যে আমি কি করছি, তাহলে তো পর্দা থেকে সেটা পড়ে নিলেই পারে—তাহলে তো ওদের বাড়ি থেকে বেরুতেও হয় না! ওরা ভুল করে। ওদের ক্ষমতা আছে, কিন্তু ওরা ভুল করে। আমি কক্ষণো ভুল করি না, সেটাই আমার তুরুপের তাস। হফকা!' কপালের সামনে নিজের লম্বা হাত দুটোকে তুলে ঝাঁকুনি দেয় পিয়ের, 'কুত্তি কাঁহিকা! হফকা! পাফকা! সাফকা! আরও চাই তোমার?'

'ওটা কি ঘণ্টা বাজলো?' ইভ জিগেস করে।

'হ্যাঁ, বেজে গেছে।' পিয়ের কঠোর স্বরে বলতে থাকে, 'এই যে লোকটা, ও তো স্রেফ একটা নিচু-তলার কর্মচারী। তুমি ওকে চেনো, তুমি ওর সঙ্গে বৈঠকখানা ঘরে গিয়েছিলে।'

ইভ কোনো জবাব দেয় না।

'কি চায় লোকটা?' প্রশ্ন করে পিয়ের। 'ও নিশ্চয়ই তোমাকে তা বলেছে।'

এক মুহূর্তের জন্যে একটু ইতস্তত করে ইভ, তারপর নির্মম স্বরে বলে, 'উনি তোমাকে তালাচাবি দিয়ে আটকে রাখতে চান।'

প্রকৃত সত্যটা সংযতভাবে বলা হলে, পিয়ের তা অবিশ্বাস করে। ওকে বিমূঢ় করার জন্যে এবং ওর সন্দেহগুলোকে পঙ্গু করে তোলার জন্যে ওর সঙ্গে উগ্র

ব্যবহার করা প্রয়োজন। মিথ্যে কথা বলার চাইতে পিয়েরকে বরঞ্চ পশুর মতো মনে করাই শ্রেয় বলে বিবেচনা করে ইভ। ইভ যখন মিথ্যে বলে এবং পিয়ের এমন ভাব দেখায় যেন সে তা বিশ্বাস করেছে, তখন ইভ কিছুতেই যৎসামান্য উন্নাসিকতা অনুভব না করে পারে না—যা নিজের সম্পর্কে ওকে আতঙ্কিত করে তোলে।

'আমাকে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখবে!' বিদ্রূপের সুরে পুনরাবৃত্তি করে পিয়ের। 'ওরা ক্ষ্যাপা! আরে, দেয়াল আমার কি করবে? হয়তো ওরা মনে করে, দেয়াল আমাকে থামিয়ে দেবে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, সম্ভবত দুটো দল আছে। আসলটা, নিগ্রো—এবং অন্যটা হচ্ছে একগুচ্ছ নির্বোধ, যারা ক্রমাগত নাক গলাতে চেষ্টা করছে এবং ভুলের পর ভুল করে চলেছে।'

কুর্সির হাতল থেকে এক ঝটকায় হাতটা তুলে নিয়ে খুশি মনে হাতটার দিকে তাকায় পিয়ের। 'আমি দেয়ালের ভেতর দিয়ে গলে যেতে পারি।' রাজ্যের কৌতূহল নিয়ে ইভের দিকে ফিরে তাকায় সে, 'তুমি ওদের কি বলেছো?'

'তোমাকে বন্ধ করে না রাখতে।'

'তোমার তা বলা উচিত হয়নি,' দু কাঁধে ঝাঁকুনি তোলে পিয়ের। 'তুমিও একটা ভুল করে ফেললে!…অবশ্য যদি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বলে থাকো, তো সে কথা আলাদা।'

পিয়ের নিশ্চুপ হয়ে রইলো। বিষণ্ণভঙ্গিতে মাথা নিচু করলো ইভ: 'ওরা সবকিছু আঁকড়ে ধরে।…কি প্রচণ্ড ঘৃণায় কথাটা বলেছিলো পিয়ের! এবং কথাটা সে ঠিকই বলেছে। আমিও কি সবকিছু আঁকড়ে ধরি? নিজের দিকে লক্ষ্য রেখে কোনো লাভ হয় না। তবে আমার মনে হয়, আমার অধিকাংশ অঙ্গভঙ্গিই ওকে বিরক্ত করে তোলে। কিন্তু ও কিছু বলে না।'

আচমকা ভীষণ খারাপ লাগে ইভের—যেমনটি লেগেছিলো ওর চোদ্দ বছর বয়সে, যখন মাদাম দাবেদা ওকে বলেছিলেন, 'নিজের হাত দুটোকে নিয়ে তুমি কি করবে, বুঝে উঠতে পারো না।' ও নড়াচড়া করতে ভরসা পাচ্ছিলো না, অথচ একই সঙ্গে একটু নড়েচড়ে বসতে ভীষণ ইচ্ছে করছিলো ওর। নিঃশব্দে কুর্সির নিচে নিজের পা দুটোকে রাখলো ও, গালচেটা প্রায় না ছুঁয়ে। তারপর টেবিলে রাখা আলো আর দাবার ছকটার দিকে তাকালো। আলোর তলার দিকটাতে পিয়ের কালো রং লেপে রেখেছে, দাবার ছকটাতে রেখে দিয়েছে কালো রঙের বড়েগুলোকে। মাঝে মাঝে মানুষটা উঠে দাঁড়ায়, টেবিলের কাছে যায়, তারপর একটা একটা করে বড়েগুলোকে হাতে তুলে নেয়। পিয়ের ওদের সঙ্গে কথা বলে, ওদের 'যন্ত্রমানব' বলে ডাকে এবং ওরাও যেন এক অব্যক্ত জীবন নিয়ে তার আঙুল-

গুলোর তলায় নড়েচড়ে ওঠে। পিয়ের বোড়েগুলোকে রেখে দেবার পর, ইভের পালা আসে। ও তখন এগিয়ে গিয়ে গুঁটিগুলোকে স্পর্শ করে, অথচ সর্বদাই ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত বলে মনে হয় ওর। বোড়েগুলো তখন আবার ছোটো-ছোটো মৃত-কাষ্ঠখণ্ড হয়ে ওঠে, কিন্তু তবু ওদের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্পষ্ট অবোধ্য ব্যাপার রয়ে যায়—যা অনেকটা বোধশক্তির মতো। 'এগুলো ওর জিনিস, ইভের মনে হয়। 'এ ঘরে আমার নিজের বলতে কিছুই নেই।' আগে সামান্য কয়েকখানা আসবাব ছিলো : একটা আরশি আর ঠাকুমার কাছ থেকে পাওয়া একটা পোশাকের আলমারি, যেটাকে পিয়ের ঠাট্টা করে 'তোমার আলমারি' বলতো। পিয়ের সেগুলোকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছিলো : ওরা ওদের প্রকৃত রূপ শুধুমাত্র পিয়েরের কাছেই মেলে ধরতো। ইভ ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলেও ওরা অনমনীয় জেদে অটল হয়ে থাকতো : অনড় হয়ে থাকতো ইভের সঙ্গে ছলনা করার সঙ্কল্পে : বাইরের চেহারাটা ছাড়া ইভের কাছে ওরা আর কিছুই প্রকাশ করতো না—যেমনটি করতো ডাক্তার ফ্রাঁশ আর ম্যঁসিয় দাবেদার কাছে। 'তবু,' এক নিবিড় মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে ইভ নিজেকে বলে, 'বাবা যে দৃষ্টিতে ওদের ছ্যাখে, আমি ঠিক তেমন দৃষ্টিতে ওদের দেখি না। ঠিক বাবার মতো দৃষ্টিতে ওদের ছ্যাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

হাঁটু দুটো সামান্য একটু নাড়লো ইভ। পা দুটোতে মনে হচ্ছে যেন অসংখ্য পিঁপড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সারাটা শরীর অসাড়, টনটন করছে। ইভের মনে হয়, ওর শরীরটা বড্ড বেশি প্রাণময়—চাহিদা ভীষণ বেশি। 'আমার অদৃশ্য হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। অদৃশ্য হয়ে এখানে থাকবো আর ওকে দেখবো—কিন্তু ও আমাকে দেখতে পাবে না। আমাকে ওর কোনো প্রয়োজন নেই। এ ঘরে আমি অপ্রয়োজনীয়।' মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে পিয়েরের ওপরে দেয়ালটার দিকে তাকালো ইভ। দেয়ালের গায়ে ভীতি-প্রদর্শনের লিপি লেখা। ইভ তা জানে, কিন্তু সেগুলোকে পড়তে পারে না। প্রায়ই ও দেয়াল-কাগজে আঁকা বড়ো বড়ো লাল গোলাপগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে, যতোক্ষণ না গোলাপগুলো ওর চোখের সামনে নাচতে শুরু করে। ছায়ায় অগ্নিশিখার মতো ঝলসে ওঠে গোলাপগুলো। অধিকাংশ সময়ে ভয়-দেখানো কথাগুলো ছাদের কাছাকাছি জায়গায়—খাটটার সামান্য একটু বাঁ ধারে—লেখা থাকে : কিন্তু মাঝে মাঝে সেগুলো অন্যত্র সরে যায়। 'আমাকে উঠতে হবে। আমি পারছি না…আমি আর বসে থাকতে পারছি না।' দেয়ালে কতকগুলো সাদা সাদা চাকতিও রয়েছে, যেগুলো দেখতে পিঁয়াজের ফালির মতো। চাকতিগুলো ঘোরে আর ইভের হাত দুটো কাঁপতে শুরু করে। 'মাঝে মাঝে মনে

হয়, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু না, আমি পাগল হতে পারি না। আমি বিচলিত হয়ে উঠছি এই যা।'

সহসা নিজের হাতে পিয়েরের স্পর্শ অনুভব করে ইভ।

'আগাথা,' নরম গলায় পিয়ের ডাকে।

পিয়ের ওর দিকে তাকিয়ে হাসে, কিন্তু এক ধরনের বিতৃষ্ণা নিয়ে শুধুমাত্র আঙুলের প্রান্তগুলো দিয়ে ওর হাতখানা ধরে রাখে—যেন সে পিঠ ধরে একটা কাঁকড়া তুলে নিয়েছে, কাঁকড়ার দাঁড়াগুলোকে সে এড়াতে চায়।

'আগাথা,' পিয়ের বলে, 'আমার ভীষণ ইচ্ছে করে তোমার ওপরে আস্থা রাখতে।'

ইভ দু চোখ বন্ধ করে, বুকখানা ফুলে ওঠে ওর। 'আমি কোনো জবাব দেবো না। জবাব দিলেই ও রেগে যাবে…আর কিছুই বলবে না।'

'তোমাকে আমার ভালো লাগে আগাথা, কিন্তু আমি তোমাকে বুঝতে পারি না।' ইভের হাতখানা ছেড়ে দেয় পিয়ের, 'কেন তুমি সর্বদা ঘরের মধ্যে থাকো?'

ইভ কোনো জবাব দেয় না।

'আমাকে বলো—কেন?'

'তুমি তো জানো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' ইভ শুকনো গলায় জবাব দেয়।

'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। কেন তুমি আমাকে ভালোবাসবে? আমি নিশ্চয়ই তোমাকে আতঙ্কিত করে তুলি: আমি যে অভিশপ্ত, ভূতগ্রস্ত!' সামান্য একটু হেসেই আচমকা গম্ভীর হয়ে ওঠে পিয়ের, 'তোমার আর আমার মাঝখানে একটা পাঁচিল রয়েছে। আমি তোমাকে দেখি, তোমার সঙ্গে কথা বলি…কিন্তু তুমি রয়েছো পাঁচিলের অন্য ধারে। আমাদের মিলনে বাধা কোথায়? আমার তো মনে হয় আগে—হামবুর্গে—সেটা অনেক সহজ ছিলো।'

'হ্যাঁ,' বিষণ্ন স্বরে জবাব দেয় ইভ।

সর্বদাই সেই হামবুর্গ। অথচ ইভ বা পিয়ের কোনোদিনও হামবুর্গে যায়নি। ওদের সত্যিকারের অতীত নিয়ে মানুষটা কক্ষণো কিছু বলে না।

'আমরা খালের ধার দিয়ে হাঁটতাম। খালে একটা বজরা ছিলো, মনে আছে? কালো রঙের বজরা। বজরার পাটাতনে একটা কুকুর।'

বলতে বলতে বানাতে থাকে পিয়ের। শুনেই মিথ্যে বলে মনে হয়।

'আমি তোমার হাত ধরেছিলাম। তোমার গায়ে তখন অন্য একটা চামড়া ছিলো। তুমি যা কিছু বলেছিলে, আমি তা সবই বিশ্বাস করেছিলাম।' আচমকা

পিয়ের চিৎকার করে ওঠে, 'চুপ করো!' এক মুহূর্ত কান পেতে থাকে সে। তারপর করুণ কণ্ঠে বলে, 'ওরা আসছে!'

'ওরা আসছে?' ইভ লাফিয়ে ওঠে, 'আমি তো ভেবেছিলাম ওরা আর কোনোদিনও আসবে না!'

গত তিন দিন পিয়ের অনেকটা শান্ত ছিলো। এ কদিন মূর্তিগুলো আর আসেনি। পিয়ের মূর্তিগুলোকে ভীষণ ভয় পায়, যদিও সে কিছুতেই তা স্বীকার করে না। ইভ ভয় পায় না। কিন্তু ওরা যখন গুঞ্জন তুলে ঘরের সর্বত্র উড়ে বেড়াতে শুরু করে, তখন পিয়েরকে ভয় পায় ও।

'জিথে্রটা আমাকে দাও,' পিয়ের বলে।

ইভ উঠে গিয়ে সেটাকে তুলে নেয়। আসলে ওটা কয়েক টুকরো কার্ডবোর্ড, পিয়ের আঠা দিয়ে সেগুলোকে একত্রে জুড়ে রেখেছে। মূর্তিগুলোকে জাদু করার জন্যে পিয়ের ওটাকে ব্যবহার করে। জিনিসটা দেখতে একটা মাকড়সার মতো। একটা কার্ডবোর্ডে পিয়ের লিখে রেখেছে, 'গোপন-আক্রমণের বিরুদ্ধ-শক্তি।' অন্য একটাতে লেখা, 'কালো।' তৃতীয়টাতে সে চোখ-কোঁচকানো একটা হাসিভরা মুখ এঁকেছে: মুখটা ভলতেয়ারের।

জিনিসটার একটা প্রান্ত ধরে ছিনিয়ে নিয়ে ম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পিয়ের, 'এটা আমি আর ব্যবহার করতে পারবো না।'

'কেন?'

'ওরা এটাকে উলটে দিয়েছে।'

'তাহলে কি তুমি অন্য একটা বানাবে?'

ইভের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে পিয়ের। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'তুমি তাই চাও, তাই না?'

পিয়েরের ওপরে রাগ হয় ইভের। 'ওরা যতোবার আসে, পিয়ের প্রতিবারই সাবধান করে দেয়। কি করে তা পারে? এ ব্যাপারে কক্ষণো ওর ভুল হয়নি।'

পিয়েরের আঙুলের প্রান্ত থেকে অসহায়ভাবে ঝুলছে জিথে্রটা। 'ও সর্বদাই ওটাকে ব্যবহার না করার পক্ষে একটা যুতসই কারণ খুঁজে পায়। রোববার যখন ওরা এলো, ও এমন ভান করলো যেন ওটাকে হারিয়ে ফেলেছে। অথচ আমি তখন সেটাকে আঠার পাত্রটার পেছনে দেখতে পেয়েছিলাম এবং ওর পক্ষেও সেটাকে দেখতে না পাওয়া সম্ভব ছিলো না। বুঝতে পারি না, পিয়েরই ওদের নিয়ে আসে কি না।' মাঝে মাঝে ইভের মনে হয়, পিয়ের না চাইলেও এক ঝাঁক

অস্বাস্থ্যকর চিন্তা ও দৃশ্য পিয়েরকে ঘিরে রেখেছে। কিন্তু অন্য সময়গুলোতে পিয়েরই যেন সেগুলোকে কল্পনা করে নেয়। 'ও কষ্ট পায়। কিন্তু ওই মূর্তি আর নিগ্রোটার অস্তিত্বে কতোটা বিশ্বাস করে ও? আমি জানি, মূর্তিগুলোকে ও দেখতে পায় না : শুধু ওদের আওয়াজ শোনে : ওরা পাশ দিয়ে যাবার সময় পিয়ের অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। অথচ তা সত্ত্বেও পিয়ের বলে যে সে ওদের ছাখে। ওদের বর্ণনাও দেয়।' ডাক্তার ফ্রাঁশর রক্তিম মুখখানা মনে পড়ে ইভের। 'কিন্তু মাদাম, মানসিক ভারসাম্যহীন সমস্ত মানুষই মিথ্যেবাদী। ওরা সত্যি সত্যি যা অনুভব করে এবং যা অনুভব করছে বলে ভান দেখায়—তা আলাদা করে নেবার চেষ্টা করলে আপনি বৃথাই নিজের সময় নষ্ট করবেন।'···চমকে ওঠে ইভ। 'এখানে ডাক্তার ফ্রাঁশ কেন এলেন? আমি তো তাঁর মতো করে ভাবনা শুরু করতে চাই না!'

পিয়ের উঠেছে। জিথেটাকে বাজে-কাগজের ঝুড়িতে ফেলতে গেছে। 'আমি তোমার মতো করে ভাবতে চাই,' ইভ অস্ফুটে বলে। একবারে যথাসম্ভব কম জায়গা অতিক্রম করার জন্যে কনুই দুটোকে নিতম্বের সঙ্গে চেপে, ছোটো ছোটো পদক্ষেপে, পা টিপে টিপে হাঁটছে পিয়ের।

'আমাদের কালো রঙের দেয়াল-কাগজ লাগাতে হবে।' ইভের কাছে এসে, পিয়ের ওর দিকে তাকায়। 'এ ঘরটাতে যথেষ্ট কালো নেই।'

আরাম-কুর্সিতে গুটিসুটি হয়ে বসে রয়েছে পিয়ের। করুণ দৃষ্টিতে মানুষটার দিকে তাকায় ইভ। ক্ষীণ কৃশ শরীর···সব সময়েই কুঁকড়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত ·· হাত পা মাথা যেন গুটিয়ে রাখা যায়। ঘড়িতে ছটার ঘণ্টি বাজে। নিচের তলায় পিয়ানোটা নিশ্চুপ। ইভ দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে : মূর্তিগুলো এখুনি আসবে না, তাদের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

'আলোটা জ্বেলে দেবো?'

ইভ অন্ধকারে ওদের প্রতীক্ষায় থাকতে চায় না।

'তোমার যা খুশি,' পিয়ের বলে।

লেখার টেবিলে ছোট্ট একটা বাতি জ্বাললো ইভ, একটা রক্তিম আভা ভরিয়ে তুললো ঘরটাকে।

পিয়েরও প্রতীক্ষা করছে। সে কথা বলছে না, কিন্তু তার ঠোঁট দুটি নড়ছে। ওর ঠোঁট দুটোকে ভালোবাসতো ইভ। আগে ওই ঠোঁট দুটো বাসনামদির ছিলো, কিন্তু এখন ওরা সমস্ত কামনা-বাসনা হারিয়ে ফেলেছে। পিয়েরের দুটো ঠোঁটের মধ্যে এখন দুস্তর ব্যবধান, কাঁপছে মৃদু মৃদু, ক্রমাগত পরস্পরের কাছে আসছে,

ঝাঁপিয়ে পড়ছে একে অন্তের ওপরে : কিন্তু তা শুধু আবার বিচ্ছিন্ন হবার জন্যে। ওই কালো মুখখানাতে একমাত্র ওরাই জীবিত পদার্থ। দেখে মনে হয় যেন দুটো ভয়ার্ত প্রাণী। একটিও শব্দ উচ্চারণ না করে পিয়ের ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে বিড়বিড় করে যেতে পারে। এবং ইভও প্রায়ই ওর ওই সূক্ষ্ম অথচ অ-বশ্য অঙ্গ সঞ্চালনে নিজেকে মুগ্ধ করে তোলে। 'আমি ওর ঠোঁট দুটোকে ভালোবাসি।' আজকাল পিয়ের আর ওকে চুমু দেয় না। এখন স্পর্শকে ভয় পায় মানুষটা। রাতে 'তারা' পিয়েরকে স্পর্শ করে—পুরুষের শুষ্ক কঠিন হাত তার সর্বাঙ্গে চিমটি কাটে : লম্বা নখওলা রমণীদের হাত ওর গায়ে সোহাগের স্পর্শ ছোঁয়ায়। পিয়ের প্রায়ই পোশাক পরে শোয় : কিন্তু হাতগুলো তার পোশাকের তলা দিয়ে গলে যায়, তার জামা ধরে টানে। একবার সে হাসির শব্দ শুনতে পেয়েছিলো, কে যেন স্ফুরিত অধর চেপে রেখেছিলো তার অধরে। সেই রাতের পর থেকে ইভকে আর চুমু খায়নি পিয়ের।

'আগাথা, তুমি আমার ঠোঁটের দিকে তাকিও না।'

ইভ ওর চোখ দুটি নত করে।

'মানুষ যে ঠোঁটের-ভাষা-পড়া শিখতে পারে তা আমার অজানা নেই,' পিয়ের উদ্ধত স্বরে বলে। আরাম-কুর্সির হাতলে কাঁপতে থাকে তার হাত দুটো। তর্জনি প্রসারিত হয়, তিনবার টোকা দেয় বুড়ো আঙুলটাতে, কুঁকড়ে যায় অন্য আঙুল-গুলো : এটা একটা জাদুর চাল।

'এবারে শুরু হবে,' ইভ মনে মনে ভাবে। পিয়েরকে দু হাতে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে ওর।

'সাঁ পাওলর কথা তোমার মনে আছে?' ভীষণ কৃত্রিম সুরে চিৎকৃত কণ্ঠস্বরে বলতে শুরু করে পিয়ের।

ইভ কোনো জবাব দেয় না। হয়তো এটা একটা ফাঁদ।

'সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো,' পিয়েরের কণ্ঠস্বরে সুতৃপ্তির রেশ। 'ডেনমার্কের একটা নাবিকের কাছ থেকে আমি তোমাকে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে প্রায় মারামারি হবার উপক্রম হয়েছিলো। কিন্তু আমি তার একটা পানায়ের দাম মিটিয়ে দেওয়ায়, সে আমাকে তোমায় নিয়ে যেতে দিয়েছিলো। পুরো ব্যাপারটাই ছিলো স্রেফ একটা তামাশা।'

'ও মিথ্যে বলছে। ও যা বলছে তার একটি শব্দও ও বিশ্বাস করে না। ও জানে আমার নাম আগাথা নয়। ও যখন মিথ্যে বলে তখন ওকে আমার ঘেন্না করে।' কিন্তু পিয়েরের নির্নিমেষ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে ইভের সমস্ত রাগ

জল হয়ে যায়। 'পিয়ের মিথ্যে বলছে না,' ইভ ভাবে। 'আসলে ও আর এ সমস্ত সহ্য করতে পারছে না। ও বুঝতে পারছে, তারা আসছে। তাদের আসার শব্দ যাতে শোনা না যায়, তাই ও কথা বলছে।' আরাম-কুর্সির হাতলে দুটো হাত চেপে রেখেছে পিয়ের। ওর মুখটা ফ্যাকাশে : ও হাসছে।

'এই দেখা হবার ব্যাপারটা প্রায়ই অদ্ভুত হয়,' পিয়ের বলে। 'তবে সেটা হঠাৎ করে হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না। তোমাকে কে পাঠিয়েছিলো, আমি তা জিগেস করছি না : কারণ আমি জানি, তুমি তার কোনো জবাব দেবে না। তবে যাই হোক না, আমার চোখে ধুলো দেবার পক্ষে তুমি তখন যথেষ্ট সপ্রতিভ ছিলে।'

আপ্রাণ প্রচেষ্টায়, বহু কষ্টে, তীক্ষ্ণ স্বরে এবং দ্রুত লয়ে কথা বলছিলো পিয়ের। কিছু কিছু শব্দ সে উচ্চারণ করতে পারছিলো না এবং সেগুলো কোনো নরম বেঢপ পদার্থের মতো তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিলো।

'পার্টির মাঝখানে, দু সারি কালো গাড়ির ভেতর দিয়ে, তুমি আমাকে টানতে টানতে বের করে নিয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু গাড়িগুলোর পেছনে একদল সৈন্য ছিলো : আমি ঘুরে দাঁড়াতেই তাদের লাল চোখগুলো দপদপিয়ে উঠেছিলো। আমার ধারণা, পুরো সময়টা আমার হাত ধরে ঝুলতে ঝুলতেও তুমি তাদের কোনো ইঙ্গিত করেছিলে। কিন্তু আমি তা কিছুই দেখিনি। অভিষেকের মহান উৎসবে আমি তখন বড্ড বেশি তন্ময় হয়ে ছিলাম।'

সম্পূর্ণ খোলা চোখে সরাসরি সামনের দিয়ে তাকায় পিয়ের। তারপর কথা না থামিয়ে, একটি মাত্র অঙ্গ সঞ্চালনে, একটা হাত অতি দ্রুত কপালের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে যায়। কথা সে থামাতে চাইছিলো না।

'সেটা ছিলো গণতন্ত্রের অভিষেক,' কর্কশ গলায় পিয়ের বলতে থাকে। 'মনে ছাপ ফেলার মতো একটা দৃশ্য : কারণ উৎসবে উপনিবেশগুলো সমস্ত প্রজাতির প্রাণীই পাঠিয়েছিলো। তুমি বাঁদরদের মধ্যে হারিয়ে যাবে বলে ভয় পাচ্ছিলে।' চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে পিয়ের উদ্ধত ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করে, 'আমি বলেছি, বাঁদরদের মধ্যে। কিন্তু আমি নিগ্রোদের মধ্যেও বলতে পারতাম!'

'ব্যর্থতাগুলি চোখ এড়াবার চেষ্টায় টেবিলের তলায় গলে যায়। কিন্তু আমার দৃষ্টি তাদের আবিষ্কার করে যথাস্থানে পেরেক ঠুকে দেয়। সঙ্কেত-শব্দ হচ্ছে, নীরবতা। নীরব থাকা। সমস্ত কিছুই যথাস্থানে, এবারে সমস্ত মনোযোগ মূর্তিদের প্রবেশের দিকে, সেটাই সত্যতা নির্দেশের প্রতিস্বাক্ষর। ট্রালা লা…' চিৎকার করে উঠে নিজের মুখে হাত চাপা দেয় পিয়ের। 'ট্রালালালা, ট্রালালালা!'

পিয়ের নিশ্চুপ। ইভ বুঝতে পারে, মূর্তিগুলো ঘরে এসে ঢুকেছে। পিয়ের আড়ষ্ট, পাণ্ডুর এবং আস্থাহীন। ইভও আড়ষ্ট। এবং দুজনেই অপেক্ষা করতে থাকে নীরবে। বারান্দা দিয়ে কে যেন হাঁটছে : ওটা বাড়ির জমাদারিনী, মারি। নির্ঘাত ও সবে এসে পৌঁছেছে। 'ওকে গ্যাসের জন্যে টাকা দিতে হবে,' চিন্তা করে ইভ। এবং তারপরেই মূর্তিগুলো উড়তে শুরু করে, উড়তে থাকে ইভ ও পিয়েরের মাঝখান দিয়ে।

'আহ্!' পা দুটোকে শরীরের নিচে গুটিয়ে আরাম-কুর্সিতে তলিয়ে যায় পিয়ের। মুখটা সে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে। মাঝে মাঝে কষ্ট করে হাসছে, কিন্তু বিন্দু বিন্দু ঘাম মুক্তো হয়ে ফুটে উঠছে তার সারা কপালে। ওই পাংশুল গাল, কাঁপুনিতে বিকৃত হয়ে ওঠা ওই ঠোঁট—দৃশ্যটা আর সহ্য করতে পারে না ইভ। ও চোখ বন্ধ করে। সোনালি জরির সুতো নাচতে শুরু করে ওর অক্ষিপল্লবের রক্তিম পটভূমিকায়। নিজেকে বয়স্ক এবং ভারি বলে মনে হয় ওর। কাছেই সশব্দে শ্বাস নিচ্ছে পিয়ের। সামান্য একটু শিহরণ অনুভব করে ইভ : কাঁধ এবং ডান অঙ্গে সামান্য একটু যন্ত্রণা। 'ওরা উড়ছে, গুঞ্জন তুলছে, পিয়েরের ওপরে ঝুঁকে পড়ছে।' যেন কোনো অপ্রীতিকর সংস্পর্শ এড়াবার জন্যে, কোনো ভারি এবং কুৎসিত বস্তুর পথ করে দেবার জন্যে, সহজাত প্রবৃত্তির বশে ইভের শরীর বাঁ দিকে নত হয়। হঠাৎ মেঝেতে একটা ক্যাঁচক্যাঁচে শব্দ হয় এবং ইভের একটা উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা হয় নিজের চোখ দুটো খুলতে…হাত দিয়ে বাতাস সরিয়ে ডান দিকে তাকাতে।

ইভ কিছুই করে না, চোখ দুটোকে বন্ধ করেই রাখে এবং একটা তিক্ত আনন্দ ওর সমস্ত শরীরটাকে কাঁপিয়ে তোলে। 'আমিও ভয় পেয়েছি,' ভাবে ইভ। ওর সমস্ত প্রাণ এসে ওর ডান দিকটাতে আশ্রয় নিয়েছে। চোখ না খুলেই ও পিয়েরের দিকে ঝোঁকে। এখন সামান্য একটু প্রয়াসই যথেষ্ট, তাহলেই ও এই বিয়োগান্ত পৃথিবীটাতে প্রথমবার প্রবেশ করতে পারবে। 'আমি মূর্তিগুলোকে ভয় পাই,' ভাবে ইভ। এ এক তীব্র, অন্ধ স্বীকারোক্তি : জাদুমন্ত্রের উচ্চারণ। নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে ইভ ওদের উপস্থিতি বিশ্বাস করতে চায়। ও একটা নতুন অনুভূতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে : উৎকণ্ঠা থেকে জন্ম নেওয়া স্পর্শের অনুভূতি—যা ওর ডান অঙ্গকে অবশ করে তুলেছে। নিজের বাহু, কাঁধ আর শরীরের পাশটাতে ওদের যাতায়াত অনুভব করে ও।

মূর্তিগুলো বেশ নিচু দিয়ে ধীরসুস্থে উড়ছে : মৃদু শব্দ হচ্ছে। ইভ জানে ওদের চোখে শয়তানের দৃষ্টি, চোখের পাথর থেকে ঠিকরে বেরিয়েছে ওদের

অক্ষিপক্ষ্মগুলি। ইভ এ কথাও জানে যে ওরা ঠিক জীবন্ত নয়, কিন্তু মাংসের মোটা পরত আর উষ্ণ আঁশ রয়েছে ওদের বিশাল দেহগুলোতে: আঙুলের প্রান্ত থেকে ওরা পাথরের ছাল খসিয়ে ফ্যালে এবং খেয়ে যায় ওদের হাতের তালু। ইভ পুরোপুরি এসব দেখতে পাচ্ছিলো না। ওর শুধু মনে হচ্ছিলো, পাথুরে মাথা আর মানুষের মতো দেখতে বিশাল চেহারার ছায়াঘন ম্লান মহিলারা ওর শরীর দিয়ে পিছলে নামছে। 'ওরা পিয়েরের ওপরে ঝুঁকে রয়েছে'—ইভ এমন প্রচণ্ড প্রয়াস চালালো যে ওর হাত দুটো কাঁপতে শুরু করলো—'ওরা আমার ওপরে ঝুঁকছে।' আচমকা এক ভয়ঙ্কর চিৎকার ওকে হিম করে তুললো। ওরা পিয়েরকে স্পর্শ করেছে। ইভ চোখ মেললো। দু হাতে মাথা চেপে রেখেছে পিয়ের, শ্বাস ফেলছে ঘন ঘন। নিজের নিঃশেষিত বলে মনে হয় ইভের। 'এটা একটা খেলা,' তীব্র অনুশোচনায় ইভের মনে হয়, 'এটা স্রেফ একটা খেলা। আসলে আমি মুহূর্তের জন্যেও আন্তরিকভাবে এটাকে বিশ্বাস করিনি। অথচ পুরো সময়টাই পিয়ের যন্ত্রণাভোগ করেছে, যেন ব্যাপারটা বাস্তব।'

পিয়ের এখন গা এলিয়ে বসেছে, শ্বাস ফেলছে স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু ওর চোখের মণি দুটো আশ্চর্য রকমের বিস্ফারিত এবং ও ঘামছে।

'তুমি ওদের দেখেছো?' প্রশ্ন করে পিয়ের।

'আমি ওদের দেখতে পাই না।'

'সেটাই তোমার পক্ষে ভালো। আমি দেখে দেখে অভ্যস্থ। তুমি দেখলে ভয় পেয়ে যাবে।'

ইভের হাত দুটো তখনও কাঁপছে। রক্তস্রোত ছুটে গেছে ওর মাথার দিকে। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে রাখে পিয়ের। কিন্তু সেটাকে ধরায় না।

'আমি ওদের দেখি বা না দেখি, তাতে আমি পরোয়া করি না।' পিয়ের বলে, 'কিন্তু আমি চাই না, ওরা আমাকে স্পর্শ করুক। আমার ভয় হয়, তাহলে আমার গায়ে ফুসকুড়ি বেরুবে।' এক মুহূর্ত একটু চিন্তা করে পিয়ের জিগেস করে, 'তুমি ওদের আওয়াজ শুনেছো?'

'হ্যাঁ, উড়োজাহাজের এঞ্জিনের মতো আওয়াজ।' (আগের রোববার পিয়েরই কথাটা ওকে বলেছে।)

'এটা তুমি বাড়িয়ে বলছো,' পিয়ের প্রসন্ন ভঙ্গিমায় মৃদু হাসে। কিন্তু এখনও সে পাণ্ডুর। ইভের হাতের দিকে তাকায় সে, 'তোমার হাত দুটো কাঁপছে। বেচারী আগাথা: তার অর্থ ওরা তোমার মনে বেশ খানিকটা ছাপ ফেলেছে।

কিন্তু তুমি চিন্তা কোরো না। আগামী কালের আগে ওরা আর ফিরে আসবে না।'

ইভ কথা বলতে পারছিলো না। ওর দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ হচ্ছিলো এবং ওর ভয় হচ্ছিলো পিয়ের তা লক্ষ্য না করে। বেশ কিছুক্ষণ ওকে লক্ষ্য করলো পিয়ের। তারপর মাথা নেড়ে বললো, 'তুমি সাংঘাতিক সুন্দরী। এটা খুব খারাপ, ভীষণ খারাপ।'

দ্রুত হাত বাড়িয়ে ইভের একটা কান নিয়ে খেলতে থাকে পিয়ের, 'আমার দুষ্টু সোনা! তুমি আমাকে একটু অসুবিধেয় ফেলে দাও। তুমি বড্ড সুন্দরী: এটা আমার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে দেয়। অনুস্মরণের প্রশ্ন যদি না থাকতো…'

বলতে বলতে থেমে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে ইভের দিকে তাকিয়ে থাকে পিয়ের।

'এই শব্দটা নয়…এটা এসে গেছে…এসে পড়েছে।' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মৃদু হাসে পিয়ের, 'আমার জিভের ডগায় অন্য একটা শব্দ ছিলো। কিন্তু তার জায়গায় এটা…এটা বেরিয়ে এলো। আমি তোমাকে যেন কি বলছিলাম, ভুলে গেছি।'

এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে মানুষটা, তারপর মাথা নাড়ে।

'নাঃ, আমি ঘুমোবো।' ছেলেমানুষের মতো কণ্ঠস্বরে পিয়ের বলে, 'জানো আগাথা, আমি না ক্লান্ত! আমার চিন্তা-ভাবনাগুলোকে আমি এখন আর গুছিয়ে নিতে পারি না।'

সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে গালচের দিকে তাকিয়ে থাকে পিয়ের। ইভ তার মাথার নিচে একটা বালিশ গুঁজে দেয়।

'তুমিও ঘুমোতে পারো,' ইভকে বলে পিয়ের, 'ওরা আর ফিরে আসবে না।'

…অণুস্মরণ…

পিয়ের ঘুমিয়ে পড়েছে। মুখে একটা আধফোটা অকপট হাসি। মাথাটা এক পাশে ঘোরানো: দেখে মনে হতে পারে, মানুষটা নিজের কাঁধ দুটো দিয়ে গালটাকে আদর করতে চাইছিলো। ইভের ঘুম পাচ্ছিলো না, ও ভাবছিলো: 'অনুস্মরণ।' পিয়েরকে আচমকা নির্বোধের মতো দেখাচ্ছিলো এবং শব্দটা যেন পিছলে বেরিয়ে গিয়েছিলো ওর মুখ থেকে। অবাক হয়ে পিয়ের তখন সামনের দিকে তাকিয়েছিলো: যেন সে শব্দটাকে দেখতে পেয়েছে, কিন্তু চিনতে পারেনি। মুখটা খোলা ছিলো: যেন কিছু একটা জোর করে ভেতরে ঢুকে গেছে। 'পিয়ের তোতলাচ্ছিলো। এই প্রথম ওর এমনটি হলো। ও নিজেও তা লক্ষ্য করেছে। বলেছে, ও আর নিজের চিন্তা-ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে নিতে পারে না।' পিয়েরের মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট, বাসনাঘন গোঙানি বেরিয়ে আসে: উদ্দেশ্যহীনের মতো একটা হাত নাড়ে মানুষটা। ইভ কঠোর দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য

করতে থাকে : 'কি অবস্থায় জেগে উঠবে ও?' প্রশ্নটা ইভকে যন্ত্রণা দেয়। পিয়ের ঘুমোলেই প্রশ্নটা নিয়ে ওকে চিন্তা করতে হয়। ইভের ভয় হয়, মানুষটা বস্তুদৃষ্টি নিয়ে ঘুম থেকে উঠবে—তোতলাবে। 'আমি বোকা,' ইভ ভাবে, 'এক বছরের আগে সেটা শুরু হবে না। ফ্রাঁশ তাই বলেছেন।' কিন্তু তবু উৎকণ্ঠা ওকে রেহাই দেয় না। এক বছর—একটা শীত, একটা বসন্ত, একটা গ্রীষ্ম, ফের একটা শরতের শুরু। তারপর একদিন মানুষটার চোখ মুখ বিহ্বল হয়ে উঠবে, চোয়াল ঝুলে পড়বে, কান্নাকরুণ চোখ দুটো আধখানা করে খুলবে।

পিয়েরের হাতের ওপরে ঝুঁকে, তাতে নিজের ঠোঁট দুটিকে চেপে ধরে ইভ : 'তার আগেই আমি তোমাকে খুন করে ফেলবো!'

সুখের ঠিকানা

আইজ্যাক বাশেভিস সিঙ্গার

জন্ম পোল্যাণ্ডের এক ধার্মিক ইহুদি পরিবারে, ১৯০৪ সালে। শিক্ষা, ওয়ারশর র‍্যাবিনিক্যাল সেমিনারিতে। ১৯৩৫ সালে দেশত্যাগ করে পাকাপাকিভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। প্রথম জীবনে হিব্রু ভাষায় লেখা শুরু করলেও, বহুদিন হলো তিনি ইদ্দিশকেই প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। যদিও আমেরিকার নাগরিক, কিন্তু সিঙ্গারের সাহিত্যের মূল রয়ে গেছে পোলিশ-ইহুদি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গভীরে। নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৭৮ সালে। উল্লেখ-যোগ্য উপন্যাস : দ্য ফ্যামেলি মসকট, দ্য ম্যাজেসিয়ান অফ লুবলিন, দ্য ম্যানর। গল্পগ্রন্থ : গিমপেল দ্য ফুল, শর্ট ফ্রাইডে, আ ফ্রেণ্ড অফ কাফকা, প্যাশনস্ ইত্যাদি।

মহিলাদের সঙ্গে যারা মেলামেশা করে তারা দম্ভ প্রকাশ করবেই। ওয়ারশর সাহিত্যজগতে ম্যাক্স পারস্কি একটি মেয়েবাজ হিসেবে পরিচিত। তার অনুগামীরা স্বীকার করে, মেয়েদের পেছনে অতোটা সময় নষ্ট না করলে সে হয়তো একজন দ্বিতীয় শোলেম আলেইকেম কিংবা হয়তো ইদ্দিশ সাহিত্যের মপাসাঁ হতে পারতো। আমার চাইতে সে বিশ বছরের বড়ো হলেও আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়েছিলাম। আমি তার লেখা পড়েছি এবং তার সমস্ত কাহিনীই শুনেছি। একদিন এক গ্রীষ্ম-সন্ধ্যায় আমরা ছোট্ট একটা উদ্যান-কাফেতে বসে ব্লুবেরি কুকি সহযোগে কফি পান করছিলাম। ততোক্ষণে সূর্য অস্তমিত, টিনের চালাগুলোর ওপরে আকাশে লটকে রয়েছে সেপ্টেম্বরের ফ্যাকাশে চাঁদ। কিন্তু সূর্যাস্তের রেশটুকু তখনও প্রতিফলিত হচ্ছে কাফের ভেতরে ঢোকার কাচের দরজাটাতে। বাতাসটা গরম এবং তাতে প্রাগা অরণ্য, সদ্য-সেঁকা বাবকা এবং ক্ষেতে দেবার জন্যে আস্তাবলগুলো থেকে চাষীদের সংগ্রহ করে রাখা সারের গন্ধ। ম্যাক্স পারস্কি একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছিলো। ছাই আর সিগারেটের শেষাংশে ভরে গিয়েছিলো ছাইদানটা। বয়েস চল্লিশের কোঠায় হলেও—কেউ কেউ মনে করতেন ওর বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি—ম্যাক্স পারস্কিকে তরুণ বলেই মনে হতো। ওর চেহারাটাই ছিলো ছেলেমানুষদের মতো : এক মাথা চকচকে কালো চুল,

বাদামি রঙের মুখ, পুরুষ্টু ঠোঁট আর সম্মোহনকারীর মতো অন্তর্ভেদী দুটি চোখ। ঠোঁটের দু পাশের রেখা দুটো যেন অদৃষ্ট সম্পর্কে ওঁর সচেতনতার প্রকাশ। শত্রুরা বলাবলি করতো, ম্যাক্স নাকি :ধনী মহিলাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নেয়। আরও বলতো, এক মহিলা নাকি তার জন্যেই আত্মহত্যা করেছে। আমাদের পরিচারিকাটি—মাঝবয়সী হলেও চেহারায় যুবতী—ক্রমাগত ম্যাক্সের দিকে তাকাচ্ছিলো। আবার মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে অপরাধীর মতো হাসছিলো মেয়েটি : যেন বলতে চাইছিলো, না তাকিয়ে পারছি নে। মেয়েটির নাকটা ছোটো, গাল দুটো তোবড়ানো আর চিবুকটা ছুঁচলো। লক্ষ্য করলাম, ওঁর বাঁ হাতে মাঝের আঙুলটা নেই।

হঠাৎ ম্যাক্স পারস্কি জিগেস করলো, 'আচ্ছা, তোমার চাইতে বারো বছরের বড়ো সেই মহিলাটির কি খবর? তুমি কি এখনও ওঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করো?'

আমি জবাব দিতে চাইছিলাম, কিন্তু তার আগেই ম্যাক্স মাথা নেড়ে বললো, 'বয়স্কা মহিলাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যা অল্পবয়সীরা যোগান দিতে পারে না। আমার সঙ্গেও একটি মহিলার পরিচয় ছিলো। তিনি আমার চাইতে বারো নয়—তিরিশ বছরের বড়ো ছিলেন। আমি তখন বছর সাতাশের যুবক আর তিনি নিশ্চয়ই পঞ্চাশের কোঠায়। তিনি ছিলেন অবিবাহিতা, জার্মান সাহিত্যের শিক্ষিকা। হিব্রুও জানতেন। তখনকার দিনে ওয়ারশর ধনী ইহুদিরা তাঁদের মেয়েদের গ্যয়তে, শীলার এবং লেসিং বিশারদ করে তুলতে চাইতেন। সঙ্গে এক চিমটে হিব্রু শিখলেও কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু এসব না শিখলেই তারা সংস্কৃতির দিক দিয়ে খাটো হয়ে থাকতো। থেরেসা স্টেইন ওই সমস্ত শিখিয়েই জীবিকা অর্জন করতেন। তুমি খুব সম্ভব কোনোদিনও ওঁর নাম শোনোনি, কিন্তু আমাদের সময়ে ওয়ারশতে উনি সুপরিচিতা ছিলেন। মহিলাটি কবিতা জিনিসটাকে ভীষণ গভীরভাবে নিয়েছিলেন, যাতে প্রমাণ হয় উনি তেমন চালাক-চতুর ছিলেন না। সুন্দরী তো অবশ্যই নন। নওলিপকি স্ট্রীটে ওঁর ছোট্ট ফ্ল্যাটটাতে যাওয়াই ছিলো একটা অভিজ্ঞতা। চতুর্দিকে দারিদ্র্য—কিন্তু ওঁর ঘরগুলোকে উনি যেন একটি বয়স্কা কুমারীর মন্দির করে তুলেছিলেন। রোজগারের অর্ধেক উনি বইয়ের পেছনেই ব্যয় করতেন, অধিকাংশ বইই মখমলে বাঁধানো এবং সোনার জলে নাম লেখা। ছবিও কিনতেন। আমার সঙ্গে যখন পরিচয় হয় তখনও উনি একটি নির্ভেজাল কুমারী। আমার একটা গল্পের জন্যে ক্লপস্টকের মিসাইয়া থেকে একটা উদ্ধৃতির দরকার ছিলো। ওঁকে টেলিফোন করায় উনি সেদিন সন্ধ্যায় আমাকে ওঁর ফ্ল্যাটে যেতে বললেন। গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তার আগেই উনি সেই

বিশেষ উদ্ধৃতিটি এবং আরও অনেকগুলো খুঁজে বের করে রেখেছিলেন। আমার সদ্য-প্রকাশিত প্রথম বইখানা আমি ওঁর জন্যে নিয়ে গিয়েছিলাম। ইদ্দিশ উনি বেশ ভালোই জানতেন। পেরেৎসকে উনি পুজো করতেন। কাকেই বা না করতেন? একজন ধার্মিক ইহুদি যেভাবে ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করেন, উনি ঠিক তেমনি সশ্রদ্ধ গুরুত্ব দিয়ে 'প্রতিভা' শব্দটা উচ্চারণ করতেন। মহিলার চেহারাটি ছিলো ছোটোখাটো গোলগাল, ওঁর চোখ দুটোতে ফুটে উঠতো দয়া আর সরলতা। আজকাল ওই ধরনের মহিলা আর নেই। তখন আমার অল্প বয়েস, কোনো কিছুর মধ্যেই ভালত্ব দেখতে পাই না—তাই মহিলাকে আঘাত দেবার জন্যে আমি যা কিছু করা সম্ভব, সবই অবিলম্বে করে ফেললাম। সমস্ত কবিদের জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খ বলে অভিযুক্ত করলাম এবং বললাম যে আমি একই সঙ্গে চারজন মহিলার সঙ্গে প্রেম করছি। শুনে ওঁর চোখ দুটি জলে ভরে উঠলো। বললেন, 'তোমার বয়েস এতো কম, তুমি এমন প্রতিভাবান, অথচ এর মধ্যেই তুমি এতো অসুখী! সত্যিকারের প্রেম যে কি, তা তুমি এখনও জানো না। তাই তুমি তোমার অমর আত্মাটাকে এমন করে কষ্ট দিচ্ছো! একদিন তোমার জীবনে প্রকৃত প্রেম আসবে এবং তখন তুমি যে ঐশ্বর্যের সন্ধান পাবে তা তোমার জন্যে স্বর্গের দরজা খুলে দেবে'। অমন ভুল পথে চালিত হয়েছি বলে সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমাকে উনি চা, নিজের হাতে তৈরি জ্যাম-কেক এবং এক গ্লাস চেরি ব্র্যাণ্ডি দিলেন। আর বেশি দেরি না করে—প্রায় অভ্যেসের বশেই—আমি ওকে চুমু খেতে শুরু করলাম। প্রথম চুমুর পরে ওর সেই অভিব্যক্তি আমি কোনোদিনও ভুলবো না। এক আশ্চর্য আলোয় ওর চোখ দুটো আলোকিত হয়ে উঠলো। আমার কব্জি দুটো আঁকড়ে ধরে উনি বললেন, 'এসব কোরো না! আমার কাছে এসবের গুরুত্ব অনেক'! উনি তখন কাঁপছিলেন, তোতলাচ্ছিলেন, গ্যয়তে থেকে উদ্ধৃতি দেবার চেষ্টা করছিলেন। ওঁর শরীরটা অস্বাভাবিক গরম হয়ে উঠেছিলো। বলতে গেলে আমি ওঁকে ধর্ষণই করলাম, যদিও ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। রাতটা আমি ওঁর বাড়িতেই কাটিয়েছিলাম এবং তখন উনি যে সমস্ত কথা বলেছিলেন তা কেউ যদি লিখে নিতে পারতো, তবে তা একখানা দুর্দান্ত বই হতো। মহিলা অবিলম্বে আমার প্রেমে পড়ে গেলেন—যে প্রেম জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওঁর মধ্যে অটুট ছিলো। আজও আমি আদৌ পবিত্র মানুষটি নই, কিন্তু তখন আমার মধ্যে নীতিবোধের বিন্দু-বিসর্গও ছিলো না। পুরো ব্যাপারটাকেই আমি একটা তামাশা বলে ধরে নিয়েছিলাম।

'উনি প্রতিদিন আমাকে টেলিফোন করতে শুরু করলেন—দিনে তিনবার

করে। কিন্তু ওঁর জন্যে আমার সময় ছিলো না, তাই আমি অসংখ্য ওজুহাত আবিষ্কার করতে লাগলাম। তবে মাঝে মাঝে ওঁর কাছে যেতাম···অধিকাংশই বৃষ্টির রাতে, যখন আমার আর অন্য কারুর কাছে যাবার থাকতো না। আমার যাওয়া মানেই ছিলো, ওঁর ছুটির দিন। সম্ভব হলে আমার জন্যে উনি বিশদ নৈশ-ভোজের ব্যবস্থা করতেন, আমার সম্মানে ফুল কিনতেন এবং নিজে কোনো শৌখিন গাউন বা কিমোনো পরতেন। আমাকে উনি অজস্র উপহার দিতেন। আমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওঁর সঙ্গে জার্মান ধ্রুপদী সাহিত্য পড়বার জন্যে রাজি করাবার চেষ্টা করতেন। আমি সেসমস্ত টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতাম, নির্লজ্জের মতো ওঁর কাছে নিজের সমস্ত পাপকর্মের কথা স্বীকার করতাম—এমন কি যৌবনে আমি যেসব বেশ্যাবাড়িতে গেছি, সেগুলোর কথা পর্যন্ত। কিছু কিছু মহিলা আছেন যাঁদের অনবরত আঘাত করা যায় : ওঁকে আঘাত করার জন্যেও আমার কখনও হাতিয়ারের অভাব ঘটতো না। উনি শান্ত স্বর, স্নিগ্ধ অলঙ্কার আর সুন্দর উক্তি দিয়ে কথা বলতেন বলেই আমি সবকিছুকে খিস্তি-খেউড় করে স্রেফ রাস্তার ভাষা ব্যবহার করতাম। উনি শুধু বলতেন, 'ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করবেন। তিনি তোমাকে প্রতিভা দিয়েছেন, তুমি তাঁর প্রিয়জন'। সত্যি বলতে কি, ওঁকে নষ্ট করা ছিলো অসম্ভব। সঠিকভাবে বলতে গেলে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উনি কুমারীই ছিলেন। ওঁর মধ্যে যে পবিত্রতা আর মানবপ্রেম ছিলো তা কোনোমতেই মুছে ফেলার মতো নয়। উনি প্রত্যেককেই সমর্থন করতেন, এমন কি বিখ্যাত সেমাইট-বিরোধী পিওরিশ-কেভিচকেও। উনি বলতেন, 'বেচারা প্রবঞ্চিত হয়েছে। অনেক আত্মাই অন্ধকারে ডুবে যায়, কারণ তারা কোনোদিনও স্বর্গীয়-আলো দেখার সুযোগ পায়নি'। তখন আমি এসবের অর্থ বুঝতে পারিনি। তবে এটুকু বুঝতাম যে আমি সেন্ট থেরেসার মতো একটি সাধু-রমণীর সঙ্গে শুচ্ছি এবং ওঁর নামটাও ছিলো তাই।

'উনি এতো পবিত্র ছিলেন যে আমি ওঁকে দিয়ে জোর করে যে সমস্ত কাজ করাতাম, সেগুলো ওঁকে ভেঙে চুরমার করে দিতো। আমার কাছে ওঁর লেখা একগাদা চিঠি আছে। চিঠিগুলো চোখের জলে ভেজানো—মিথ্যে নয়, সত্যি-কারের চোখের জল। এমন দিন আসছে যখন কেউই বিশ্বাস করবে না, অমন একজন মহিলা আদৌ কোনোদিনও পৃথিবীতে ছিলেন। এরপর অনেক বছর কেটে গেছে, ওঁর বয়েস আরও বেড়েছে, চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে : কিন্তু তখনও ওঁর মুখখানা তেমনি তরুণ, দু চোখে মায়াময় কল্পনার আবেশ। ওঁকে দেবার মতো

সময় আমার ক্রমশ কমে যাচ্ছিলো। ওদিকে ওয়ারশর ধনী ইহুদি সম্প্রদায় ধীরে ধীরে জার্মান সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিলেন এবং তার ফলস্বরূপ থেরেসার রোজগারও ক্রমশ কমে যাচ্ছিলো। কিন্তু ওঁর সঙ্গে সম্পর্কটা আমি পুরোপুরি কাটিয়ে ফেলতে পারিনি। সর্বদা কেমন যেন মনে হতো: যদি সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়, যদি সবাই আমাকে ত্যাগ করে, তবে ওই থেরেসার ওপরেই আমি নির্ভর করতে পারবো—উনিই হবেই আমার মা, আমার স্ত্রী, আমার রক্ষা-কর্ত্রী। নিজের চরিত্রে উনি তখন এক আশ্চর্য সহনশীলতা গড়ে নিয়েছেন। আমি তখন যা খুশি তাই করতাম, কিন্তু সেজন্যে আমাকে কোনো ওজুহাত দেখাতে হতো না। আমার মতো পরিস্থিতিতে থাকলে মানুষকে নিত্য-নিয়মিত মিথ্যেবাদী হতে হয়। কিন্তু থেরেসাকে আমি সত্যি কথাটাই বলে দিতে পারতাম, তা সে যতো নির্মমই হোক না কেন। শুনে সর্বদা উনি একই জবাব দিতেন। বলতেন: 'আহা বেচারা! তুমি এক মহান শিল্পী!'

'বছরগুলো ইতিমধ্যে তাদের কাজ করে গেছে। থেরেসা কুঁজো হয়েছেন, ওঁর গায়ের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। উনি বাতে ভুগতে শুরু করেছেন, একখানা বেতের লাঠির ওপরে ওঁকে শরীরের ভর রাখতে হয়। নিজের দাক্ষিণ্যে—অবিশ্যি যদি তাকে দাক্ষিণ্য বলা যায়—আমার নিজেরই লজ্জা হতো। কিন্তু তখন ওঁকে সম্পূর্ণ-ভাবে ত্যাগ করার অর্থ: ওঁকে মেরে ফেলা। শেষ শক্তিটুকু দিয়ে উনি তখন আমাকে আঁকড়ে রেখেছিলেন। রাত্রিবেলা বিছানায় উনি আবার তরুণী হয়ে উঠতেন। মাঝে মাঝে অন্ধকারে ওঁর মুখ থেকে বেরুনো কিছু কিছু শব্দ আমাকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে তুলতো। নানান কথার মধ্যে উনি আমাকে এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যে মৃত্যুর পরেও উনি আমার কাছে আসবেন—যদি তা সম্ভব হয়। আমি তোমাকে হতাশ করতে চাইনে: তাই আগে থেকেই তোমাকে বলে রাখছি, সে প্রতিশ্রুতি উনি কোনোদিনও রাখেননি। কিন্তু আমার কাহিনীটা এখান থেকেই সবে শুরু।'

ম্যাক্স পারস্কি ইঙ্গিত করতেই পরিচারিকাটি তৎক্ষণাৎ কাছে এসে হাজির হলো, যেন এতোক্ষণ এই আহ্বানটির জন্যেই ও অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলো। সোহাগী অন্তরঙ্গতায় ম্যাক্স বললো, 'পান্না হেলেনা, আমার কিন্তু খিদে পেতে শুরু করেছে।'

'আপনি যা পছন্দ করেন, আজ আমাদের সেটাই আছে। টমেটোর সুরুয়া।'

'তুমি কি নেবে?' আমাকে জিগেস করলো ম্যাক্স।

'ওই টমেটোর সুরুয়াই।'

'পান্না হেলেনা, তুমি তাহলে তুজনের জন্যেই ওটা আনো।' মেয়েটিকে চোখ টিপলো ম্যাক্স। বুঝতে পারলাম, মেয়েটির সঙ্গে তার একটা গোপন সম্পর্ক আছে—যেমন ছিলো থেরেসা স্টেইনের সঙ্গে। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ম্যাক্স পারঙ্কি একজন সদাশয় ব্যক্তি—তবে টাকা পয়সার ব্যাপারে নয়, প্রেমের ব্যাপারে।

স্কুয়া শেষ করার পর ম্যাক্স একটা সিগারেট ধরিয়ে জিগেস করলো, 'আমি কোথায় থেমেছিলাম যেন? হ্যাঁ, ওঁর তখন বয়েস হয়েছে। তাই ফ্ল্যাট ছেড়ে ওঁকে তখন অন্যদের সঙ্গে একটা বোর্ডিং-হাউসের বাসিন্দা হতে হলো। ব্যাপারটা সত্যিই তুঃখজনক, কিন্তু এ ব্যাপারে আমি ওঁকে কোনো রকম সাহায্য করতে পারিনি। তুমি তো জানো, কোনোদিন আমার একটি কপর্দকও ছিলো না। এমন কি ওঁর জিনিসপত্র গোছগাছ করা এবং ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে আসার ব্যাপারেও আমি ওঁকে কোনো সাহায্য করতে পারিনি। কারণ ওয়ারশতে থেরেসা স্টেইনের একেবারে নিষ্কলঙ্ক সুনাম ছিলো এবং অবশিষ্ট যে কয়েকজনকে ও পড়াতো, সামান্য একটু গুজব রটলে সেগুলোও খোয়া চলে যেতো। সত্যি বলতে কি, থেরেসা বাস্তবে যা করেছেন তা ওঁর পক্ষে করা সম্ভব বলে কেউই বিশ্বাস করতো না। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে ওঁর অপরাধবোধও বাড়ছিলো, তবু লজ্জাজনকভাবে উনি নিজের প্রাপ্যটুকু চাইতেন। যতোদিন ওঁর নিজস্ব ফ্ল্যাট ছিলো ততোদিন আমাদের গোপন সম্পর্কটা বজায় রাখা কঠিন ছিলো না। আমি তখন সর্বদা সন্ধ্যার মুখে ওঁর কাছে যেতাম এবং সঙ্গে একখানা বই নিয়ে যেতে ভুলতাম না, যাতে ভান করা যায় যে আমি ওঁর ছাত্র। কাজেই প্রতিবেশীরা যদি কখনও আমাকে দেখেও থাকে. তারা নিশ্চয়ই থেরেসার প্রেমিক বলে আমাকে সন্দেহ করেনি। কিন্তু বোর্ডিংে অন্য লোকজন থাকতো বলে আমি তখন আর ওঁর কাছে যেতে পারতাম না। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু থেরেসার মতো মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার মতো তা শেষ করে দেওয়াও কঠিন। উনি অনবরত আমাকে ফোন করতেন আর লম্বা লম্বা চিঠি লিখতেন। আমরা তখন অনেক দূরে জেনটাইল স্ট্রীটের বিভিন্ন কাফেতে দেখা করতে শুরু করলাম। যতোবার দেখা করতাম, উনি আমার জন্যে কোনো না কোনো উপহার নিয়ে আসতেন—একখানা বই, একটা টাই, এমন কি রুমাল এবং মোজা পর্যন্ত।

'এই সময় আমি একজন ইহুদি পুরোহিতের এক ভাইঝির সঙ্গে প্রেম চালাচ্ছিলাম। মেয়েটির নাম নিনা। মনে হয় এই নিনার কথা আমি আগেও তোমাকে বলেছি। মেয়েটি ওর পুরুত-কাকার আওতা থেকে পালিয়ে এসে

ওয়ারশতে চিত্রশিল্পী হবার জন্যে চেষ্টা করছিলো। কাকাকে ও অনবরত চিঠি লিখে শাসাতো, তিনি যদি ওকে টাকা-পয়সা পাঠিয়ে সাহায্য না করেন তাহলে ও ধর্মান্তরিত হবে। মেয়েটা ছিলো আধ-পাগলা। সস্তা উপন্যাসে যাকে ঝোড়ো প্রেম বলে, আমাদের প্রেমটাও ছিলো তাই। ও হিংসায় জ্বলতো, সর্বদা সব চাইতে নির্দোষ মেয়েদেরও সন্দেহ করতো এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আত্মহত্যা করতে যেতো। আগে কোনোদিনও আমি কোনো মহিলার গায়ে হাত তুলিনি, কিন্তু নিনার পাগলামো এতোই প্রবল যে দু-ঘা না মেরে ওকে কিছুতেই শান্ত করা যেতো না। নিনা নিজেও কথাটা স্বীকার করতো। ও যখন ওর বন্য অভিনয় শুরু করতো, চুল ছিঁড়তো, হাসতো, কাঁদতো, জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করতো—তখন ওঁর গালে কয়েক ঘা কষে চড় মারা ছাড়া আর কিছু করার থাকতো না। তাতে মন্ত্রের মতো কাজ হতো। চড় খাওয়ার পরেই সাধারণত ও আমাকে চুমু খেতে শুরু করতো। মেয়েদের কিভাবে সামলাতে হয়, আগে আমি তা ভালোমতোই জানতাম। কিন্তু নিনা ওঁর হিংসুটে ব্যবহারে আমাকে নাকাল করে ছাড়তো। অন্য কোনো মেয়েকে আমার সঙ্গে দেখলেই ও একটা মেছুনীর মতো মেয়েটির চুল টেনে, ছিঁড়ে, একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড ঘটাতো। আমার সমস্ত প্রেমিকাকেই ও ভাগিয়ে দিয়েছিলো। ওঁর হাত থেকে রেহাই পাওয়া ছিলো একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। ও সঙ্গে বিষ নিয়ে ঘুরতো। অবশেষে আমি এতোই হতাশ হয়ে পড়ছিলাম যে একখানা নাটক লিখতে শুরু করলাম—পরে সেণ্ট্রাল থিয়েটার ওই নাটকটারই সর্বনাশ করে ছেড়েছিলো।

'একদিন রাত্রিবেলা—সেটা শীতের সময়—কাকার সঙ্গে দেখা করতে নিনাকে বিয়ালাতে যেতে হয়েছিলো। যখনই বাইরে কোথাও যেতে হতো, নিনা আমাকে খবরটা জানাবার জন্যে একেবারে শেষ মুহূর্ত অব্দি অপেক্ষা করতো, যাতে আমি অন্য কারুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করতে না পারি। পাগলরা ভীষণ ধূর্ত হয়। সেদিন সন্ধ্যায় ও যখন জানালো ও চলে যাচ্ছে, আমি তক্ষুণি আমার সব কটি শিকারকে টেলিফোন করতে শুরু করলাম। কিন্তু সেটা ছিলো তেমনি একটা রাত, যখন সবাই হয় ব্যস্ত আর নয়তো অসুস্থ। চারদিকে তখন ভীষণ ইনফ্লুয়েঞ্জা চলছে। এর আগে বেশ কয়েক দিন ধরেই আমি থেরেসাকে কথা দিয়ে আসছিলাম যে খুব শীগগিরি আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করবো। হঠাৎ মনে হলো, এটাই তার সঠিক সুযোগ। টেলিফোন করে জেনটাইল স্ট্রীটের একটা রেস্তোরাঁয় আমি ওঁকে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানালাম। তারপর সেখান থেকে ওঁকে আমার বাড়িতে নিয়ে গেলাম। বেশ কয়েক বছর ধরেই আমরা পরস্পরের

প্রেমিক, কিন্তু প্রতিবারই উনি এমন করতেন যেন উনি একটি ভয়ার্ত কুমারী। রাতে বোর্ডিং-হাউসে ফিরবেন না বলে ওঁকে একটা ওজোর খুঁজে বের করতে হলো। উনি এতো ভয় পেয়ে গেলেন এবং বোর্ডিং হাউসে টেলিফোন করতে গিয়ে এমন তোতলাতে লাগলেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুরু করলেন যে পুরো ব্যাপারটার জন্যে আমার অনুতাপ হতে লাগলো। কোনোদিনই উনি খুব একটা খেতে পারতেন না, তবে সেদিন সন্ধ্যায় ওঁর গলা দিয়ে কিছুই নামলো না। ওঁকে আমার মা মনে করে পরিচারকটি জিগেস করলো, 'আপনার মা কিছু খাচ্ছেন না কেন'? তখন সে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা আমার! খাওয়াদাওয়ার পর উনি বোর্ডিং হাউসে ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু আমি জানতাম, আমি তাতে সায় দিলে উনি ভীষণ দুঃখ পাবেন। তাছাড়া আমি লক্ষ্য করেছি, নিজের রাত্রিবাসটা উনি ব্যাগে করে নিয়ে এসেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, শেষ অব্দি আমি ওঁকে আমার বাড়িতে যাবার জন্যে রাজি করিয়ে ফেললাম। কোনো অল্প বয়সী মেয়েও অতিরিক্ত আদিখ্যেতা দেখালে যথেষ্ট খারাপ লাগে। কিন্তু কোনো বৃদ্ধা যখন একটি ভয়ার্ত কুমারীর মতো আচরণ করেন, তখন তা যেমন হাস্যকর তেমনি করুণ বলে মনে হয়। তিন সারি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার পথে থেরেসা বেশ কয়েক বারই জিরিয়ে নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। আমার জন্যে উনি একটা উপহার নিয়ে এসেছিলেন—পশমের একপ্রস্থ অন্তর্বাস। আমি চা বানালাম, এক গ্লাস কনিয়াক দিয়ে ওঁকে প্রফুল্ল করে তোলার চেষ্টাও করলাম। উনি তা নিলেন না। কিন্তু অনেক দ্বিধা, অনেক ক্ষমাপ্রার্থনা এবং ফাউস্ট ও হাইনের বুখ্ ডেয়ার লিড্যার থেকে অনেক উদ্ধৃতি দেবার পর অবশেষে আমার সঙ্গে শুতে গেলেন। আমি সুনিশ্চিত ছিলাম, ওঁর দেহটার জন্যে আমি এতোটুকুও কামনা অনুভব করবো না। কিন্তু যৌনতা ব্যাপারটাই খামখেয়ালে ভরা। খানিকক্ষণ বাদে আমরা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ততোক্ষণে আমি স্থির করে ফেলেছি, এই রাতটাই আমাদের দুঃখজনক সম্পর্কটার শেষ রাত। এমন কি থেরেসাও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে আর আমরা নিজেদের এমন করে উপহাসের পাত্র করে তুলবো না।

'ক্লান্ত ছিলাম বলে আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিলাম। ঘুম ভাঙলো একটা গা-ছমছমে অনুভূতি নিয়ে। প্রথমটাতে মনেই করতে পারলাম না, আমি কার সঙ্গে বিছানায় শুয়ে ছিলাম। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, নিনার সঙ্গে। হাত বাড়িয়ে আমি ওঁকে স্পর্শ করলাম এবং সেই মুহূর্তেই প্রকৃত সত্যটা জানতে পারলাম : বুঝতে পারলাম, থেরেসা মারা গেছেন। আজ পর্যন্ত আমি জানি না উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কিনা, আমাকে জাগাবার চেষ্টা করেছিলেন কি না…না কি

স্রেফ ঘুমের মধ্যেই মরে গেলেন। আমি বহু বিয়োগান্ত ঘটনা পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু সেই রাতে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিলো তা একেবারে আতঙ্কজনক। প্রথমেই অ্যাম্বুলেন্স ডাকার কথা মনে হলো—কিন্তু তাহলে গোটা ওয়ারশই অবিলম্বে জেনে ফেলবে যে থেরেসা স্টেইন ম্যাক্স পারস্কির বিছানায় মারা গেছেন। স্বয়ং পোপ ক্রোচমালনা স্ট্রীটের কোনো চিলেকোঠায় চুরি করার সময় ধরা পড়লেও তা ওই খবরটার চাইতে বেশি উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারবে না। মানুষ কোনো কিছুকেই ততোটা ভয় পায় না যতোটা ভয় পায় হাস্যাস্পদ হওয়াকে। অর্ধেক ওয়ারশ আমাকে অভিশাপ দেবে, আর বাকি অর্ধেক বিদ্রূপ করবে। বাতিটা জ্বেলে থেরেসার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ভয়ে জমে গেলাম। মনে হলো ওঁর বয়েস ষাট নয়, নব্বুই। ইচ্ছে করছিলো, পৃথিবীর শেষ প্রান্তে ছুটে চলে যাই যাতে কেউ কোনোদিনও জানতে না পারে আমার কি হয়েছিলো। কিন্তু টাকাপয়সা যা ছিলো তা সবই আমি রেস্তোরাঁ আর গাড়ি ভাড়ায় খরচ করে ফেলেছি। বুঝতে পারলাম, আমার সঙ্গে বাড়িতে আসা এবং অতোগুলো সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার ধকলেই ওঁর মৃত্যু হয়েছে। তার মানে, আসলে আমিই ওঁকে খুন করেছি এবং তা করেছি দয়া করতে গিয়ে।

'সব কটা বাতি জ্বেলে, লাশটাকে আমি একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলাম এবং তারপর নিজের বুদ্ধিহীন জীবনটাকে খতম করে দেবার জন্যে একটা পথ খুঁজতে শুরু করলাম। ওঁর কাছাকাছি মরলে সবাই ব্যাপারটাকে জোড়া-আত্মহত্যা বলে মনে করবে। মরে যাবার পরেও কে কি বলবে ভেবে মানুষ মরার আগে লজ্জা পায়। প্রেম নয়, আত্মসম্মান মৃত্যুর চাইতেও বলবান। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনটে বেজে দশ। হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের জন্মের দিনটাকে অভিশম্পাত করছি, এমন সময় দরজার ঘণ্টি বেজে উঠলো। মনে হলো, নির্ঘাৎ পুলিস। সহজেই ওরা আমাকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করতে পারে। আমি দরজা খুললাম না, কিন্তু ঘণ্টিটা ক্রমশ আরও ঘন ঘন এবং আরও জোরে জোরে বাজতে লাগলো। পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, এবারে দরজাটা ভেঙে ফেলা হবে। কে ডাকছে জিগেস না করেই আমি দরজা খুলে দেখি, সামনে নিনা।

'ও ট্রেন ধরতে পারেনি। ট্রেন, থিয়েটার এবং কারুর সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় দেরি করার ব্যাপারে ও একজন বিশেষজ্ঞ। বললো, রাতে আর কোনো ট্রেন না থাকায় ও বাড়িতে চলে গিয়েছিলো। কিন্তু মাঝরাতে আমার সঙ্গে থাকার এক দুরন্ত বাসনা ওকে একেবারে পেয়ে বসে। কিংবা হয়তো ভেবেছিলো, এখানে এসে ও অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে আমাকে হাতে নাতে ধরে ফেলে

মেয়েটির চোখ খুবলে নেবে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, নিনাকে দেখে আমার প্রচণ্ড আনন্দ হলো। এমন পরিস্থিতিতে একটা লাশের সঙ্গে একা থাকাটা এতোই যন্ত্রণাদায়ক যে তার কাছে অন্য সমস্ত দুর্ভোগ ও লজ্জা—সবই ম্লান হয়ে যায়। 'সবকটা আলো জ্বলছে কেন?' জিগেস করলো নিনা। এবং তারপরেই বিছানার দিকে তাকিয়ে ও চিৎকার করে উঠলো, 'ওটিকে লুকিয়ে রেখে কোনো লাভ নেই!' বিছানার দিকে ছুটে গিয়ে ও কম্বলটা টেনে তুলতে যেতেই আমি ওর হাত চেপে ধরলাম, 'নিনা, ওখানে একটা লাশ পড়ে রয়েছে।' আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ও বুঝতে পারলো আমি মিথ্যে কথা বলছি না। ভেবেছিলাম ও প্রচণ্ড চেঁচামেচি করে পাড়া-প্রতিবেশীদের জাগিয়ে দেবে। ছোট্ট একটা নেংটি ইঁদুর বা একটা গুবরে পোকা দেখলেই নিনা ভয়ে দিশেহারা হয়ে যায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে ও একেবারে শান্ত হয়ে গেলো, মনে হলো ওর পাগলামি বুঝি সেরে গেছে। 'একটা লাশ? কার লাশ?' জিগেস করলো নিনা। যখন বললাম ওটা থেরেসা স্টেইন, ও হাসতে শুরু করলো। পাগলের মতো হাসি নয়: কোনো মজার কথা শুনে একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ যেভাবে হাসিতে ফেটে পড়ে, ঠিক তেমনি। আমি বললাম, 'নিনা, এটা রসিকতা নয়। থেরেসা স্টেইন সত্যিই আমার বিছানায় মরে রয়েছেন'।

'নিনা থেরেসা স্টেইনকে চিনতো। ওয়ারশর বুদ্ধিজীবী সবাই ওঁকে চিনতো। তবু ও আমার কথা বিশ্বাস করেনি। শেষ অব্দি আমি থেরেসার পকেট-বইটা খুলে, ওঁর পাসপোর্টটা নিনাকে দেখিয়ে দিলাম। রাশিয়ানদের জমানায় সবাইকেই পাসপোর্ট নিয়ে ঘুরতে হয়, এমন কি মহিলাদেরও।'

আমি ম্যাক্স পারস্কিকে জিগেস করলাম, 'তুমি এ ব্যাপারটা নিয়ে কোনোদিনও কিছু লেখোনি—সেটা কি করে হলো?'

'আসল সত্যটা আজ অব্দি কেউ শোনেনি। এখনও এমন অনেকেই বেঁচে আছে যারা থেরেসা স্টেইনকে চিনতো।'

ম্যাক্স ফের একটা সিগারেট ধরালো। এখন রাত হয়েছে। পেতলের মতো হলদে হয়ে উঠেছে আকাশের চাঁদটা।

'এটাকে নিয়ে একটা দারুণ গল্প লেখা যায়,' আমি বললাম।

'হয়তো আমিও কোনোদিন এটাকে নিয়ে গল্প লিখবো—তবে বুড়ো বয়সে, যখন ওয়ারশর কেউই আর থেরেসা স্টেইনকে মনে রাখবে না। এতো তাড়াতাড়ি নয়। কিন্তু এখন গল্পের বাকি অংশটুকু তোমাকে বলি। নিনা আমাকে সাহায্য

করতে রাজি হয়েছিলো, এমন কি একটা মতলবও ভেবে বের করেছিলো। হয়তো আমরা সাইবেরিয়ায় গিয়ে পচতাম, কিংবা ফাঁসিকাঠে উঠে দাঁড়াতাম। কিন্তু এই সমস্ত সময়ে মানুষ অদ্ভুত সাহসী হয়ে ওঠে। লাশটাকে আমরা পোশাক পরালাম। তারপর ঠিক করলাম বাড়ির দারোয়ানকে বলবো : মহিলাটির পিত্তপাথুরির ব্যথা উঠেছে, আমরা ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। দারোয়ান একটা বুড়ো মাতাল, সদর দরজা খোলার সময় সে কক্ষণো আলো জ্বালে না। রাত্রিবাস ছাড়িয়ে থেরেসাকে ওঁর আঁটসাঁট পোশাক এবং আনুষঙ্গিক জিনিসগুলো পরাতে গিয়ে আমাদের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠলো। ওঁর দেহটা যেন একটা ধ্বংসস্তূপ। পোশাক পরাবার পর আমি ওঁকে তুলে নিয়ে তিন সারি অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে নিচে গিয়ে নামলাম। ওজন তেমন কিছু বেশি নয়, কিন্তু তবু ওঁকে বইতে আমার দম বেরিয়ে যাচ্ছিলো প্রায়। নিনা ওঁর পা দুটো ধরে রেখে আমাকে সাহায্য করেছিলো। ওর মতো একটা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মেয়ে যে কি করে এতো সব করলো তা আজও আমার কাছে একটা মস্তো বড়ো ধাঁধা। অমন স্বাভাবিক—কিংবা হয়তো বলা উচিত অতি-স্বাভাবিক—ও আগে কখনও ছিলো না, পরেও না। সদর দরজার দিকে যাবার অন্ধকার বারান্দাটাতে আমি থেরেসাকে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলাম। ওঁর মাথাটা আমার কাঁধে ঢলে পড়লো এবং মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হলো, উনি বেঁচে রয়েছেন! নিনা দারোয়ানের জানলায় টোকা দিলো এবং আমরা দরজার মৃদু আর্তনাদ ও মাঝরাতে ঘুম থেকে ওঠা একটা মানুষের বিশিষ্ট তর্জন-গর্জন শুনতে পেলাম। লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে ও বিড়বিড় করতে করতে দরজা খুলে দিলো এবং আমি ও নিনা লাশটার বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে, সেটাকে খাড়া অবস্থায় টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এলাম। এমন কি দারোয়ানটাকে আমি কিছু বখশিশও দিলাম। সে আমাদের কোনো প্রশ্ন করেনি, আমরাও তাকে কিছু বলিনি। তখন কোনো পুলিস যদি ওদিক দিয়ে আসতো, তাহলে এখন আমি আর তোমার সঙ্গে এখানে বসে থাকতে পারতাম না। কিন্তু রাস্তাটা ফাঁকাই ছিলো। লাশটা আমরা টানতে টানতে সব চাইতে কাছের মোড়-টাতে নিয়ে গিয়ে, সাবধানে পাশপথে বসিয়ে রাখলাম। পকেট-বইখানা আমি থেরেসার কাছেই রেখে দিলাম। পুরো কাজটা সারতে আমাদের মাত্র কয়েক মিনিটের বেশি সময় লাগেনি। আমার তখন এমন হতবিহ্বল অবস্থা যে এর পরে কি করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। নিনা আমাকে ওর বাড়িতে নিয়ে গেলো।

'একটা প্রাচীন প্রবাদ আছে : নিখুঁত হত্যাকাণ্ড বলে কিছু নেই। সেদিন

রাতে আমরা যা করেছিলাম তাতে নিখুঁত হত্যাকাণ্ডের সমস্ত উপাদানগুলোই ছিলো। আমরা যদি থেরেসাকে গলা টিপে মারতাম, তাহলে পুরো ব্যাপারটা এর চাইতে মসৃণভাবে মিটতো না। এ কথা সত্যি যে হয়তো আমরা ওখানে আঙুলের ছাপ রেখে এসেছিলাম, কিন্তু তখনও ওয়ারশতে আঙুলের ছাপ আবিষ্কার করার পদ্ধতিটা অজ্ঞাত ছিলো। এক বৃদ্ধাকে যে মৃত অবস্থায় রাস্তায় পাওয়া গেছে, তাতে রুশ পুলিসরাও খুব একটা গা করেনি। থেরেসাকে মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। ইহুদিরা যখন জানতে পারলো যে থেরেসা স্টেইনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে তখন তাদের গোষ্ঠী-নেতারা শব ব্যবচ্ছেদ না করেই ওঁর দেহটাকে জেসিয়া স্ট্রীট সমাধিক্ষেত্রের প্রস্তুতি-কক্ষে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। আমি অবিশ্যি এ সমস্ত কথা পরে জানতে পেরেছিলাম। তুমি বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সেদিন রাতে—মানে রাতের অবশিষ্ট অংশটুকুতে—আমি নিনার সঙ্গেই বিছানায় রাত কাটিয়েছিলাম এবং সবকিছু যথারীতি যেমনটি হওয়ার কথা তেমনটিই হয়েছিলো। তখনও আমার স্নায়ুগুলো যথেষ্ট সতেজ ছিলো। আধ-বোতল ভদকাও সেবন করেছিলাম। মানুষের স্নায়ু যে কখন কিভাবে সক্রিয় হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে সত্যিই কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম-কানুন নেই।

'থেরেসার মৃত্যুর বিশদ বিবরণে ওয়ারশ যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলো, তা নিশ্চয়ই তোমাকে বলে দিতে হবে না। আমাদের ইদ্দিশ পত্রিকাগুলো খবরটার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেছিলো। থেরেসা ওঁর বাড়িওলিকে বলেছিলেন যে উনি ওঁর এক অসুস্থ আত্মীয়ের কাছে রাতে থাকবেন। কিন্তু সেই আত্মীয়টি কে? তা কেউ কোনোদিনও জানতে পারেনি। আমাদের দারোয়ানটা পুলিসকে বলতে পারতো' আমরা মাঝরাত্তিরে একটি মহিলাকে বাইরে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু লোকটা ছিলো আধা-অন্ধ এবং খবরের কাগজ সে কোনোদিনও পড়তো না। পকেট-বইটা কাছে পাওয়া গিয়েছিলো বলে অনুমান করে নেওয়া হয়েছিলো, উনি চলতে চলতে স্বাভাবিক কারণেই মরে পড়ে গেছেন। মনে আছে 'টু ডে' পত্রিকায় একজন এই রকম একটা তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন যে থেরেসা স্টেইন গরিব ও অসুস্থ-দের সাহায্য করার জন্যেই তখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। উনি থেরেসাকে পেরেৎসের গল্পের সেই সন্ত পুরুষটির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, যিনি নৈশপ্রার্থনায় না গিয়ে এক অসুস্থ বিধবার চুল্লি জ্বালিয়ে দিতে গিয়েছিলেন।

'আমাদের ওয়ারশর ইহুদিরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। কিন্তু থেরেসা স্টেইনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেভাবে হয়েছিলো তেমনটি আমি আগে কখনও দেখিনি। অসংখ্য ঘোড়ার গাড়ি শবানুগমন করলো। মহিলা ও তরুণীরা এমন

কান্নাকাটি করলো যেন ওটা ইয়ম-কিপ্পুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। থেরেসার সম্পর্কে অনেকে অনেক প্রশংসার কথা বললেন। জার্মান সিনাগগের পুরোহিত ঘোষণা করলেন : থেরেসার সমাধির ওপরে গ্যয়তে, শীলার এবং লেসিঙের আত্মারা অশান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে—তাছাড়াও রয়েছে জুডা হা-লেভি এবং সলোমন ইবন গ্যাব্রিয়েলের আত্মা।

'কিছু গোপন রাখার ব্যাপারে নিনার ক্ষমতা কতো দূর, সে সম্পর্কে আমি খুব একটা নিশ্চিত ছিলাম না। হিস্টিরিয়া আর খোলাখুলি ভয়-দেখানোর ব্যাপারটা প্রায়শই একত্রে চলে। আমার আশঙ্কা ছিলো, প্রথম বার ঝগড়ার পরেই নিনা সোজা পুলিসের কাছে গিয়ে হাজির হবে। কিন্তু ওর মধ্যে একটা সত্যিকারের পরিবর্তন এসেছিলো। সন্দেহ বাতিকে ও আর আমাকে উত্ত্যক্ত করতো না। সত্যি বলতে কি, আমরা আর কোনোদিনও ওই রাতটার কথা আলোচনা করিনি। ওটা আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ গোপন রহস্য হয়ে গিয়েছিলো।

'এর কিছুদিনের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু হয়। তারপর নিনার ক্ষয়রোগ হয়—আসলে ওটা বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই ওর মধ্যে ছিলো। ওর পরিবারের লোকেরা ওকে অটওয়কের একটা স্বাস্থ্যনিবাসে রাখে। আমি প্রায়ই ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। মনে হতো ওর চরিত্রে কি যেন একটা বদলে গেছে। হিস্টিরিয়া ছাড়াবার জন্যে ওকে আর কোনোদিনও চড় মারার প্রয়োজন হয়নি। ১৯১৮ সালে ও মারা যায়।'

আমি জিগেস করলাম, 'ও কোনোদিন তোমার সামনে আসার চেষ্টা করেনি?'

'তুমি কার কথা বলতে চাইছো? নিনা, না থেরেসা? দুজনেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, কিন্তু কেউই কথা রাখেনি। আত্মা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকলেও আমি বিশ্বাস করি না, তারা কিছু বলার জন্যে ওই জগৎ থেকে এখানে আসার কথা চিন্তা করে। আমি সত্যিই মনে করি, মৃত্যুই আমাদের সমস্ত অর্থহীনতার পরিসমাপ্তি।

'একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমার কাহিনীটার সঙ্গে এর সত্যিকারের কোনো সম্পর্ক নেই, তবে ব্যাপারটা কৌতূহলজনক। নিনা চিরটা কাল ওর কাকা—বিয়ালার সেই পুরুত ঠাকুরটিকে—ধর্মান্তরিত হবার ভয় দেখিয়ে এসেছে। নিজের পরিবারের কেউ অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে, এটা পুরুত ঠাকুরটির কাছে ভীষণ ভয়ের ব্যাপার ছিলো এবং তাই নিনাকে উনি টাকা পাঠাতেন। কিন্তু নিনার মৃত্যুর পর ওকে সমাধিস্থ করার জন্যে যখন কাগজপত্রের দরকার

হলো, তখন দেখা গেলো বেশ কয়েক বছর আগেই নিনা ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেছে। এতে হাসিদ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ওয়ারশ তখন জার্মানদের অধিকারে। কর্তৃপক্ষকে ঘুষ দিয়ে নিনাকে ইহুদিদের সমাধিক্ষেত্রেই কবর দেওয়া হয়। বস্তুত প্রথম সারিতেই যেখানে ও শুয়ে রয়েছে, সেখান থেকে থেরেসা স্টেইনের শেষশয্যা খুব একটা দূরে নয়। নিনা কেন অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছিলো তা আমি কোনোদিনও জানতে পারবো না। অথচ ও প্রায়ই ইহুদিদের ঈশ্বরের কথা বলতো, ওর পবিত্র পুর্বপুরুষদের কথা উল্লেখ করতো।'

ম্যাক্স পারস্কি চুপ করলো। রাতটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। দরজার ওপরে আলোটাকে ঘিরে মাছি, মথ, প্রজাপতি এবং অন্যান্য সমস্ত রকমের পতঙ্গরা গ্রীষ্ম-রাতের বাঁধনহারা উৎসবে মেতে উঠেছে। নিজের ঠোঁটে ঝুলে থাকা কথাটাতে সায় দিয়ে মাথা নাড়লো ম্যাক্স পারস্কি। বললো, 'ভালোবাসায় অনুগ্রহের কোনো স্থান নেই। সেখানে তোমাকে স্বার্থপর হতে হবে—নইলে তুমি নিজেকে এবং তোমার প্রেমিকাকেও শেষ করে ফেলবে।'

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে ম্যাক্স পারস্কি পরিচারিকাটির দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের কাছে ছুটে এলো মেয়েটি, 'আরও কফি দেবো?'

'হ্যাঁ, হেলেনা। আচ্ছা, আজ কতো রাত অব্দি তুমি এখানে কাজ করবে?'

'রোজই বারোটার সময় আমাদের দোকান বন্ধ হয়।'

'ঠিক আছে, আমি বাইরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।'

ইংরেজ অফিসার

আলবার্তো মোরাভিয়া

আধুনিক ইতালিয় সাহিত্যের অন্যতম রূপকার আলবার্তো মোরাভিয়ার জন্ম ১৯০৭ সালে—জন্মস্থান রোম। ১৯২৫ সালে প্রথম উপন্যাসটি রচনার সময় তিনি তুরিনের ছুটি পত্রিকার লণ্ডন, পারী এবং অন্যান্য স্থানের বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তী ফ্যাসিস্ট যুগে তাঁর সমস্ত লেখা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হওয়ায় তাঁকে ছদ্মনামে লেখা চালিয়ে যেতে হয়। ১৯৪৪ সালের মে মাস অব্দি ইতালির পাহাড়ে-জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে এই বিদ্রোহী লেখককে। দ্য উওম্যান অফ রোম, টু উওমেন, আ গোস্ট অ্যাট ম্যুন—ইত্যাদি সার্থক উপন্যাসের স্রষ্টা আলবার্তো মোরাভিয়া ছোটো গল্পও লিখেছেন অনেক।

গাড়িটা ওকেই অনুসরণ করছে, না কি অন্য কোনো কারণে নেহাতই গতি শ্লথ করেছে, দেখার জন্যে দোকানটার সামনে থেমে দাঁড়ালো মেয়েটি। কাদা-মাখা ছোট্ট একটা ফৌজি গাড়ি, চালকের আসনে একা শুধু একজন অফিসার। দোকানের সামনে এসে গতি কমাতে কমাতে প্রায় থেমে গেলো গাড়িটা। মেয়েটি নিজেকে প্রশ্ন করলো, আমন্ত্রণ পেলে ও তাতে রাজি হবে কি না এবং ঠিক করলো, হবে না। অন্তত টুপি আর পোশাকের ছোটোখাটো দোকানে ভর্তি এই রাস্তাটা, যেখানে ও সুপরিচিতা, সেখানে তো নয়ই। গাড়ির দিকে পেছন ফিরে দোকানের জানলায় একটা রেশমী রুমালের দিকে তাকিয়ে রইলো ও—রুমালটার জন্যে ভীষণ লোভ হওয়ায় মাত্র কয়েকদিন আগেই ও সেটার দাম জেনে গিয়েছিলো। শব্দ শুনে বুঝলো, গাড়িটা ওর পেছনে শান-বাঁধানো পথের কিনারা ধরে এগিয়ে এসে সামনের দিকে চলে গেলো। লালসার বস্তুটির দিকে সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কাঁধ দুটো সামান্য ঝাঁকালো মেয়েটি, যেন বিদায় জানালো রেশমী রুমালটাকে। যে রুমালটা পাবার জন্যে ওর এতো তীব্র আকাঙ্ক্ষা অথচ অর্থের স্বল্পতার জন্যে যেটা ওর নাগালের এতো বাইরে, সেটার দিকে তাকিয়ে এক ধরনের উদাসী এবং মুগ্ধ আনন্দ উপভোগ করার পর ওর মন আবার সেই গাড়িটার দিকে ফিরে গেলো, যেটাকে ও অমন নিবিড় অবজ্ঞায় চলে যেতে দিয়েছে। অথচ ওই

রুমালটার কথা মনে রেখেই ও ওই অফিসারটিকে দু-তিনটি স্পষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি উপহার দিয়ে সাহস যুগিয়েছিলো। তাছাড়া আজ ও মোটামুটি এমনি একটা উদ্দেশ্য নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলো যে, এবারে ও এমন একজনকে খুঁজে নেবে যে ওকে রুমালটা কিনে দিতে পারবে। উদ্দেশ্য এবং চরিত্রের এই বৈপরীত্য ওকে রাগিয়ে তুললো। অন্তত একবারের জন্যে হলেও, কেন ও সত্যিকারের সঙ্গতিময় হয়ে উঠতে পারে না? এখন থেকে ও যখন এই পেশাটাকেই অবলম্বন করেছে, তখন কেন ও চিরদিনের মতো বিবেকের তাড়না আর আকস্মিক মর্যাদা-বোধকে বিসর্জন দেবার জন্যে মনস্থির করতে পারে না?

বিষাদী মনে মেয়েটি রুমালটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে, এক পাশে জরিদার রেশমী পোশাক রাখা একটা জানলার আরশিতে মুহূর্তের জন্যে নিজের দিকে এক ঝলক তাকালো। বাতাস ওর দীর্ঘ চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিয়েছে, গুঁড়ো গুঁড়ো চুলগুলো উড়ে উড়ে লুটিয়ে পড়ছে ওর কপাল আর বড়ো করে খুলে রাখা হাসি-ছলোছল চোখ দুটিতে। ঠাণ্ডার তীক্ষ্ণ কামড় আর অপরূপ শীতের দিন মেয়েটির মুখখানিকে কঠোর করে তুলেছে। প্রসাধনের রঙীন প্রলেপের নিচে ওর মুখখানা ফ্যাকাশে ও রক্তহীন। অথচ সেই তুলনায় ঠোঁট দুটি আরক্ত ও পুরুষ্টু। ওর মাথায় টুপি নেই, বাদামী রঙের কোটটার কলার ওলটানো, কোমরে শক্ত করে আঁটা কটিবন্ধ। যাই হোক মেয়েটি ভাবলো, ওকে নিশ্চয়ই ওই বীভৎস মেয়েগুলোর মতো লাগছে না—যাদের ফৌজি লোকগুলোর হাতে হাত জড়িয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। আচমকা এক অপ্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলো ও—ভাবলো, হঠাৎ করে মিলে যাওয়া কোনো আলটপকা লোকের কাছে ও নিজেকে বিলিয়ে দেবে না। ভাবনাটাকে নিজের কাছে চরম ও অভঙ্গুর বলেই মনে হলো ওর এবং এই সিদ্ধান্তটা যেন ওর স্বাভাবিক বেপরোয়া মনোভাব ও অসার মানসিক প্রশান্তিকে ফিরিয়ে আনলো আবার। এইভাবে শান্ত হয়ে নিজেকে দেখার জন্যে ও আরও খানিকক্ষণ আরশিটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো, পরিপাটি করে নিলো অবাধ্য চুলগুলোকে।

রাস্তাটা একটা ঢালু জায়গায়—শহরের মুখোমুখি একটা চৌরঙ্গীর দিকে উঠে গেছে। চৌরঙ্গীর মাঝখানে ওপরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে উঠে যাওয়া একটা চৌকো মিনার। আরশি থেকে চোখ সরিয়ে নিলো মেয়েটি। তারপর রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলো, গাড়িটা মিনারের নিচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—যাতে ও কি করছে না করছে অফিসারটি সে দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে এবং ও যদি চৌরঙ্গীর দিকে না এগোয় তাহলে সে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ফের ওকে অনুসরণ করতে পারে।

'লোকটা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, আমাকে ও রুমালটা কিনে দেবে,' খুশিভরা হালকা মনে ভাবলো মেয়েটি—যেন যতোক্ষণ ও আরশির দিকে তাকিয়েছিলো, ততোক্ষণ এ সুযোগটা বৃথা চলে যেতে দেবার জন্যে কষ্ট পাচ্ছিলো ওর মনটা। কোনো কিছু চিন্তা না করে এগিয়ে গিয়ে দোকানের দরজাটা খুললো মেয়েটি, ওর পূর্ব-পরিচিতা দোকানী-মহিলাকে ডেকে বললো, পরদিন সকাল পর্যন্ত রুমালটা উনি যেন আলাদা করে রেখে দেন। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললো মিনারটার দিকে।

কিন্তু এগিয়ে যাবার পথেই মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে নেওয়া সিদ্ধান্তটা আচমকা ওর মনে পড়ে যায়—ঠোঁট কামড়ে রাগত ভঙ্গিমায় মাথায় ঝাঁকুনি তোলে মেয়েটি। এই তাহলে ওর সিদ্ধান্তের দাম! নিজের প্রতি এক নিদারুণ বিরক্তি অনুভব করে ও, তবু পেছনে ফিরে যাবার কথা ভাবে না। ন্যায্যতা প্রমাণের জন্যে এই ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করে যে তাতে কোনো লাভ হতো না: লোকটা ওকে ঠিকই ধরে ফেলতো। কিন্তু ও ঠিক করলো, লোকটার দিকে না তাকিয়ে ও তার পাশ কাটিয়ে চলে যাবে এবং সে যদি ওর কাছে এসে যেচে আলাপ জমাতে চায় তাহলে এমনভাবে জবাব দেবে যাতে ওর সম্ভ্রান্ততা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ না থাকে।

চৌরঙ্গীর চত্বরটাতে পৌঁছে ও ফৌজি গাড়িটার সামনে দিয়ে চোখ নিচু করে সোজা পাঁচিলটার দিকে চলে গেলো, যেখান থেকে গোটা শহরটার দৃশ্য উপভোগ করা যায়। ও ভালো করেই জানতো, এখানে দাঁড়িয়ে এমন একটা অতি-পরিচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য মন দিয়ে দেখার অর্থ—অফিসারটিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসা। কিন্তু সবকিছু চিন্তা করে দেখলো, তাতে কোনো দোষ নেই। কারণ শুধুমাত্র আলাপিতা হওয়া, এমন কি কথার জবাব দেবার সঙ্গেও, অন্য ব্যাপারগুলোর দুস্তর ব্যবধান। পাঁচিলের ওপরে কনুই রেখে, চুলে বিলি কাটতে কাটতে তাই নিচের দিকে তাকিয়ে রইলো ও।

ও যেমনটি ভেবেছিলো, অফিসারটি ঠিক তেমনি গাড়ি থেকে নেমে ওর পাশে এসে, পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। চোখের কোণ দিয়ে লোকটাকে লক্ষ্য করলো মেয়েটি। খুবই কম বয়েস, ওর চাইতেও কম। মুখটা রক্তিম, গোলাকার, খানিকটা কঠোর—হালকা নীল রঙের ছোটো ছোটো চোখ দুটি গভীরে বসানো। ছুঁচলো স্তম্ভগুলোর ওপরে হাত রেখে এক ধরনের মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে দূরের বাড়ি-গুলোর ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলো মানুষটা—যেন এমনটি দেখবে বলে সে আশা করেনি। লোকটা ওর দিকে তাকাতে পারে এবং চোখে চোখ পড়লে তার ফল-স্বরূপ বাকবিনিময়সহ আলাপও হয়ে যেতে পারে ভেবে বেহায়ার মতো তার দিকে

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মেয়েটি। কিন্তু অফিসারটি যেন মুখ ঘোরাবে কিনা, সে বিষয়ে মনস্থির করে উঠতে পারছিলো না। ও যে নিজে থেকেই আলাপিতা হতে চায় সেটা এতো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে যতোই সময় কাটতে লাগলো ততোই নিজের ওপরে রেগে উঠতে লাগলো মেয়েটি। এ ধরনের সাক্ষাৎ-কারের প্রথম পর্যায়টা সব সময়েই ওর স্নায়ুর ওপরে চাপ সৃষ্টি করে, আলাপ শুরুর সূচনায় পুরুষমানুষটির কণ্ঠস্বর ক্ষিপ্ত করে তোলে ওকে। কিন্তু এবারে ও অনুভব করলো, এক্ষেত্রে ও যদি প্রথম পদক্ষেপটা না নেয় তবে কোনোদিনই কিছু হবে না। তাই দুর্বার ক্রোধে উন্মাদ হয়ে মানুষটার নৈর্ব্যক্তিক নিস্তব্ধ মুখখানার দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকালো ও, আচমকা জিগেস করে বসলো, 'দিনটা চমৎকার, তাই না?'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালো অফিসারটি। গভীর প্রত্যয়ে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, সত্যিই চমৎকার।'

কোমল আর অমায়িক কণ্ঠস্বর লোকটার। তারপর আবার নৈঃশব্দ্য। 'আমি আর ওর সঙ্গে কথা বলবো না,' বিরক্তি-দেখানো মুখ করে ভাবলো মেয়েটি। 'আর একটা মিনিট এখানে থাকবো, তারপর চলে যাবো।'

স্পষ্টতই অফিসারটি নিজের সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলার জন্যে লড়াই করছিলো। অবশেষে এসব ক্ষেত্রে যথারীতি যেমন হয়ে থাকে, গাড়িটার দিকে দেখিয়ে সে জিগেস করলো, 'আমরা কি গাড়িতে উঠবো?'

আমন্ত্রণ পেয়ে মেয়েটির মনে হলো, ওর পা দুটো যেন নিজেদের ইচ্ছেতেই গাড়িটার দিকে এগিয়ে যাবে। রাগ বেড়ে উঠলো ওর।

'কেন?' লোকটার দিকে তাকিয়ে অপ্রীতিকর হাসি ছড়ালো ও।

'যাতে আমরা একত্র হতে পারি,' অফিসারটি খোলাখুলি জবাব দিলো।

'কিন্তু আমরা একত্র হবো কেন?'

মেয়েটি অনুভব করলো, রাস্তায় সন্দেহজনক মতলবে কোনো অপরিচিত লোক কোনো মহিলার গতিরোধ করলে, সেই মহিলাটি যেমন স্থির প্রত্যয়ে লোকটার ভুল বুঝিয়ে দেন, ওরও ঠিক তাই করা উচিত।

যুবকটিকে অপ্রতিভ দেখাচ্ছিলো। বললো, 'কথা বলার জন্যে।' তারপর বুদ্ধি করে জুড়ে দিলো, 'আমরা কোনো কাফেতেও যেতে পারি।'

'আমি কখনও কাফেটাফেতে যাই না।'

'কেন?'

'কারণ,' আভিজাত্যের হাসির সঙ্গে জোর দিয়ে দিয়ে মেয়েটি উচ্চারণ করলো,

'কাফেটাফেতে যাওয়া আমার অভ্যেস নয়—স্রেফ তাই।'

'ও,' অফিসারটি বললো, যেন ওই কথাগুলোতেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। তারপর আবার গাড়িটার দিকে দেখিয়ে বললো, 'তাহলে গাড়িতে চেপে একটু ঘুরে আসা যাক।'

'কিন্তু আমি যাদের চিনি না, তাদের সঙ্গে গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়ানোও আমার অভ্যেস নয়।'

মেয়েটি দেখলো, লোকটার চুলের গোড়া অব্দি লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

'আমার নাম ক্রস,' লোকটা বললো, 'গিলবার্ট ক্রস। আর আপনার?'

'আপনার কাছে আমার কোনো নাম নেই,' জবাবে নিজেকে গুটিয়ে নিলো মেয়েটি।

তারপর মুহূর্তের নীরবতা।

অফিসারটি-ফের চেষ্টা চালাতে শুরু করলো, 'আপনি আমার সম্পর্কে আজে-বাজে ভাবছেন। কিন্তু আপনার কাছ থেকে আমি কি চাই, তা আপনি জানেন না।'

'ভালো করেই জানি,' মেয়েটি ফুঁসে উঠলো। 'কয়েক ঘণ্টা ফুর্তি লোটার জন্যে আপনি আমাকে মজুরী দিতে চান, তাই নয় কি?'

মেয়েটি লক্ষ্য করলো, কোনো জবাব না দিয়ে লোকটা আবার লাল হয়ে উঠেছে। হুল ফোটানোর স্বরে ও বলে চললো, 'আপনি আমাকে কতো দিতে চান, তাও জানি।…দুই বা তিন হাজার লিরা, কিংবা হয়তো আরও বেশি। ঠিক বলিনি?'

অফিসারটি রসিকতা করার চেষ্টা করলো, 'দরটা আপনি যখন এতো ভালো করেই জানেন…'

'জানি বইকি!…হ্যাঁ, যা বলছিলাম আপনার বন্ধুবান্ধবরা, মানে ফৌজি লোকেরা কিন্তু সাধারণত আপনার চাইতে বেশি চালু হয়। অতো ভনিতা না করে, তারা চট করে দরটা বলে দেয়।'

'আমার সঙ্গী-সাথীরা আমার মতো লাজুক নয়।'

'হ্যাঁ, তারপর…' মেয়েটি বলতে থাকে, 'আপনি আমাকে দু-এক প্যাকেট সিগারেট দিতে চাইবেন।'

'ওহো! সিগারেট…হ্যাঁ, নিশ্চয়ই…' অফিসারটি মৃদু হাসার চেষ্টা করে।

'আর চাইলে পরে কয়েক টিন খাবারও দেবেন হয়তো?'

মেয়েটি দেখলো, লোকটা মাথা নেড়ে নেড়ে মৃদু হাসছে। তারপর একটা হাত

এগিয়ে দিয়ে খানিকটা সচেষ্ট প্রয়াসে সে বললো, 'আমি দেখছি ভুল করেছিলাম। ...দয়া করে মাফ করে দেবেন।

মেয়েটি দেখলো, লোকটা বিদায় নিতে চলেছে। ও যে ধরনের মেয়ে নয়, লোকটা ওকে সেই ধরনের মেয়ে বলেই ধরে নিয়েছে এবং এতো রাজ্যের ঝামেলার পর ও আবার সেই নিঃসঙ্গ হতে চলেছে— ভেবে প্রায় আতঙ্কিত হয়ে উঠলো মেয়েটি। ওর বোকামো আর বিরক্তি উধাও হয়ে গেলো তখনই।

'না,' মেয়েটি এতো দ্রুত বলে উঠলো যে কথাটা ওর নিজের কানেই হাস্যকর শোনালো। 'না, আপনি ভুল করেননি।'

'ভুল করিনি ?'

'আমি তাই বলেছি,' মেয়েটি অধীর হয়ে উঠলো। দেখলো, লোকটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে—কিন্তু এবারে সেটা আর বিব্রত হবার জন্যে হয়েছে বলে মনে হলো না।

'তাহলে কি আমরা যাবো ?'

'চলুন।'

ওরা গাড়িটার কাছে এগিয়ে গেলো। ওকে উঠতে সাহায্য করে এক লাফে ওর পাশে উঠে গাড়ি চালিয়ে দিলো অফিসারটি।

'কোথায় ?'

'আমি যেখানে থাকি,' মেয়েটি সহজ করে বললো। 'আমি পথ দেখিয়ে দেবো।'

চৌকো মিনারটাকে পাক দিয়ে গাছপালার নিচু শাখা-প্রশাখার তলা দিয়ে ওরা দ্রুত বাগানের দিকে এগিয়ে চললো। দিনটা সত্যিই সুন্দর, যতোদূর চোখ যায় রাস্তাঘাট পথচারীদের ভিড়ে বোঝাই। কাদামাখা ফৌজি গাড়ি হলেও, সমস্ত পথচারীদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে অহেতুক আত্মশ্লাঘার অনুভূতি চেপে রাখতে পারছিলো না মেয়েটি। ও যখন রাজি হবে বলেই মনস্থির করে ফেলেছিলো, তখন কেন যে অফিসারটির সঙ্গে অমন খারাপ ব্যবহার করলো—এখন ও তাই ভাবছিলো। রাগও হচ্ছিলো, আবার যেটা ওর করা উচিত হয়নি সেটাই করেছে বলে অস্পষ্টভাবে খুশিও হচ্ছিলো একই সঙ্গে।

অফিসারটি ভদ্রভাবে মেয়েটির নির্দেশ অনুযায়ী বাগানের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এসে, দুধারে গাছ-বসানো একটা চওড়া রাস্তা ধরে এগুতে লাগলো। গাড়ির গতি এবং দুরন্ত বাতাসে মেয়েটির এলোমেলো চুল দেখে বাসনার তাগিদ অনুভব করছিলো সে—যা শীগগিরি মিটবে বলে এখন সে নিশ্চিত। ওদিকে লজ্জা

এবং আদিম পরিতৃপ্তি—দুইই অনুভব করছিলো মেয়েটি।…ইতিমধ্যে ওরা একটা দারিদ্রপীড়িত অঞ্চলে এসে পৌঁছেছিলো, রিক্ত প্লেন গাছগুলোর দীর্ঘ শাখার আড়ালে এখানে শুধু ভীড়াক্রান্ত জানলার সারি।

'এদিকে,' পাশের একটা রাস্তার দিকে দেখালো মেয়েটি।

ট্রাম লাইনের ওপর দিয়ে দক্ষতার সঙ্গে মোড় ঘুরিয়ে নির্দিষ্ট রাস্তায় গাড়ি ঢোকালো অফিসারটি।

'এ দিক দিয়ে…ডাইনে…বাঁয়ে,' মলিন রাস্তাগুলোর মোড়ে মোড়ে নির্দেশ দিতে লাগলো মেয়েটি, অফিসারটিও মন দিয়ে প্রতিটি নতুন নির্দেশ মেনে নিয়ে গাড়ির পথ বদলে নিতে লাগলো। 'এই যে, এসে গেছি,' অবশেষে বললো মেয়েটি এবং গাড়িটাও থেমে দাঁড়ালো।

ওদের মুখোমুখি লতায় ছাওয়া একটা দরজা। বাগানটাতে গাছগাছালির ভিড় যেন বড্ড বেশি। সরু একটা পথ ম্যাটমেটে বাদামী রঙের বাড়িটার দিকে চলে গেছে! বাড়িটাকে নেহাতই ছোট্ট আর সাধারণ বলে মনে হয়। সামনের দিকে চারটে জানলা।

'ইচ্ছে হলে গাড়িটা আপনি বাগানেই রাখতে পারেন।'

ঘাড় নেড়ে ফের গাড়ি চালু করলো অফিসারটি। মেয়েটি দরজার একটা পাল্লা খুলে, খানিকটা চেষ্টা করে অন্য পাল্লাটাও খুলে ফেললো। ভাবলো, 'আমার ইচ্ছে গাড়িটা ও বাগানেই রাখুক। কারণ গাড়িটা বাইরে থাকবে ভাবতেও আমার সত্যি কেমন যেন লজ্জা আর অস্বস্তি হচ্ছে।' দরজার সামনে উঁচু বারান্দাটার এক পাশে একটা শান-বাঁধানো জায়গা, তাতে অনায়াসে একটা গাড়ি রাখা যায়। কিন্তু অন্য দিকে, রাস্তার কাছে, বাড়ির দেয়াল আর পাঁচিলের মাঝখানে প্রাচীন আইভিতে ছাওয়া একফালি সবুজ জমি আর তার নিচের দিকে সরু তারের জাল দেওয়া ছোট্ট একটা খুপরি। মেয়েটি এখানে তিনটে মুরগী আর একটা মোরগ রাখে। অফিসারটি যতোক্ষণে তার গাড়ি ওই সীমায়িত জায়গাটাতে রাখবে, ততোক্ষণ সময় কাটাবার জন্যে ওই খুপরিটা একবার দেখতে গেলো মেয়েটি। মোরগটা হলদেটে সাদা রঙের, মাথায় লাল ঝুঁটি। মুরগীগুলো কালো—ঝরা পাতা আর ছোটোখাটো ঝোপগুলোর ভেতর থেকে ওদের আলাদা করে চিনে নেওয়া শক্ত। 'আমি দরজার সামনে এমন করে চাকরবাকরের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না,' মেয়েটি ভাবলো। 'তার চাইতে বরং মুরগীগুলোকে খেতে দিই। লোকটা এসে আমাকে অমন ঘরোয়াভাবে দেখলে, আমার সম্পর্কে ওর একটা ভালো ধারণা হবে।' অফিসারটিকে সময় দেবার জন্যে খাবারের পাত্রটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে

দানাগুলো ছড়াতে শুরু করলো ও। শব্দ শুনে বুঝলো, গাড়িটা গর্জন তুলে ভেতরে ঢুকে আচমকা থেমে গেলো। তবু ফিরে তাকালো না মেয়েটি। মুরগী তিনটে লোভীর মতো দানাগুলোকে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিলো। ও ভাবলো : পরনে সুন্দর পোশাক, হাতে খাবারের পাত্র, পায়ের কাছে মুরগী—ওকে নিশ্চয়ই একটা সুন্দর ছবির মতো লাগছে। দরজা বন্ধ করার মৃদু আওয়াজ পেয়েও দানা ছড়াতে লাগলো ও। মোরগটাকে ক্ষুধার্ত বলে মনে হচ্ছিলো না, এক পাশে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝেই ঠোঁট দিয়ে শুধু পায়ের পেছন দিকটা খুঁটছিলো। খুপরিতে ঢুকে মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেলো লোকটা, 'সদর দরজাটা আমি বন্ধ করে এসেছি।'

'মুরগী আপনার ভালো লাগে ?' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জিগেস করলো মেয়েটি।

'সত্যি কথা বলতে কি, পছন্দ করি না,' মৃদু হেসে জবাব দিলো লোকটা।

'মুরগী ডিম পাড়ে,' আকর্ষণীয় এবং গভীর অর্থবহ ভঙ্গিতে বললো মেয়েটি। যেন বোঝাতে চাইলো, 'আমি গরীব। আজকালকার দিনে যেসব মুরগী ডিম পাড়ে সেগুলোর দাম আছে।'

মোরগটা এক পাশে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো—আচমকা যেন অন্যমনস্কভাবে এগিয়ে গিয়ে, সেটা ফুলে ফেঁপে থাকা একটা বিশেষ গম্ভীর ধরনের মুরগীর পিঠে লাফিয়ে উঠলো। মুরগীটা উবু হয়ে বসে রইলো, ছাড়া পাবার কোনো চেষ্টাই করলো না। মোরগটা ঠোঁট দিয়ে হিংস্রভাবে মুরগীটার ঝুঁটি চেপে ধরলো, খানিকক্ষণ ছটফট করলো মুরগীটার পিঠের ওপরে বসে। তারপর নেমে এসে ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে অবশিষ্ট দানাগুলোকে খুঁটে খুঁটে খেতে শুরু করলো। মুরগীটা তখন ডানায় ঝাঁকুনি তুলে পালকগুলোকে ঝেড়ে নিলো, তারপর আগের চাইতে আরও গম্ভীর ও অহঙ্কারী ভঙ্গিমায় মোরগটার পাশাপাশি গিয়ে দানা খুঁটতে শুরু করলো।

'ওরা ভালোবাসাবাসিও করে,' লাজুক হাসি ছড়ালো অফিসারটি।

মন্তব্যটা বদ রুচির পরিচয় বলে মনে হলো মেয়েটির, কোনো জবাব দিলো না ও। এক মুহূর্ত পরে খানিকটা উদাস ভঙ্গিতে জিগেস করলো, 'এবারে আমরা যাবো কি ?'

মুরগীর খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে, পাঁচিলের পাশ দিয়ে ভেতরে যাবার দরজার দিকে এগুলো ওরা। কাদামাখা গাড়িটা দাঁড়িয়ে রইলো বারান্দার সামনে।

'আপনি কি সীমান্ত থেকে আসছেন ?' গাড়িটা দেখিয়ে প্রশ্ন করলো মেয়েটি।

'হ্যাঁ।'

'সেখানে কি লড়াই চলছে?' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হাসি মুখে জানতে চাইলো ও, কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই অখুশী হলো। অথচ কেন—তা ও জানে না।

'হ্যাঁ, ওরা যুদ্ধ করছে,' বিরক্ত হয়ে জবাব দেয় অফিসারটি।

মেয়েটি পয়সা রাখার ব্যাগ থেকে চাবি বের করে, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। ওকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকে মাথা থেকে টুপি খুলে নিলো অফিসারটি। ওদের সামনে নোংরা এক সারি ঠাণ্ডা সিঁড়ি, তাতে প্রাচীন যুগের লোহার বেষ্টনী।

'আমি দোতলায় থাকি, তিনতলায় অন্য লোক থাকে,' আগে যেতে যেতে মেয়েটি বললো। অফিসারটি কোনো জবাব দিলো না।

দোতলায় উঠে চাবি খুলে মানুষটাকে ভেতরে ঢোকালো মেয়েটি, দরজায় চাবি লাগিয়ে চাবিটা তালার গায়েই ঝুলিয়ে রাখলো, তারপর অফিসারটির হাত থেকে টুপিটা নিয়ে আলনায় রাখলো। গা থেকে হাতাবিহীন কোটটা খুলে, টুপির নিচে সেটাকে ঝুলিয়ে রাখলো অফিসারটি। চকচকে কাঠ আর ধাতু দিয়ে তৈরি পোশাকের আলনাটা সরু একটা বারান্দায় রয়েছে, দুধারে নোংরা অন্ধকার দেয়াল। ছোটোখাটো চৌকো মাপের বৈঠকখানা ঘরটাতে গিয়ে ঢুকলো ওরা। বারান্দার মতো এ ঘরের দেয়ালগুলোও ম্যাড়মেড়ে রঙের। আসবাবপত্রের মধ্যে একটা ডিভান আর কাচ ও নিকেলে তৈরি একটা টেবিলকে ঘিরে দুখানা আরাম-কুর্সি। এক কোণে টুলের ওপরে একটা রেডিও। জানলার কাছে গিয়ে পর্দা তুলে দিলো মেয়েটি, কিন্তু খুব একটা আলো ভেতরে ঢুকলো না। জানলাগুলো বড়োসড়ো, তাতে নীল পর্দা—যার ভেতর দিয়ে বিশাল একটা গাছের কঙ্কালসার ডালপালাগুলো দেখা যায়। চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলো অফিসারটি, ঠাণ্ডা নীল ঢাকনা পরানো শক্ত ডিভানটাতে বসতে ইতস্তত করছিলো সে।

'বোসো, বোসো,' উত্তাপহীন ঘনিষ্ঠতায় 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে চলে এলো মেয়েটি। অফিসারটি বসলো এবং মেয়েটি তার নাগালের মধ্যে আসতেই, হয়তো ওর সম্বোধনের ঘনিষ্ঠতায় সাহসী হয়েই, সামনের দিকে ঝুঁকে ওর একখানা হাত ধরার চেষ্টা করলো।

'না, না…এক মিনিট একটু দাঁড়াও,' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো মেয়েটি, তারপর বারান্দার শেষপ্রান্তে গিয়ে অন্তর্গৃহ আলাপনীর গ্রাহযন্ত্রটা তুলে ধরলো। প্রায় তক্ষুণি ও শুনতে পেলো ওর মা জিগেস করছেন, ও ফিরেছে কি না। 'কথা যখন বলছি, তখন ফিরেছি বই কি,' নির্মম ভঙ্গিতে জবাব দিলো ও। 'বাচ্চাটাকে

নেমে আসতে দিয়ো না যেন···আমার সঙ্গে লোক আছে···আমি নিজেই ওপরে চলে যাবো।' ওর মা ওকে আরও প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে গ্রাহযন্ত্রটা ও নামিয়ে রাখলো।

মেয়েটি এবারে ভাবতে শুরু করলো, টাকাপয়সার ব্যাপারে ওর প্রাথমিক ঘৃণার ভাবটা ও অফিসারটির কাছে বজায় রাখার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে সচেষ্ট হয়েছে কি না। 'অন্তত এই মানুষটার কাছ থেকে আমি কোনো টাকাকড়ি নিতে রাজি হবো না,' ভাবলো ও। প্রথমবার ও যখন মেয়েমানুষ খুঁজে বেড়ানো একটা ফৌজি মানুষকে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলো, তখন ও কোনো লাভের আশা করেনি। বিদায়ের মুহূর্তে লোকটা ওকে টাকা দিতে চেয়েছিলো এবং লোকটার ব্যবহারে খুশিভরা হালকা মেজাজ আর অচিন্তনীয় স্বতঃস্ফূর্ততা দেখে সত্যি সত্যি অবাক হয়েই টাকাটা নিতে রাজি হয়েছিলো ও। কিন্তু পরে সেই প্রথম সাময়িক প্রেমিকটির আচরণে ও খানিকটা ঘৃণার ভাব লক্ষ্য করে, অথবা লক্ষ্য করেছে বলে মনে করে। সে জন্যে ওর অনুতাপ হয়েছিলো। টাকাটা ব্যাগে রাখতে রাখতে ও তখন নিজের কাছেই শপথ করেছিলো, এই প্রথম আর এই-ই শেষ। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে দ্বিতীয় বারেও সেই একই ঘটনা ঘটলো···সেই একই রকমের শর্তসাপেক্ষ ব্যাপার, একই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা—যা একই সঙ্গে আনন্দদায়ক এবং অপমানজনক দুই-ই। এবং তৃতীয় বারেও ঠিক তাই। শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই লাভজনক বৃত্তিটাতেই ও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিলো। কিন্তু ওই লজ্জা-করুণ অনুভূতিটার জন্যে সর্বদাই ও যেমন করে থাকে, এক্ষেত্রেও তেমনি এই অফিসারটিকে ও আগে থেকে কটু মন্তব্য দিয়ে আপ্যায়ন করেছে। এবং এখন সেই একই প্রশ্ন ওর সামনে এসে হাজির হয়েছে—টাকা নিতে ও রাজি হবে, কি না? এ কথা সত্যি, অন্যদের তুলনায় এই লোকটাকে ওর যে বেশি পছন্দ হয়েছে তা নয়। কিন্তু এই যুবকের কৌতূহলহীন উদাস প্রেম মনটাকে যেন নাড়া দিয়ে যায়। লোকটা নেহাতই ছেলেমানুষ, বয়েসে ওর চাইতে নিশ্চয়ই বছর পাঁচ-ছয়েকের ছোটো। মেয়েটি ভাবলো, লজ্জা আর ভদ্র আচরণেই লোকটার যৌবনের প্রকাশ। ও নিশ্চয়ই ছাত্র ছিলো, অবশ্যই বড়োঘরের ছেলে এবং এর আগে কোনোদিনও নারীসঙ্গ করেছে কি না সন্দেহ। মনে মনে এসব কথা চিন্তা করতে করতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছোট্ট রান্নাঘরটাতে গিয়ে ঢুকলো মেয়েটি। তারপর আলমারি খুলে একটা বোতল আর দুটো গ্লাস বের করে, সেগুলো একটা ট্রেতে করে বাইরে নিয়ে এলো।

বিকেল ফুরিয়ে আসছিলো। শূন্য টেবিলটার মুখোমুখি শূন্য দুটো আরাম-কুর্সির মাঝখানে ডিভানটার ওপরে পকেটে হাত গুঁজে, পা ছড়িয়ে বসে থাকা অফিসারটিকে ঘরের ঝাপসা অন্ধকারে যেন অবাস্তব আর অলৌকিক বলে মনে হচ্ছিলো। টেবিলের ওপরে ট্রেটা নামিয়ে রেখে বোতলের ছিপি খুললো মেয়েটি। একটু নিচু হতেই চুলগুলো ওর নাকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো—কেমন যেন ক্লান্ত অথচ আরও আকর্ষণীয় দেখালো ওকে। গ্লাস দুটো ভর্তি করে দিলো ও।

'ইংরেজি মদ,' মৃদু হেসে অফিসারটির পাশে বসলো মেয়েটি। 'তুমি পছন্দ করো ?'

'হ্যাঁ, অপূর্ব জিনিস,' পকেট থেকে সিগারেট-কেস বের করে ওর দিকে এগিয়ে ধরলো অফিসারটি।

'সিগারেট !' অতিরিক্ত উচ্ছল হয়ে ওঠে মেয়েটি। 'ধন্যবাদ।··· কিন্তু আমার কাছেও কয়েকটা রয়েছে···' ব্যাগের মধ্যে খুঁজতে থাকে ও। তবু অফিসারটি এমন ভাব দেখায়, যেন বলতে চায়, 'আমার থেকেই নাও না একটা !' সঙ্গে সঙ্গে খোঁজাখুঁজির পালা বন্ধ করে মেয়েটি এবং যে বিবশ ভদ্রতাবোধে ও অর্থগ্রহণে রাজি হয়, ঠিক সেই ভদ্রতার কারণেই একটা সিগারেটও তুলে নেয়। সামান্য সময় নিঃশব্দে বসে ধূমপান করে ওরা। মেয়েটি ওর কোটটা খুলে ফেলেছিলো—ওর পরনে শুধুমাত্র পশমী সোয়েটার আর খাটো মাপের পাতলা স্কার্ট। ঠাণ্ডা ঘরে বসে শীতে কাঁপছিলো ও।

'বেশ ঠাণ্ডা,' সামান্য হেসে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাসের ধোঁয়া বের করে দেখালো মেয়েটি।

'হ্যাঁ, খুব,' অফিসারটি রয়েসয়ে জবাব দিলো।

'আমাদের, মানে ইতালিয়দের চাইতে তোমরা—ইংরেজরা—ঠাণ্ডায় অনেক বেশি অভ্যস্ত। তোমাদের দেশে সব সময়েই শীত।'

'এ বছরে লণ্ডনেও খুব শীত,' মেয়েটির দিকে না তাকিয়েই বললো লোকটা।

'কেন ?'

অফিসারটিকে কাঁধ ঝাঁকাতে দেখলো মেয়েটি।

'ট্রেনগুলোকে সব পল্টনের কাজে লাগানো হচ্ছে···কারুরই এক কণা কয়লা নেই।'

'যুদ্ধটাকে তোমরা খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে নিয়েছো। ইংলণ্ডে সবাই যুদ্ধের কাজ করে ··এমন কি মেয়েরাও। তাই নয় কি ?'

'অবশ্যই,' দৃঢ় প্রত্যয়ে জবাব দেয় অফিসারটি। 'সবাই যুদ্ধে জড়িত…মেয়েরাও …ঠিকই বলেছো তুমি।'

তারপর দীর্ঘস্থায়ী এক নৈঃশব্দ্য। অফিসারটি ছোটো ছোটো নীল চোখ মেলে একটানা তাকিয়ে থাকে মেয়েটির দিকে। মেয়েটি অনুভব করে, লোকটার দৃষ্টির আঘাতে ক্রমশ বিচলিত হয়ে উঠছে ও। 'এবারে ও আমাকে চুমু দেবার চেষ্টা করবে,' ভাবলো মেয়েটি। যেন এক নিবিড় আতঙ্ক অনুভব করলো ও, মুখটা বিদ্রোহী হয়ে উঠে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে কুঁচকে গিয়ে সামান্য বিরক্তির অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুললো। ও বিবাহিতা, একটি মেয়ে আছে এবং প্রেমিকও আছে অনেক। কিন্তু দুটো অপরিচিত ঠোঁট ওর ঠোঁটের কাছে এলেই এক ধরনের কুমারীসুলভ বীতরাগে ওর চামড়া কুঁচকে ওঠে।…যাই হোক, অফিসারটি শুধু ওর হাতখানা তুলে ধরলো এবং বিয়ের আংটিটা দেখে জিগেস করলো, 'তুমি বিবাহিতা?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার স্বামী কোথায়?'

সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠলো মেয়েটি। ও কি সত্যি কথাটাই বলে দেবে? বলে দেবে যে স্বামীর সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে? অন্য একজন অফিসারের ক্ষেত্রে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে একটা কথা হঠাৎ ওর মাথায় এসে গিয়েছিলো —বলেছিলো, ওর স্বামী একজন যুদ্ধবন্দী। মুহূর্তের জন্যে ওই মিথ্যেটাকে যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়েছিলো। কারণ তাতে একদিক দিয়ে ওর আচরণ খারাপ বলে মনে হলেও, অন্য দিক দিয়ে ওর অবস্থাটা করুণ বলে মনে হয়…দারিদ্র্য এবং নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্যে স্বাভাবিক বলে মনে হয় ওর আচার-আচরণ। অতএব 'উনি একজন বন্দী', বেহায়ার মতো অফিসারটির চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো মেয়েটি।

কোনো কথা না বলে আগের মতোই ওর দিকে তাকিয়ে রইলো লোকটা। কিন্তু মেয়েটির মনে হলো, মানুষটার চোখে যেন সমবেদনার আলো ফুটে উঠেছে এবং সেটুকুকেই সম্বল করে রইলো ও।

'আমি এখন একা,' জোর দিয়ে বললো মেয়েটি। 'আমার স্বামী রোজগার করতেন, কিন্তু এখন আমার কিছু নেই… কোনো সম্বল নেই…'

মেয়েটির মনে হলো, ও যেন সত্যি কথাই বলছে—যদিও ও ভালো করেই জানে; কথাটা সত্যি নয়…ওর স্বামী বন্দী নয়, প্রাথমিক প্রয়োজনগুলোর জন্যে সে ওকে যথেষ্ট টাকাপয়সা পাঠিয়েছিলো, এতোদিন সেই অর্থই ও ব্যয় করেছে এবং

এখন আবার বিলাসিতার জিনিস কেনাকাটার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। তবু ওর মনে হলো, ও যেন সত্যি কথাই বলছে। এবং আঘাত দেবার মতো সত্যি কথা বলতে গেলে যেমন হয়, ও তেমনি বেদনা অনুভব করলো।

'আর তুমি···তুমি কি বিবাহিত?' জিগেস করলো মেয়েটি।

'বিয়ে ঠিক হয়ে আছে,' পাতলুনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ব্যাগ বের করলো অফিসারটি। তারপর ব্যাগ থেকে একটা ছবি বের করে এগিয়ে দিলো মেয়েটির দিকে। ছবিটা একটি সাধারণ মেয়ের—সুন্দরী নয়, আবার একেবারে সাদামাঠাও নয়—গাছগাছালির পটভূমিকায় একটা সাইকেলের ওপরে ঝুঁকে রয়েছে মেয়েটি।

'সুন্দর,' বললো ও।

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর,' নিবিড় আত্মপ্রসাদে ছবিটা আবার ব্যাগের মধ্যে রেখে দিলো অফিসারটি।

ভাবি-স্ত্রীর ছবি মানুষটাকে যদি জুড়িয়ে দেয়, আচমকা সেই আশঙ্কায় ত্রস্ত হয়ে উঠলো মেয়েটি। খানিকক্ষণ আগে যেজন্যে ও এতো ভয় পাচ্ছিলো, এখন সেই চুম্বনের জন্যেই প্রলোভিত করে তুলতে চাইলো মানুষটাকে।

'বড়ো জোর ঘণ্টাখানেক হলো আমাদের পরিচয় হয়েছে,' সামান্য হাসলো ও, 'অথচ মনে হচ্ছে আমরা যেন যুগ যুগ ধরে দুজন দুজনকে চিনি।' মানুষটার হাতে হাত রেখে তার আঙুলগুলো নিজের আঙুলে জড়িয়ে নিলো ও।

এতোক্ষণে গোধূলি ঘন হয়ে এসেছে, ঘরের কোণ থেকে ছায়া নেমে এসেছে ডিভান আর ডিভানে বসে থাকা যুগলের ওপরে। এক হাতে মেয়েটির হাত চেপে ধরে, অন্য হাতে ওর মাথাটা নিজের দিকে টেনে আনলো অফিসারটি—নিজের ঠোঁটের দিকে নয়, কাঁধের দিকে। ছায়াঘন ঠাণ্ডা ঘরে খানিকক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে রইলো ওরা। মানুষটার কাঁধে মেয়েটির মাথা···কি করবে ঠিক বুঝতে পারছিলো না মেয়েটি, বড়ো বড়ো করে চোখ মেলে রেখেছিলো অন্ধকারের মধ্যে। এ ধরনের আবেগপ্রবণতার সঙ্গে ওর পরিচয় এই প্রথম নয়, তাই সরাসরি উদ্দাম ব্যবহারই ও আশা করেছিলো—যা প্রতিটা ক্ষেত্রেই ওকে প্রচণ্ড পরিমাণে বিব্রত আর বিরক্ত করে তোলে। অবশেষে বেশ কিছুক্ষণ পরে—যা মেয়েটির কাছে অনন্ত বলেই মনে হচ্ছিলো—লোকটা ওকে চুমু দেবার জন্যে এগুলো। 'দাঁড়াও,' আগে থেকে বুঝতে পেরে রুমাল দিয়ে ঠোঁটের লালিমা মুছে নিলো মেয়েটি। তারপর চুমু খেলো ওরা।

চুমু দেবার পরে মেয়েটির মাথা আবার নিজের কাঁধে টেনে আনলো অফিসারটি, সোহাগের হাত বোলাতে শুরু করলো ওর কপালে আর চুলে।

চুলগুলো কপালে টেনে এনে এলোমেলো করে দিলো, তারপর পাট করে দিয়ে এলোমেলো করে দিলো আবার। লোকটার আদরের মধ্যে এক ধরনের নীরব এবং আবেগময় উন্মাদনা, যেন মেয়েটির কপালটা ও অন্য কোথাও সরিয়ে দিতে চায়—ঢেউ যেমন করে সৈকতের বুকে সরিয়ে দেয় সাদা নুড়ি পাথরগুলোকে। মেয়েটি অনুভব করলো, ও এমন একটি পুরুষের পাল্লায় পড়েছে যার কাছে দৈহিক প্রেমের চাইতে স্নেহ-মমতার, কামনার চাইতে কোমলতার প্রয়োজন অনেক বেশি। লোকটাকে ইচ্ছেমতো আদর করতে দিয়ে ক্রমশ ঠাণ্ডা আর ক্লান্ত হয়ে উঠছিলো মেয়েটি। মাঝে মাঝেই মানুষটা ওকে ছোট্ট করে একটা চুমু দেবার জন্যে আদর থামাচ্ছিলো, তারপর খোলা আঙুল দিয়ে ওর চোখের একটু ওপরে কপালটাতে হাতের চাপ দিচ্ছিলো, বিলি কেটে দিচ্ছিলো চুলের একেবারে গোড়া পর্যন্ত। মানুষটার হাত হালকা এবং ভারি—দুই-ই। হালকা তার কারণ, ওর হাতে এক ধরনের আবেগময় উত্তাপ। আর ভারি তার কারণ, এতো জোরে সে হাতের চাপ দিচ্ছে যেন কোনো মলম মালিশ করছে।

ঠিক তখনই গভীর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে দরজায় করাঘাত শোনা গেলো।

'দুঃখিত,' উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি। তারপর ছায়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে, চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা সামান্য একটু খুলে ধরলো। প্রথমটাতে ও কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না। তারপর নিচের দিকে তাকিয়ে ওর মেয়ের গোল মুখখানা দেখতে পেলো—লম্বা চুলগুলো মাথার ওপরে ফিতে দিয়ে বাঁধা।

'দিম্মাকে বলে দিয়েছিলাম তোমাকে যেন নিচে না পাঠায়···আমার সঙ্গে লোক আছে,' দরজা না খুলেই বললো মেয়েটি।

'দিম্মা জানতে চাইছে, তুমি রাত্তিরের খাবার খেতে আসবে কিনা।'

'হ্যাঁ, যাবো। এবারে তুমি যাও, আবার এসো না যেন···আমি ওপরে যাবোখন।'

'আচ্ছা।'

বাধ্য মেয়ের মতো ফিরে যায় বাচ্চাটা। খোলা দরজা দিয়ে ওর একটা একটা করে সিঁড়ি ভাঙার শব্দ শুনতে পায় মেয়েটি—সিঁড়ির ধাপগুলো ওর পায়ের পক্ষে বড্ড উঁচু। তারপর শব্দটা মরে যায়, আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে মেয়েটি। ঘরে ঢুকতেই মানুষটার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে ও।···চুলগুলো তখনও ওর চোখের ওপরে লুটিয়ে রয়েছে। মুখ না ফিরিয়েই প্রশ্ন করে, 'এবারে আমরা কি ঘরে যাবো?'

বারান্দা ধরে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো ওরা। শীতল গোধূলি এখানেও স্পর্শাতীত ধূলিকণার মতো নিচু বিছানা আর দু-তিনটে বৈশিষ্ট্যহীন আসবাবপত্রের ওপরে ছড়িয়ে আছে বলে পরিবেশটা কেমন যেন জনহীন পরিত্যক্ত বলে মনে হয়। অফিসারটিকে ভেতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে মেয়েটি। ও ঘুরে দাঁড়াতেই মানুষটা জড়িয়ে ধরে ওকে, কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে দুজনেই বসে পড়ে বিছানায়। কোনো রকমে হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপরে রাখা আলোটা জ্বেলে দেয় মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ওরা—কি বলবে বুঝতে না পেরে মেয়েটি শিশুর মতো প্রশ্ন করে, 'আমাকে তোমার কেমন মনে হয়?'

মেয়েটি লক্ষ্য করে, মানুষটা ওকে মনোযোগ দিয়ে যাচাই করছে। মুহূর্তের জন্যে ও এই ভেবে আশঙ্কিতা হয়ে ওঠে যে মানুষটা হয়তো স্বচ্ছন্দে এমন জবাব দিয়ে বসবে যা ওকে অপমানিত করে তুলবে। প্রশ্নটা করেছে বলে অনুতাপ হয় ওর।

'মনে হয় তুমি খুব সুন্দর,' শেষ অব্দি গভীর আন্তরিকতা আর আপাতনম্র স্বরে জবাব দেয় অফিসারটি।

'ধন্যবাদ, তুমি খুব সহৃদয় মানুষ,' খুশির অভিব্যক্তি নিয়ে মুখ নিচু করে মেয়েটি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি জানলাটা বন্ধ করে আসছি।'

জানলার কাছে গিয়ে পর্দাটা নামিয়ে দেয় মেয়েটি। 'এখন ওকে পোশাক খোলার কথা বলতে হবে,' ভাবলো ও। লোকটার অনভিজ্ঞতার জন্যে নিজের সমস্ত কমনীয়তা ছুঁড়ে ফেলতে হচ্ছে ভেবে নতুন করে বিরক্তি অনুভব করলো ও। কিন্তু কথাটা ওর মাথায় আসতে না আসতেই দেখলো, লোকটা শান্তভাবে গায়ের কোটটা খুলে কুর্সির ওপরে ঝুলিয়ে রাখছে। তারপর পাতলুনের বক্‌লস্ খুলতে শুরু করলো সে। এ ব্যাপারটা যেন মানুষটার প্রথম আলিঙ্গনের ভীরুতার সঙ্গে একেবারে সামঞ্জস্যহীন।

অকারণ ক্রোধে দাঁতে দাঁত চেপে, বিছানার ধারে বসে জুতো খুলতে শুরু করলো মেয়েটি। শব্দ শুনে বুঝলো, যুবক ওর পেছনে—বিছানার ওপরে—লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। আচমকা ওর মনে হলো, লোকটা হয়তো ওকে লক্ষ্য করতে পারে এবং সেটা অসহ্য ঠেকলো ওর।

'দয়া করে ওদিকে ফেরো,' প্রচণ্ড রেগে লোকটার দিকে মুখ ঘোরালো মেয়েটি। 'আমি যখন পোশাক খুলছি তখন কেউ আমাকে লক্ষ্য করবে, আমি তা সহ্য করতে পারিনে।'

মেয়েটি লক্ষ্য করলো, আচমকা ওর ফেটে পড়া দেখে মানুষটা অবাক হয়ে

বালিশে মাথা ঘুরিয়ে নিলো—কিন্তু চাদরের বাইরে আধখানা খোলা বুক নিয়ে চিৎ হয়েই শুয়ে রইলো আগেকার মতো। ও যখন সবচাইতে বেঢপ পরিস্থিতিতে রয়েছে—ওর একটা হাঁটু বিছানায় আর একটা পা মেঝেতে, সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে ওর শরীরটা, স্তন দুটো আর চুলগুলো ঝুলছে নিরালম্বের মতো—ঠিক তখনই অধৈর্য অথবা কৌতূহলী হয়ে ফের মাথা ঘোরালো মানুষটা। বিরক্তি বেড়ে উঠলো মেয়েটির। তবু মানুষটার শরীরের ওপরে ঝুঁকে, নিজের বাহুসন্ধির কবোষ্ণ অন্ধকারে তার চোখ দুটোকে ঢেকে দিয়ে, টেবিলে রাখা আলোটাকে নিভিয়ে দিলো ও।

তারপর সুতোর কাজ করা অমসৃণ চাদরের নিচে নগ্ন শরীরে একে অন্যের বাহুবন্ধনে শুয়ে রইলো ওরা। মেয়েটি অনুভব করলো, অন্ধকারে মানুষটার হাত ওর কপালে আবার সেই দীর্ঘ মালিশ শুরু করেছে—আগের মতোই তাতে সেই তীব্র আবেগময়তা, কিন্তু সেই সঙ্গে ঈর্ষা আর অধিকারবোধের এক নতুন কম্পন। ওর শরীরের যেসব অংশ মানুষটার শরীর ছুঁয়ে নেই, সে সব অংশগুলো ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে। অথচ মানুষটার সোহাগ বর্ষণের মধ্যেও ও অনুভব করছিলো, ওর মুখে এক তিক্ত অবিশ্বাসের কুটিল রেখা ফুটে উঠেছে। নিজের চিন্তাগুলোকে থামাতে চাইছিলো মেয়েটি, কিন্তু ওর মনটা ওর ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে স্বাধীনভাবে চিন্তার স্রোতে ভেসে চললো—ঠিক চিন্তা নয়, অবাস্তব অলীক কিছু কল্পনার সঙ্গে ফেলে আসা কিছু স্মৃতি আর সম্পর্কের সংমিশ্রণ। যেমন: ও কল্পনা করলো যুবক অফিসারটি ওর প্রেমে পড়েছে, ওকে সে তার নিজের দেশে নিয়ে যাচ্ছে। এই অলীক কল্পনা থেকে জন্ম নিলো আরও কিছু স্বপ্ন: কিভাবে ওরা নতুন জীবন কাটাবে, কাদের সঙ্গে ওর পরিচয় হবে, কি রকম বাড়িতে ওরা বাস করবে···ভাবলো ওর মেয়ে আর মায়ের কথা। তারপর ওর চিন্তা বয়ে চললো অন্য খাতে—যেখান থেকে ওর চিন্তা শুরু হয়েছিলো, তার সঙ্গে এর যোগাযোগ সামান্যই···সেগুলো আবার স্বতঃস্ফূর্ত বংশলতার মতো বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে বিচিত্র লক্ষ্যে ছুটে চললো ইচ্ছেমতো। এক সময় মেয়েটি সচকিত হয়ে অনুভব করলো, বিকেলবেলা অফিসারটির সঙ্গে দেখা হবার একটু আগে রাস্তায় কে ওকে সম্ভাষণ জানিয়েছিলো, ও সেই কথাটাই চিন্তা করছে। এই সমস্ত অনাহূত চিন্তা ওর মনে এক অস্পষ্ট বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো বিশেষ করে ঠিক তখনই, যখন ওর শীতার্ত পিঠের নাছোড় অস্বস্তির মতো 'আমাকে টাকা দেবার জন্যে লোকটাকে আমি বাধ্য করবো কি না'—এই প্রশ্নটা ওকে অতিষ্ঠ করে তুললো।

অতএব এখন রাত্রির অন্ধকারে নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে রইলো ওরা। অবশেষে মেয়েটি ঝিমোতে শুরু করলো এবং এক অনির্দিষ্ট কাল পরে জেগে উঠলো আবার। দেখলো, অফিসারটি ইতিমধ্যে উঠে পোশাকটোশাক পরে টিউনিকের বোতাম এ'টে নিচ্ছে। ঘরের আলোটা জ্বলছে এবং সেটা এ ধরনের সাক্ষাৎকারের ফলস্বরূপ ঘরের অনিবার্য বিশৃঙ্খলাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে।

'আমি বাইরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো,' ওকে দরজার দিকে দেখিয়ে বেরিয়ে গেলো মানুষটা।

লোকটা চলে যাবার পরেও খানিকক্ষণ কোঁচকানো বিছানাটাতে নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইলো মেয়েটি। তারপর লোকটা টাকা না দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে ভেবে, আচমকা আতঙ্কিত হয়ে উঠলো ও। লোকটার এমনধারা তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যাবার ব্যাপারটা রীতিমতো সন্দেহজনক। নিজের ভয়ে নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠলো মেয়েটি—নিজে ওদের শিকার হওয়া সত্ত্বেও ও প্রায় আশা করছিলো, অফিসারটি সত্যি সত্যি চলে যায়নি। প্রেমের সৌরভের মতো লেগে থাকা আতঙ্ক থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে না পেরে, দ্রুত পোশাকটোশাক পরে নিলো ও।

আলমারির আরশিতে চুল আঁচড়ে নিলো মেয়েটি। লক্ষ্য করলো, লোভ ক্রোধ আর সন্দেহের উত্তেজনায় ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে! আরশির গভীরে নিজের হীন প্রতিমূর্তিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খাটের কাছে টেবিলটার ওপরে ভাঁজ করে রাখা টাকাগুলো দেখতে পেলো ও। ব্যগ্র কৌতূহলের ভ্রূকুটি নিয়ে টাকাগুলো গুনে নিয়ে দেখলো মেয়েটি। ও যেমনটি আশা করেছিলো, অঙ্কটা তার চাইতে অনেক বেশি। অফিসারটি হয়তো সত্যি সত্যি চলে গেছে ভেবে এবারে সত্যিই শঙ্কিতা হয়ে উঠলো ও...এক ছুটে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

বৈঠকখানা ঘরে মানুষটাকে দেখতে পেলো মেয়েটি। ঘরের আলো জ্বেলে এক গ্লাস পানীয় নিয়ে ডিভানে বসেছিলো মানুষটা। দাঁতের মাঝখানে একটা তামাকের নল। ওকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো সে।

মেয়েটি কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো, 'তুমি নিজে নিজেই পানীয়টা নিয়েছো বলে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমাকেও একটু ঢেলে দেবে?'

বোতলটা নিয়ে মেয়েটির গ্লাস ভরে দিলো মানুষটা। ডিভানে বসে লোভীর মতো সেটা পান করলো মেয়েটি। লোকটার প্রথম চুম্বন ওর কাছে যতোটা ভীতি-প্রদ বলে মনে হয়েছিলো, এখন লোকটা চলে যাবে ভাবতে ঠিক ততোখানিই ভঙ্গ

লাগছিলো ওর। দৈহিক নিঃসঙ্গতা আর বিচ্ছেদের অপমানকর এবং যন্ত্রণাময় এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা অনুভব করছিলো ও। ও চাইছিলো, মানুষটা থাকুক। ওরা একসঙ্গে বসে ক্রমাগত পান করতে পারে, মাতালও হয়ে যেতে পারে। ও পান করতে চাইছিলো—তার কারণ ও ভাবছিলো, যেসব কথা ওকে একদিন না একদিন কাউকে না কাউকে বলতেই হবে, পানের অবকাশে সে সমস্ত কথা ও অফিসারটিকেই বলে দিতে পারবে।

নিজের জন্যে দ্বিতীয় গ্লাস পানীয় ঢেলে, অফিসারটির গ্লাস ভর্তি করতে শুরু করলো মেয়েটি। কিন্তু অফিসারটি হাতের ইঙ্গিতে ওকে নিষেধ জানালো।

'আর একটু নেবে না?' আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলো মেয়েটি।

'না, ধন্যবাদ।'

'আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে,' এক চকিত আশায় ঝিলমিলে চোখ নিয়ে উচ্ছল হয়ে উঠলো মেয়েটি। 'তুমি আমার সঙ্গে রাত্তিরের খাওয়াটা খেয়ে যাও না কেন? আমি তোমার জন্যে রান্না করবো…স্পাগেত্তি বানাবো। স্পাগেত্তি তুমি ভালোবাসো?'

'হ্যাঁ, সত্যিই ভালোবাসি।' লোকটার কণ্ঠস্বরে হতাশার সুর ফুটলো, 'কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে!'

'না, লক্ষ্মীটি যেও না! খাওয়াদাওয়া করো…আর রাত্তিরটা থেকে যাও।'

'তা অসম্ভব।'

'তুমি এখন আর আমাকে সহ্য করতে পারছো না…সবই কি শেষ হয়ে গেলো?'

বিস্মিত ভঙ্গিমায় লোকটাকে মাথা নাড়তে দেখে স্বস্তি পেলো মেয়েটি—যেন মানুষটাকে ও যে কারণে অভিযুক্ত করেছে, মানুষটা আদৌ সে অপরাধ করেনি।

'আমি থাকতেই চাই। আমার মতো পরিস্থিতিতে পড়লে যে কোনো মানুষই থাকতে চাইবে। কিন্তু আমি থাকতে পারছি না,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো মানুষটা।

আতঙ্কে অধীর হয়ে উঠলো মেয়েটি। সামনের দিকে ঝুঁকে মানুষটার একখানা হাত তুলে নিয়ে, তাতে নিজের ঠোঁট দুটি চেপে ধরলো ও। মিনতি করে বললো, 'যেও না!' তারপর কি বলছে তা ঠিকমতো না বুঝেই বললো, 'আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, তুমি থাকলে আমি তোমার প্রেমে পড়ে যাবো।'

'কঠিন ফৌজি কানুনে যেতে আমাকে হবেই,' ওকে বুঝিয়ে বললো অফিসারটি। তারপর মৃদু হাসির সঙ্গে—যদিও তা বিদ্বেষের হাসি নয়—জুড়ে দিলো, 'আসছে

কাল তোমার সঙ্গে আবার অন্য কারুর দেখা হবে, তখন আমার কথা তুমি সবই ভুলে যাবে।'

মানুষটার কথার বিরোধিতা করার সাহস হলো না মেয়েটির। চুলগুলো একটু পরিপাটি করে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে, তাকে অনুসরণ করলো ও। হাতাবিহীন কোটটা গায়ে চড়িয়ে নিলো অফিসারটি। তারপর পকেট থেকে একটা টর্চ বের করে এগিয়ে গেলো সিঁড়ির দিকে। সিঁড়িগুলোর নিচে বাগানের অন্ধকারে টর্চের উজ্জ্বল রোশনাই গাড়িটার কর্দমাক্ত অংশটাকে আলোকিত করে তুললো।

সিঁড়ির শেষ ধাপগুলো নেমে এলো ওরা।

'বিদায়,' হাত এগিয়ে দিলো অফিসারটি।

'বিদায়,' মানুষটার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলো মেয়েটি। তারপর বললো, 'তুমি গাড়িতে উঠে বোসো, আমি সদর দরজাটা খুলে দিচ্ছি।'

গাড়িতে উঠে এঞ্জিন চালু করলো অফিসারটি। মেয়েটি ততোক্ষণে সদর দরজা খোলার জন্যে ছুটে গেছে। পাল্লা দুটো টেনে খোলার জন্যে নিজের সবটুকু শক্তির প্রয়োজন হলো ওর। গাড়িটা রাস্তায় গিয়ে উঠলো। ঠিক তখনই আচমকা মেয়েটির মনে পড়লো, দরজা খোলার পরে ও প্রথমেই মুরগীর খুপরিটা দেখতে গিয়েছিলো। তখন রতিবিলাসের আগে অহঙ্কারে কেমন ফুলে ছিলো মুরগীটা! আর পরেও আত্মগর্বে সেটা ফুলে ছিলো ঠিক আগের মতোই। কতো দ্রুত প্রেম থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলো মুরগীটা—শুধু একটু ডানার ঝটপটানি আর সেই সঙ্গেই সব শেষ। অথচ সেই একই সময়ে মুরগীটার অহঙ্কারী হাবভাব কতোই না মেকি বলে মনে হয়েছিলো ওর, কতো ঘৃণ্য বলে মনে হয়েছিলো ডানার ওই ঝটপটানি।

রাত্রির বুকে গাড়িটার চলে যাবার শব্দ শুনে সম্বিৎ ফিরে পেলো মেয়েটি। একটা একটা করে দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করে সামনের দরজার দিকে ফিরে এলো ও। 'অহঙ্কার নিয়ে আর ডানা ঝাপটেই ফিরে এসেছি আমি,' ভেতরে ঢুকে ভাবলো মেয়েটি।

গাছটা

মারিয়া-লুইসা বম্বাল

চিলি, এমন কি সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকার বিদুষী সাহিত্যিকদের অন্যতমা মারিয়া-লুইসা বম্বালের জন্ম ১৯১০ সাল, সরবনে। সরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বি. এ. পাস করেন। বম্বাল মূলত ঔপন্যাসিক। 'লা আলতিমা নিয়েব্লা' এবং 'লা অ্যামোরতাজাদা' তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। কিন্তু ছোটগল্পেও তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় রাখেন। অবচেতন মনের ভাবনা, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং আঙ্গিকের অনন্যতায় তাঁর প্রতীকধর্মী গল্প 'গাছটা' নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। কিছুকাল যুক্তরাষ্ট্রে কাটানোর পর বর্তমানে বুয়েনস আয়ার্সে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

পিয়ানো বাদক আসন গ্রহণ করে কৃত্রিম ভঙ্গিতে মৃদু কাশলেন, তারপর মনঃসংযোগ করে নিলেন মুহূর্তের জন্যে। গাঢ় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট, সংযত এবং সঠিক খেয়ালিপনা গড়ে তোলার জন্যে বাজনা শুরু হতেই হলঘরের আলোকিত বাতিগুলো আস্তে আস্তে মৃদু ও উষ্ণ আভাময় হয়ে উঠলো।

'মোৎসার্ট বোধ হয়,' ভাবলো ব্রিগিদা। যথারীতি ও অনুষ্ঠানলিপিটা চাইতে ভুলে গেছে। 'মোৎসার্ট বোধ হয়, কিংবা স্কারলাত্তি।' সঙ্গীত সম্পর্কে ওর জ্ঞান কতো কম! অথচ এর কারণ, সঙ্গীতের ব্যাপারে ওর কান তৈরি হয়নি বা আগ্রহ নেই—তা কিন্তু নয়। শিশুকালে ও নিজেই পিয়ানো শিখতে চাইতো। ওর বোনদের মতো এ জন্যে ওকে জোরাজুরি করার কোনো প্রয়োজন হয়নি। অবিশ্যি ওর বোনরা এখন শুদ্ধভাবেই বাজাতে পারে, দেখামাত্র স্বরলিপিও পড়তে পারে—অথচ ও···ও সেই শুরু করার বছরেই শেখা ছেড়ে দিয়েছিলো। সঙ্গীত শিক্ষায় ওর ধারাবাহিকতা বজায় না থাকার কারণটা যেমন সহজ, তেমনি লজ্জাজনক। স্বরগ্রামে মধ্যমের স্বরটা ও কিছুতেই শিখে উঠতে পারেনি—কোনোদিনই না। 'আমি বুঝতে পারি না···আমার শুধু পঞ্চম স্বরটা মনে পড়ে।' বাবা কি রাগই না করতেন! 'একা একগাদা মেয়েকে মানুষ করে তোলা—আর কেউ করুক না! বেচারি কারমেন! ব্রিগিদার কথা ভেবে ও নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পেতো। আসলে মেয়েটার বুদ্ধিশুদ্ধিই কম।'

ছ মেয়ের মধ্যে ব্রিগিদা সবচাইতে ছোটো। প্রতিটি মেয়েই আলাদা চরিত্রের।

প্রথম পাঁচ মেয়েকে নিয়ে বাবা এতোই ক্লান্ত এবং বিমূঢ় হয়ে উঠেছিলেন যে ষষ্ঠ কন্যাটির সময় তিনি ওকে মানসিক প্রতিবন্ধী বলে ঘোষণা করে বিষয়টাকে সহজ করে দেওয়াই শ্রেয় বলে মনে করলেন। 'আমি আর ওর জন্যে কোনো খাটাখুটি করছি না, করার কোনো অর্থ ই হয় না। ও যেমন আছে, থাক। ও যদি রান্নাঘরে বসে ভূতের গপ্পো শুনে সময় কাটাতে চায়, কাটাক। ষোলো বছর বয়সেও ও যদি পুতুল ভালোবাসে, তাহলে ও পুতুল নিয়েই খেলুক।'···ব্রিগিদা ওর পুতুলগুলোকে রেখে দিলো এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়েই রইলো।

অজ্ঞ হয়ে থাকা কি মজার! জানতে হয় না মোৎসার্ট কে ছিলেন···অবহেলা করা যায় তাঁর উৎস, তাঁর প্রভাব, তাঁর কলাকৌশলের খুঁটিনাটি। শুধু একজনকে হাতের নির্দেশে পরিচালনা করলেই হলো—যেমন করছেন এখন।

মোৎসার্ট সত্যি সত্যিই ব্রিগিদাকে পরিচালনা করছেন, ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। ওকে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন একটা ঝুলন্ত সেতুর ওপর দিয়ে। সেতুর নিচে গোলাপি বালুর বুক দিয়ে চলেছে টলটলে এক নদী। ব্রিগিদার পরনে সাদা পোশাক, কাঁধে মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম আর জটিল বুনোটের ছোট্ট একটা লেসের ছাতা।

'দেখে মনে হচ্ছে প্রতিদিনই যেন তোমার বয়েসটা কমে যাচ্ছে, ব্রিগিদা। গতকাল তোমার স্বামী, মানে তোমার ভূতপূর্ব স্বামীটির সঙ্গে দেখা হলো। ভদ্রলোকের চুলগুলো পুরো সাদা হয়ে গেছে।'

কিন্তু ব্রিগিদা কোনো জবাব দেয় না, থামে না। মোৎসার্টের নির্দেশিত সেতুর পথ পেরিয়ে ও এগিয়ে যেতে থাকে ওর যৌবনের বাগানে, যখন ওর বয়স আঠারো বছর। বাগানের উঁচু উঁচু ফোয়ারাগুলোতে জলধারার গান। ব্রিগিদার মাথায় বাদামী চুলের বিনুনী। বিনুনীর বাঁধন খুলে দিলে গোড়ালি অব্দি নেমে আসে ওর চুল। সোনার বরণ গায়ের রঙ। কালো চোখ দুটি সম্পূর্ণ খোলা, যেন কি জানতে চায়। ছোট্ট একটু হাঁ-মুখ, পুরুষ্টু ঠোঁট, মিষ্টি হাসি আর পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে মধুরিমায় ভরা তন্বী শরীর। ফোয়ারাটার পাশে বসে কি এতো ভাবছিলো ব্রিগিদা? কিছু না। সবাই বলতো, 'মেয়েটা যেমন বোকা তেমনি সুন্দরী।' কিন্তু ও যে বোকা বা ও যে নাচে অপটু আনাড়ি, তাতে ওর কোনোদিনই কিছু এসে যায়নি। একে একে ওর দিদিরা বিয়ের প্রস্তাব পেলো। কিন্তু ওকে কেউ তেমন প্রস্তাব জানালো না।

মোৎসার্ট! এবারে ব্রিগিদাকে তিনি নীল মর্মরে গড়া একটা সিঁড়ি দেখিয়ে দিলেন। সিঁড়ির দু পাশে সারি সারি তুষারের লিলি ফুল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে

এলো ও। সামনে মোটা মোটা লোহার গরাদ লাগানো এক দরজা। গরাদগুলোর সুঁচালো মাথায় সোনালি গিলটি করা। মোৎসার্ট দরজাটা খুলে দিলেন, যাতে ও ওর বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু লুইসের গলা ধরে ঝুলে পড়তে পারে। ও যখন খুবই ছোটো, যখন সবাই ওর হাল ছেড়ে দিয়েছে—তখন থেকেই ও লুইসের কাছে ছুটে যেতো। তিনি ওকে কোলে তুলে নিতেন আর ও দু হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরতো, হাসতে হাসতে অনেক মিষ্টি মিষ্টি অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতো আর প্রবল বর্ষণের মতো অজস্র চুমু এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে দিতো তাঁর চোখ, কপাল আর ধুসর হয়ে ওঠা (কোনোদিনও কি উনি তরুণ ছিলেন ?) চুলগুলোতে।

'তুমি একটা মালা,' লুইস ওকে বলতেন, 'ঠিক যেন একটা পাখির মালা।'

এই জন্যেই ওই মানুষটাকে বিয়ে করেছিলো ব্রিগিদা। বিয়ে করেছিলো তার কারণ—ও বোকা, মজাদার আর কুঁড়ে…কিন্তু ওই শান্ত সৌম্য স্বল্পবাক মানুষটির কাছে এলে সেজন্যে ও কোনো অপরাধ অনুভব করতো না। হ্যাঁ, আজ এতোগুলো বছর পেরিয়ে এসে ও বুঝতে পারে, ভালোবাসার জন্যে লুইসকে ও বিয়ে করেনি। অথচ ও ঠিক বুঝতে পারে না, কেন ও একদিন তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলো আচমকা…

কিন্তু ঠিক এই সময় মোৎসার্ট বিচলিতভাবে ওকে একটা হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে উলটো দিকের বাগানটা পার করে দিলেন—ফের ওকে প্রায় ছুটিয়ে নিয়ে গেলেন সেতুটার ওপর দিয়ে। তারপর লেসের সেই ছোট্ট ছাতা আর স্বচ্ছ স্কার্টটা থেকে ওকে বঞ্চিত করে, একটা নরম অথচ পোক্ত দড়ি দিয়ে ওর অতীতের দরজাটা তিনি বন্ধ করে দিলেন—ওকে রেখে গেলেন কালো পোশাক পরা অবস্থায় একটা বিশাল সঙ্গীতশালায়…সেখানে কৃত্রিম আলোগুলো জ্বলে উঠতেই ও সরব প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো যান্ত্রিক তৎপরতায়।

তারপর আবার সেই আধো আধো ছায়া, আবার সেই নৈঃশব্দ্যের পূর্বাভাস।

এবারে এক বাসন্তী চাঁদের রাতে বিথোফেনের সুর ফুলে উঠতে শুরু করেছে। কতো দূরে সরে গেছে সমুদ্রটা ! সৈকত ধরে দূরে সরে যাওয়া সেই ঝিলমিলে শান্ত সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলে ব্রিগিদা। কিন্তু তারপরেই সমুদ্রটা একটু একটু করে ফুলেফেঁপে ওঠে, আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে ওর দিকে, ওকে ঘিরে ধরে, ছোটো ছোটো তরঙ্গে ওকে ঠেলতে ঠেলতে ওর চিবুকটা একটা মানুষের দেহের ওপরে নিয়ে তোলে। তারপর সমুদ্র আবার সরে যায়, ওর কথা ভুলে সমুদ্র ওকে রেখে যায় লুইসের বুকে।

'তোমার হৃৎপিণ্ড নেই, জানো তো—তোমার হৃৎপিণ্ড নেই।' লুইসকে বলতো

ব্রিগিদা। ওর স্বামীর হৃৎস্পন্দন বুকের এতো গভীরের হতো যে ব্রিগিদা তার শব্দ প্রায় শুনতেই পেতো না। ঘুমোবার আগে শোবার ঘরে উনি যখন নিষ্ঠাভরে সান্ধ্য পত্রিকাগুলো খুলে বসতেন তখন ব্রিগিদা প্রতিবাদ জানিয়ে বলতো, 'আমার কাছে যখন থাকো, তখন তুমি কক্ষণো আমার সঙ্গে থাকো না। তবে কেন বিয়ে করেছিলে আমাকে ?'

'কারণ তোমার চোখ দুটো ভয় পাওয়া হরিণীর মতো,' লুইস জবাব দিয়ে ওকে চুমু দিতেন। আর ব্রিগিদা গর্বভরে নিজের কাঁধে তাঁর ধূসর মাথাটার ভার গ্রহণ করে আচমকা ভীষণ খুশি হয়ে উঠতো।

'লুইস ছেলেবেলায় তোমার চুলের রঙ ঠিক কেমন ছিলো তা তুমি কোনোদিনও আমাকে বলোনি। পনেরো বছর বয়সে যখন তোমার চুল পাকতে শুরু করে তখন তোমার মা কি বলেছিলেন, তাও বলোনি। কি বলেছিলেন উনি ? হেসেছিলেন ? না কেঁদেছিলেন ? তোমার কি তখন অহঙ্কার হয়েছিলো, না কি তুমি লজ্জা পেয়েছিলে ? আর স্কুলে···তোমার বন্ধুরা···তারা কি বলেছিলো ? তুমি আমাকে বলো, লুইস···বলো আমাকে···'

'কাল বলবো, ব্রিগিদা। এখন আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি ভীষণ ক্লান্ত। তুমি বরং আলোটা নিভিয়ে দাও।'

ঘুমোবার জন্যে লুইস নিজের অজান্তে ব্রিগিদার কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন আর ব্রিগিদা সারা রাত নিজের অজান্তে স্বামীর পিঠের কাছে তাঁর নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাবার প্রার্থনা জানিয়েছিলো। স্বামীর নিঃশ্বাসের আশ্রয়েই ও জীবনটা কাটাবার চেষ্টা করেছিলো, যেমন করে একটা তৃষ্ণার্ত বন্দী উদ্ভিদ অনুকূল পরিবেশের সন্ধানে নিজের ডালপালাগুলোকে মেলে দেয়।

সকালবেলা পরিচারিকা যখন পর্দাগুলোকে সরিয়ে দিলো তখন লুইস ওর পাশে ছিলেন না। 'পাখির মালা'টির ভয়ে তিনি সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে, ওকে সুপ্রভাত না জানিয়েই চলে গিয়েছিলেন—কারণ ব্রিগিদা প্রাণপণে তাঁর কাঁধ ধরে পেছনে টেনে রাখে।···'পাঁচ মিনিট, মোটে পাঁচটা মিনিট! আমার সঙ্গে পাঁচটা মিনিট বেশি থাকলে তোমার অফিস উবে যাবে না, লুইস!'

ওর ঘুম ভেঙে ওঠা। হায়, কি দুঃখের সেই জাগরণ! অথচ আশ্চর্য, সাজঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই যেন এক যাদুর খেলায় ওর সমস্ত বিষণ্ণতা উধাও হয়ে যায়।

দূরে—বহুদূরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ জেগে উঠছে আর ভেঙে পড়ছে। যেন মর্মরস্বর জেগে উঠছে পত্রালির সমুদ্রে। এ কি বিথোফেন ? না। আসলে ওটা

সাজঘরেরে জানলার একেবারে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাছ। সত্তার গভীরে এক আশ্চর্য মধুর আবেশ অনুভব করার জন্যে ব্রিগিদার পক্ষে শুধু ওই ঘরটাতে গিয়ে ঢোকাই যথেষ্ট। সকালবেলা শোবার ঘরে সর্বদাই কি গরম! কি কর্কশ আলো! অথচ এখানে, এই সাজঘরে, চোখ দুটোও একটু বিশ্রাম পায়—একটু সতেজ হয়ে ওঠে। সুতিকাপড়ের ছাপানো পর্দা, দেয়ালের গায়ে ছোটো ছোটো তরঙ্গের মতো কেঁপে কেঁপে ওঠা গাছটার ছায়া, ঠাণ্ডা জল, আরশিগুলোতে অনন্ত সবুজ-অরণ্যে ফিরে যাওয়া পত্রালির ছায়া। কি সুন্দরই না ছিলো ঘরটা! ঠিক যেন কৃত্রিম পুকুরে ডুবে থাকা একটা আলাদা পৃথিবী। বিশাল সেই ঝুপসি-মাথা গাছটা কি প্রচণ্ড কলকাকলিতে ভরে উঠতো! আশপাশের সমস্ত পাখি ওই গাছটাতেই আশ্রয় নিতে আসতো। সঙ্কীর্ণ সেই ঢালু রাস্তাটা. যেটা শহরের একটা প্রান্ত থেকে সোজা নদীর কোলে নেমে গেছে—সেই রাস্তায় ওটাই ছিলো একমাত্র গাছ।

'আমি ব্যস্ত আছি, সোনা—তোমাকে সঙ্গ দিতে পারছি না। আমার অনেক কাজ। না, দুপুরে খেতে যাবারও সময় হবে না।…হ্যালো—হঁ্যা, আমি ক্লাবে আছি। একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা। তুমি বরং রাতের খাবারটা খেয়ে শুয়ে পড়ো।…না, জানি না। তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না, ব্রিগিদা।'

'আমর যদি কয়েকটা বান্ধবীও থাকতো!' ব্রিগিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সকলের কাছেই ও একঘেয়ে, বিরক্তিকর! ও যদি চেষ্টা-চরিত্র করে একটু কম নির্বোধ হতে পারতো! কিন্তু এক লাফে কি করে অতোটা পথ পেরিয়ে যাওয়া যায়? বুদ্ধিমতী হতে গেলে ছেলেবেলা থেকেই চেষ্টাটা শুরু করা উচিত। তাই নয় কি?

ওর দিদিরা অবিশ্যি সর্বত্রই যায়, স্বামীরাই নিয়ে যায় ওদের। কিন্তু লুইস—নিজের কাছে স্বীকার করতে আপত্তি কিসের?—লুইস ওর জন্যে লজ্জিত। লজ্জিত ওর অজ্ঞতা, ওর ভীরুতা, এমন কি ওর আঠারো বছর বয়েসটার জন্যেও। তিনি ওকে বলেছেন, ও যেন নিজের বয়েসটা একুশ বছর বলে। যেন পূর্ণ যৌবন ওর একটা গোপন ত্রুটি।

রাত্রিবেলা শুতে যাবার সময় লুইস সর্বদা কি ক্লান্তই না থাকতেন! ব্রিগিদার সব কথা উনি কোনোদিনই শুনতেন না। ব্রিগিদার দিকে তাকিয়ে উনি হাসতেন—যে হাসিটা, ব্রিগিদা জানতো, সম্পূর্ণ যান্ত্রিক। ব্রিগিদাকে উনি আদরে সোহাগে ভরিয়ে তুলতেন, কিন্তু তার মধ্যে উনি নিজে উপস্থিত থাকতেন না। তাহলে কেন উনি বিয়ে করেছিলেন ব্রিগিদাকে? একটা অভ্যেস বজায় রাখতে, কিংবা হয়তো ব্রিগিদার বাবার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা জোরদার করতে। হয়তো পুরুষমানুষের পক্ষে জীবন কতকগুলো অভ্যেসের এক সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খল। হয়তো সেই শৃঙ্খল থেকে

একটি মাত্র অভ্যেসের গ্রন্থিকে ছিঁড়ে ফেললেই তাদের জীবনে নেমে আসে বিভ্রান্তি আর বিফলতা। তখন তারা শহরের পথে পথে ঘুরে :বেড়াতে শুরু করে, পার্কের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে, দিনের পর দিন তাদের বেশভূষা ক্রমশ হতশ্রী হতে থাকে, দাড়ি বড়ো হয়।

তাই লুইসের জীবনের উদ্দেশ্য, দিনের প্রতিটি মুহূর্তকে কোনো না কোনো কাজ দিয়ে ভরিয়ে তোলা। ব্রিগিদা কেন তা আগে বোঝেনি! বাবা ওকে মানসিক প্রতিবন্ধী বলে ঠিকই করেছিলেন।

'আমার তুষারপাত দেখতে ইচ্ছে করে, লুইস।'

'এবারের গ্রীষ্মে আমি তোমাকে ইউরোপে নিয়ে যাবো। তখন সেখানে শীতকাল, তাই সেখানে তুমি তুষারপাত দেখতে পাবে।'

'আমি জানি, এখানে যখন গ্রীষ্ম—ইউরোপে তখন শীত। অতোটা মুর্খ আমি নই।'

মাঝে মাঝে স্বামীর মনে প্রকৃত প্রেমের আবেগ জাগিয়ে তুলতে ব্রিগিদা তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে তুলতো, কাঁদতো, বারবার ডাকতো —লুইস লুইস লুইস···

'কেন? কি হলো তোমার? কি চাও তুমি?'

'কিছু না।'

'তাহলে অমন করে ডাকছো কেন?'

'এমনি, কোনো কারণ নেই। শুধু ডাকার জন্যেই ডেকেছি। তোমাকে ডাকতে আমার ভালো লাগে।'

লুইস তখন হাসতেন, প্রসন্ন মনে মেনে নিতেন ওর এই নতুন খেলা।

গ্রীষ্ম এলো। বিয়ের পরে ওর জীবনের প্রথম গ্রীষ্ম। নতুন কাজের চাপে লুইস ওকে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মতো বেড়াতে নিয়ে যেতে পারলেন না।

'ব্রিগিদা, এবারের গ্রীষ্মে বুয়েনস আয়ার্সে গরম একেবারে মারাত্মক হয়ে উঠবে। তুমি বরঞ্চ তোমার বাবার সঙ্গে খামারবাড়িতে চলে যাও না কেন?'

'একা?'

'আমি প্রত্যেক সপ্তাহশেষের দিনগুলোতে গিয়ে তোমাকে দেখে আসবো।'

ব্রিগিদা তখন বিছানায় বসে পড়েছে। স্বামীকে অপমান করবে বলে ও তখন প্রস্তুত। কিন্তু বৃথাই ও ঝাঁজ ছড়াবার মতো উপযুক্ত শব্দ খুঁজে মরলো। ও কিছুই জানে না, কিছু না। কি করে অপমান করতে হয়, তা পর্যন্ত ওর জানা নেই।

'কি হলো তোমার? কি অতো ভাবছো, ব্রিগিদা?'

এই প্রথম লুইস ফিরে এসে ওর কাছে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছেন। পেরিয়ে যাচ্ছে তাঁর অফিসে যাবার সময়।

'আমার ঘুম পেয়েছে…' বালিশে মুখ লুকিয়ে ছেলেমানুষের মতো জবাব দিলো ব্রিগিদা।

এই প্রথম দুপুরে খাওয়ার সময় লুইস ক্লাব থেকে ওকে ফোন করলেন। কিন্তু ও টেলিফোনের কাছেই গেলো না। কোনো কিছু চিন্তা না করেই যে অস্ত্রটা ও খুঁজে পেয়েছিলো, সেটাই ব্যবহার করলো হিংস্রভাবে।

সেদিন সন্ধ্যায় ও স্বামীর উলটো দিকে বসে খেলো, কিন্তু চোখ তুলে তাকালো না। ওর সমস্ত স্নায়ুগুলো তখন টানটান হয়ে রয়েছে।

'তুমি কি এখনও রেগে আছো, ব্রিগিদা ?'

তবু ও নীরবতা ভাঙলো না।

'মালা আমার, তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু আমি ভীষণ ব্যস্ত মানুষ, তাই সব সময় আমি তোমার কাছেকাছে থাকতে পারি না। আমার বয়সে মানুষ হাজারটা কর্তব্যের দাস হয়ে ওঠে।'

'… … …'

'আজ রাতে বেড়াতে যাবে ?'

'… …'

'যেতে চাও না ? আচ্ছা বলো, রবার্তো কি মন্তেভিদিয়ো থেকে ফোন করে-ছিলো ?'

'… …'

'তোমার পোশাকটা কি সুন্দর ! নতুন না কি ?'

'… …'

'নতুন না কি, ব্রিগিদা ? কথা বলো, জবাব দাও আমাকে…'

কিন্তু এবারেও ও নীরবতা ভাঙলো না। এবং ঠিক তখুনি একটা অপ্রত্যাশিত, আশ্চর্যজনক, অসম্ভব ঘটনা ঘটে গেলো। লুইস কুর্সি ছেড়ে উঠে, প্রচণ্ড উগ্রতায় তোয়ালেটা টেবিলের ওপরে আছড়ে ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় সশব্দে টেনে দিলেন পেছনের দরজাটা।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে উঠে দাঁড়ালো ব্রিগিদাও। এমন ধারা অন্যায় অবিচারে ও রাগে আর ঘৃণায় কাঁপতে লাগলো থরথরিয়ে। বিড়বিড় করে বললো, 'আর আমি, আর আমি…প্রায় একটা বছর আমি…আর প্রথম যখন একটু রাগ দেখালাম… নাঃ, আমি চলে যাবো।…আজ রাতেই আমি চলে যাবো। আর কোনোদিনও

আমি এ বাড়িতে পা রাখবো না…' প্রচণ্ড রাগে সাজঘরের আলমারিগুলো খুলে পাগলের মতো ও পোশাকআশাকগুলোকে মেঝেতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেললো।

ঠিক তখনি কে যেন আঙুলের গাঁট দিয়ে আঘাত করলো জানলার শার্শিতে।

কিভাবে বা কোন্ অনভ্যস্ত সাহসে ব্রিগিদা তখন জানলাটার কাছে ছুটে গিয়েছিলো, তা ও নিজেই জানে না। জানলা খুলে ও দেখলো, বাইরে একটা বিশাল গাছ। প্রচণ্ড বাতাসের দমক গাছটাকে তীব্র ঝাঁকুনি দিচ্ছে আর তার ডালপালাগুলো জানলার শার্শিতে আঘাত করছে বারবার…যেন বাইরে থেকে ব্রিগিদাকে ডেকে দেখাতে চাইছে, গ্রীষ্মসন্ধ্যার আগুনে-আকাশের নিচে কিভাবে সে একটা সক্রিয় কালো শিখার মতো মুচড়ে মুচড়ে উঠছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি এসে আছড়ে পড়বে গাছটার ঠাণ্ডা পাতাগুলোতে। আহা, কি সুন্দর! সারা রাত ধরে ও বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ—কল্পনার হাজারো নালা দিয়ে বয়ে চলা জলস্রোতের মতো পাতার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়া বৃষ্টির রিনরিন শব্দ—শুনতে পাবে। সারা রাত ধরে ও শুনতে পাবে গাছের প্রাচীন গুঁড়িটা গুমরে গুমরে ওকে ঝড়ের কথা শোনাচ্ছে। আর ও তখন গুটিসুটি হয়ে শুয়ে থাকবে লুইসের খুব কাছাকাছি, স্বেচ্ছায় কেঁপে কেঁপে উঠবে বিশাল শয্যায় চাদরের নিচে ওর উষ্ণ শরীরটা।

মুঠো মুঠো মুক্তো পরম প্রাচুর্যে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে রুপোলি ছাদে। শপাঁ। ফ্রেদেরিক শপাঁর সৃষ্টি 'এতুদ'।

জিদ ধরে মৌনী হয়ে থাকা স্বামীটি বিছানা থেকে উঠে গেছে, তা অনুমানে অনুভব করে কতো দিন, কতো সপ্তাহের পর সপ্তাহ, সাতসকালে জেগে উঠেছে ব্রিগিদা?

সাজঘর: সপাটে খোলা জানলা, বাতাসে ভেসে আসা নদী আর খোলা মাঠের সুগন্ধ, কুয়াশার ছটায় অবগুণ্ঠিত আরশি।

কোনো এক লুকিয়ে থাকা জলপ্রপাতের শব্দ নিয়ে গাছটার পাতা দিয়ে বয়ে চলা বৃষ্টির ধারা যেন পর্দায় আঁকা গোলাপগুলোকেও ভিজিয়ে তোলে। শপাঁ আর ওই বৃষ্টির শব্দ ব্রিগিদার উত্তেজিত আকুল চেতনায় যেন এক হয়ে মিলেমিশে যায়।

গ্রীষ্মকালে এতো বৃষ্টি হলে কি করে মানুষ? বিষাদ কিংবা রোগমুক্তির পরে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ভান করে সারাটা দিন ঘরে বসে থাকে?

একদিন বিকেলে লুইস ভীরু পায়ে ঘরে এসে ঢুকেছিলেন। তারপর কিছুক্ষণের সংক্ষিপ্ত এক নৈঃশব্দ্য।

'ব্রিগিদা, তাহলে কথাটা সত্যি? তাহলে সত্যিই তুমি আর আমাকে ভালো-

বাসো না ?'

আচমকা বোকার মতো খুশি হয়ে উঠেছিলো ব্রিগিদা। হয়তো ও চিৎকার করে বলেই বলতো, 'না, না…আমি তোমাকে ভালোবাসি, লুইস। আমি তোমাকে ভালোবাসি।'…হয়তো ও বলেই ফেলতো কথাগুলো, যদি লুইস ওকে তা বলার সময়টুকু দিতেন—যদি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বভাবগত শান্ত স্বরে তিনি না বলতেন, 'সে যা-ই হোক, আমি মনে করি না আমাদের পক্ষে আলাদা হওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে। বিষয়টা নিয়ে অনেক কিছু চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন আছে।'

যেমন আচমকা এসেছিলো, তেমনি আচমকাই থিতিয়ে গেলো আবেগটা। অযথা উত্তেজিত হয়ে কি লাভ! স্নেহ আর পরিমিতিবোধ নিয়ে ওকে ভালোবেসে-ছিলেন লুইস। তেমন সময় এলে, উনি ন্যায্যভাবে বিচক্ষণের মতোই ওকে ঘৃণা করবেন। এবং সেটাই জীবন। জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে হিমেল শার্শিতে কপালের ভর রেখে দাঁড়ালো ব্রিগিদা। কোমল আর অবিরাম বৃষ্টিধারার আঘাত শান্ত হয়ে সয়ে যাচ্ছে ঝুপসিমাথা গাছটার পাতাগুলো। ঘরটা তখনও ছায়াঘেরা, সুশৃঙ্খল আর নিস্তব্ধ। সমস্ত কিছুই যেন থেমে গেছে, শাশ্বত আর মহান হয়ে উঠেছে। এই তো জীবন! এবং জীবন যে রকম—এই মাঝারিয়ানা—একে একটা চূড়ান্ত, প্রতিকারবিহীন জিনিস হিসেবে মেনে নেবার মধ্যেও এক ধরনের মহত্ত্ব আছে। আর এর সমস্ত কিছুর গভীর অন্তস্তল থেকে যেন একটা সুগম্ভীর স্বর জেগে উঠছে, বেরিয়ে আসছে মন্থর বিলম্বিত কয়েকটি শব্দ। ব্রিগিদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা শুনলো : চিরকাল…কোনোদিনও না।…

এইভাবে কেটে যায় ঘণ্টা, দিন, আর বছরের পর বছর। চিরকাল! কোনো-দিনও না! জীবন…জীবন!

নিজেকে ফিরে পেয়ে ব্রিগিদা বুঝতে পারে, ওর স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। চিরকাল! কোনোদিনও না!…

আর নির্জন অবিরল বৃষ্টিধারা অস্ফুটে স্বর তোলে শার্সির স্বরে স্বরে।

জলন্ত তপ্ত পঞ্জিকা থেকে গ্রীষ্ম তার পত্রালি খসিয়ে ফেলে। সোনালি তলোয়ারের মতো ঝরে পড়ে চোখ-ধাঁধানো দীপ্তিমান পাতাগুলো—নয়ানজুলির নিঃশ্বাসের মতো অস্বাস্থ্যকর আর্দ্রতার পাতা, সংক্ষিপ্ত অথচ দুরন্ত ঝঞ্ঝার পাতা আর উষ্ণ বাতাসের পাতা—যে বাতাস কার্নেশন ফুল নিয়ে এসে ছড়িয়ে রাখে এই ঝুপসিমাথা গাছটাতে।

পাশপথের পাথরগুলোকে ঠেলে তোলা বড়ো বড়ো পাকানো শিকড়গুলোর ফাঁকে ফাঁকে বাচ্চারা লুকোচুরি খেলে আর গাছটা হাসি আর ফিসফিসানিতে ভরে

ওঠে। ত্রিগিদা তখন জানলার কাছে এসে হাততালি দেয়। তাতে ভয় পেয়ে দূরে সরে যায় বাচ্চাগুলো। তাদের খেলায় অংশ নিতে চাওয়া মেয়েটির হাসিমাখা মুখ তারা লক্ষ্যও করে না কোনোদিন।

সরাসরি নদীর দিকে চলে যাওয়া ওই রাস্তাটাতে সর্বদাই বাতাস বয়ে যায়। জানলায় কনুইয়ের ভর রেখে ত্রিগিদা একা একা বহুক্ষণ ধরে ওই বাতাসে কেঁপে কেঁপে ওঠা গাছের পাতাগুলোকে লক্ষ্য করে। এ যেন জলের যাওয়া-আসা কিংবা চুল্লির জলন্ত আগুনের দিকে দৃষ্টি ডুবিয়ে রাখা। সমস্ত চিন্তা-ভাবনা থেকে বিবর্জিত হয়ে, অপার আনন্দে আবিষ্ট হয়ে এভাবে দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যায় নিজের অলস প্রহরগুলোকে।

ঘরটা সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়ায় ভরে উঠতে না উঠতেই ত্রিগিদা প্রথম বাতিটা জেলে দেয়। আর রাত্রিকে এগিয়ে আনার আগ্নেয় বাসনায় সেই প্রথম বাতিটা তখনই প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে আরশিতে আরশিতে।

রাতের পর রাত ত্রিগিদা ওর স্বামীর পাশে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ওর কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে কষ্টটা যখন ছুরিকাঘাতের মতো তীব্র হয়ে ওঠে, যখন আঘাত বা সোহাগ করার জন্যে লুইসকে জাগিয়ে তোলার একটা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত বাসনা ওকে সম্পূর্ণ দখল করে ফেলে—তখন ও পা টিপে টিপে সাজঘরে গিয়ে জানলাটা খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক শব্দলহরী আর নিরাবয়ব উপস্থিতি, রহস্যময় পদশব্দ, ডানার ঝটপটানি, গাছের মর্মর আর গ্রীষ্মরাতে তারার আঁধারে ডুবে থাকা গাছের কোটর থেকে একটা নিঃসঙ্গ ঝিঁঝি পোকার অস্ফুট গুঞ্জন ঘরটাকে ভরিয়ে তোলে। কিন্তু ঘরের মেঝের স্পর্শে ওর অবারিত নগ্ন পা দুটো ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে উঠতেই ঘোরটা কেটে যায়। ও বুঝতে পারে না, সাজঘরে নিজের দুঃখকষ্টকে ও কেন এতো সহজ করে মেনে নিতে পারে।

শপার বিষণ্ণতা যেন প্রশান্ত ব্যাকুলতায় একের পর এক 'এতুদ' দিয়ে গাঁথা, একের পর এক বিষাদের সঙ্গে যুক্ত।

তারপর শরৎ আসে। মুহূর্তের অবকাশে ঘূর্ণি তুলে সঙ্কীর্ণ বাগানের ঘাসে ঘাসে আর ঢালু রাস্তাটার পাশপথে ছড়িয়ে পড়ে শুকনো পাতার দল। ঝুপসিমাথা গাছ-টার চূড়া সবুজই থাকে, কিন্তু তলার দিকটা লাল হয়ে ওঠে—গাঢ় হয়ে ওঠে কোনো বহু ব্যবহৃত মহার্ঘ সান্ধ্য পোশাকের জীর্ণ কাপড়ের মতো। আর মনে হয়, যেন একটা নিষ্প্রভ সোনার পানপাত্রে ডুবে আছে ঘরটা।

ডিভানে শরীর বিছিয়ে ত্রিগিদা অসীম ধৈর্যে ওর পরম লগ্নের প্রতীক্ষায় থাকে —অপেক্ষা করে লুইসের অনিশ্চিত আসার আশায়। এখন ও আবার লুইসের সঙ্গে

কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে, আবার তার স্ত্রী হয়েছে—কিন্তু এখন এতে ওর রাগ নেই, উৎসাহও নেই। এখন লুইসকে ও আর ভালোবাসে না। কিন্তু এখন ও আর কষ্টও পায় না। তার বদলে এক অপ্রত্যাশিত পরিপূর্ণতা আর প্রশান্তির অনুভূতি ওকে সম্পূর্ণ অধিকার করে রেখেছে। এখন কেউ বা কোনো কিছুই ওকে আঘাত দিতে পারবে না। সুখ সুনিশ্চিতভাবেই হারিয়ে গেছে—হয়তো এই বিশ্বাসের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে প্রকৃত সুখের ঠিকানা। তখন আমরা আশা আর আশঙ্কাহীন হয়ে জীবনের পথে চলতে শুরু করি, ছোটো ছোটো আনন্দ থেকে তৃপ্তি উপভোগ করি—যেগুলো সবচাইতে বেশি দিন ধরে টিঁকে থাকে।

আচমকা একটা ভয়ঙ্কর শব্দ, তারপর একটা তীব্র আলোর ঝলকানি ব্রিগিদাকে পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে ওর।

এটা কি তবে সাময়িক বিরতি? না। ব্রিগিদা জানে, এটা সেই ঝুপসিমাথা গাছটা।

কুঠারের এক আঘাতে গাছটাকে ওরা শুইয়ে দিয়েছে। আজ খুব ভোর থেকে যে কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে, ব্রিগিদা তা শুনতে পায়নি। 'গাছটার শিকড় পাশপথের পাথরগুলোকে উপড়ে ফেলছে, কাজেই আঞ্চলিক নাগরিক সমিতি...'

বিহ্বলতায় নিজের হাত দুটোকে চোখের কাছে তুলে আনে ব্রিগিদা। তারপর দৃষ্টি সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, চোখ মেলে চারদিকে তাকায়। কি দেখছে ও? আচমকা আলোকিত হয়ে ওঠা হলঘর, নাকি চলে যেতে থাকা মানুষজন? না। এখনও ও নিজের অতীতের জালে বন্দী হয়ে আছে, এখন ও এই সাজঘর থেকে চলে যেতে পারে না। এক ভয়ঙ্কর ঝলমলে আলোর রোশনাই ওর সাজঘরে এসে হানা দিয়েছে। মনে হচ্ছে ওরা যেন ছাদটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে। চতুর্দিকে কর্কশ আলোর বন্যা...ওরা ঢুকে পড়েছে ঘরের সমস্ত ফাঁক-ফোকর দিয়ে, ঠাণ্ডায় দগ্ধ করে ফেলেছে ব্রিগিদাকে। ওই হিমেল আলোর প্রভায় সব কিছু দেখতে পাচ্ছে ও। দেখছে লুইসকে—তাঁর কুঞ্চিত মুখ, বিবর্ণ কর্কশ শিরালাঞ্ছিত হাত—আর দেখছে ঘরের চড়া রঙের পর্দাগুলোকে। ভয় পেয়ে জানলার কাছে ছুটে গেলো ও। জানলাটা খুললেই এখন সরাসরি ওই সঙ্কীর্ণ গলিটা দেখা যায়। গলিটা এতোই সঙ্কীর্ণ যে ওর ঘরটা যেন উলটো দিকের উঁচু প্রাসাদটার সামনের অংশে প্রায় ঠেকে যায়। প্রাসাদটার এক তলায় জানলার পর জানলা—জানলার কাচের আলমারিগুলো বোতলে বোঝাই। রাস্তার মোড়ে লাল রঙ করা একটা পেট্রল-স্টেশনের সামনে একসার মোটর গাড়ি। কয়েকটা ছেলে একটা বল নিয়ে পেটাপেটি করছে রাস্তার মাঝখানে।

যতো রাজ্যের কুশ্রীতা এখন ওর আরশগুলোতে ছায়া ফেলেছে। ফুটে উঠেছে নিকেলের পট্টি লাগানো ঝুল-বারান্দা, পোশাক আশাক শুকোতে দেবার বিশ্রী দড়ি-দড়া আর ক্যানারি পাখির খাঁচাগুলো।

ওরা ত্রিগিদার ব্যক্তিগত গোপনতাটুকু কেড়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে ওর গোপন রহস্যটুকু। প্রকাশ্য রাস্তায় নিজেকে এখন নগ্ন বলে মনে হচ্ছে ওর···নগ্ন ওর বৃদ্ধ স্বামীর কাছে, যে ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যে ওকে সন্তান দেয়নি। ও বুঝতে পারে না কেন ও আজ অব্দি সন্তান পেতে চায়নি, কেন সারাটা জীবন নিঃসন্তান হয়ে কাটাবার পরিকল্পনায় কাছে ও আত্মসমর্পণ করেছিলো। ও বুঝতে পারে না কি করে ও একটা বছর লুইসের হাসি—অহেতুক অতিরিক্ত খুশিয়াল হাসি, কপট হাসি—সহ্য করে এসেছে। আসলে লোকটা সচেষ্ট প্রয়াসে হাসতে শিখেছে, কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাসা প্রয়োজন।

মিথ্যে! ত্রিগিদার আত্মসমর্পণ আর প্রশান্তি—সবই মিথ্যে। আসলে ও ভালোবাসা চেয়েছিলো। হ্যাঁ, ভালোবাসা। শুধু ভালোবাসা। আনন্দ, উন্মাদনা, ভালোবাসা আর ভালোবাসা আর ভালোবাসা···

'কিন্তু ত্রিগিদা, কেন তুমি চলে যাচ্ছো?' লুইস জিগেস করলেন, 'কেন ছিলে এতোদিন?'

কি করে ওঁর প্রশ্নের জবাব দিতে হবে এবারে ত্রিগিদা তা জেনে গেছে।

'ওই গাছটা লুইস, ওই গাছটা! ওরা ওই ঝুপসিমাথা গাছটাকে কেটে ফেলেছে।'

মোজেইল

সাদাত হাসান মান্টো

উর্দু সাহিত্যে আজ যাঁর নাম সম্ভবত সবচাইতে বিতর্কিত, তিনি সাদাত হাসান মান্টো। জন্ম ১৯১২ সালে অমৃতসরের এক মধ্যবিত্ত কাশ্মীরি পরিবারে, পাঞ্জাবের সামব্রালা গ্রামে। জীবিকার খাতিরে বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন সাময়িকপত্র, বেতার, এমন কি বম্বের চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে পাকাপাকিভাবে পাকিস্তানে চলে যান। নিদারুণ দারিদ্র্য ও অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে রোগাক্রান্ত হয়ে লাহোরে তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৫৫ সালে। অনুবাদ, নাটক ও প্রবন্ধ ছাড়াও মান্টো দুশোর ওপরে গল্প লিখে গেছেন, যা এক কথায় অতুলনীয়। অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার এই মানুষটিকে অন্তত দুবার অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হতে হয়েছে।

ঝুল বারান্দায় বেরিয়ে এসে মুখ তুলে উষার আকাশের দিকে তাকালো তারলোচন। তার মনে হলো, বেশ কয়েক বছর সে এমনটি করেনি। নিজেকে কেমন যেন ক্লান্ত আর অস্থির বলে মনে হচ্ছিলো তার, মনে হচ্ছিলো একটু সতেজ বাতাসের বড়ো প্রয়োজন।

বম্বে শহরকে ঢেকে রাখা আকাশের বিশাল নিষ্কলঙ্ক তাঁবুটা একেবারে পরিষ্কার —কোথাও এতোটুকু মেঘ নেই। ছোটো ছোটো ঝিলমিলে নক্ষত্রের মতো কিছু আলো দেখতে পাচ্ছিলো তারলোচন, যেন পৃথিবীতে খসে পড়া কিছু নক্ষত্র ওই আকাশ-ঝাড়ু দেওয়া অজস্র অট্টালিকাগুলোতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

বম্বের অধিকাংশ অধিবাসীর মতো তারলোচনও একটা ফ্ল্যাটের বাসিন্দা, বাইরে সে খুব কমই যায়। কিন্তু এখন এই খোলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে ভারি ভালো লাগলো তার। এ যেন প্রায় এক নতুন অভিজ্ঞতা। তার মনে হলো, চারটে বছর সে যেন নিজের ফ্ল্যাটে বন্দী করে রেখেছিলো নিজেকে।

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে বহুক্ষণ। তারলোচন সর্বদা ফ্যানের হাওয়ায় ঘুমোয়— কিন্তু বিজলি পাখার যান্ত্রিক ঘূর্ণনে ছড়িয়ে পড়া ভারি বাতাসের তুলনায় সমুদ্র থেকে ভেসে আসা বাতাসটা অনেক হালকা আর মনোরম। তারলোচনের সমস্ত উত্তেজনা দূর হয়ে যায়। খোলা হাওয়ায় একেবারে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশান্ত বলে মনে হয় তার। এখন বেশ স্বচ্ছভাবে চিন্তা করতে পারবে সে।

কারপাল কাউর এবং ওর পুরো পরিবার যে মহল্লাতে বাস করে, সেখানে হিংস্র মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি। শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হবার পর থেকে সেখানে বহু অ-মুসলমানের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মারাও পড়েছে অনেকে। কারপাল কাউর এবং ওর গোটা পরিবারকে তারলোচন তার নিজের ফ্ল্যাটেই নিয়ে আসতে পারতো—এখানটা অনেক নিরাপদ—কিন্তু বাদ সেধেছে কর্তৃপক্ষের জারি করা আটচল্লিশ ঘণ্টার কারফিউ।

ওই অঞ্চলের মুসলমানরা প্রচণ্ড উত্তেজিত। পাঞ্জাব থেকে ক্রমাগত মুসলমান-দের ওপরে শিখদের নৃশংস অত্যাচারের সংবাদ এসে পৌঁছোচ্ছে। পাঞ্জাবের সেই ব্যাপক মুসলমান হত্যার বদলা নিতে কোনো ক্রুদ্ধ মুসলমান যে কারপাল কাউরের কি সর্বনাশ করতে পারে, তা ভাবতেও শিউরে উঠছিলো তারলোচন।

কারপাল কাউরের মা অন্ধ, বাবা পঙ্গু। নারাঞ্জন নামে ওর একটি ভাইও আছে—সম্প্রতি একটা বাড়ি তৈরির কাজ পেয়েছে বলে সে এখন অন্য এক শহরতলিতে থাকে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই নারাঞ্জনকে সপরিবারে তার ফ্ল্যাটে চলে আসার জন্যে রাজি করাবার চেষ্টা করেছে তারলোচন। বলেছে, 'আপাতত তুমি তোমার ব্যবসার কথা ভুলে যাও, নারাঞ্জন। দিনকাল বড়ো খারাপ। এখন পরিবারের সকলের সঙ্গে তোমার একত্রে থাকা উচিত। কিংবা আরও ভালো হয়, তোমরা সবাই মিলে যদি আমার ফ্ল্যাটে চলে আসো। জানি এখানে জায়গা বেশি নেই—কিন্তু এখন সময়টাও তো স্বাভাবিক নয়! সবাই মিলে কোনোমতে আমরা সেটা মানিয়ে নেবো।'

নারাঞ্জন তার ঘন দাড়ির ফাঁক দিয়ে মৃদু হেসে বলেছে, 'এটা অমৃতসর বা লাহোর নয়। বম্বেতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমি অনেক দেখেছি। সবই কেটে যায়। তাছাড়া মনে রেখো, তুমি এই শহরটাকে মোটে চার বছর হলো চেনো—কিন্তু আমি বারো বছর ধরে এর আশেপাশে রয়েছি। কাজেই আমি জানি, আমি কি বলছি।'

কিন্তু তারলোচন তবু আশ্বস্ত হতে পারেনি। সে যেন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছিলো সবকিছু। এখন সে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে গেছে যে সকালের পত্রিকায় সে যদি দেখতে পায়, আগের দিন রাতে কারপাল কাউর এবং ওর বাবা-মাকে নির্বিচারে জবাই করা হয়েছে—তাহলেও সে এতোটুকু অবাক হবে না।

কারপাল কাউরের অন্ধ মা এবং পঙ্গু বাপের জন্যে তারলোচনের তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। যদি তাঁরা খুন হয়ে যেতেন এবং কারপাল বেঁচে থাকতো, তাহলে ব্যাপারটা তারলোচনের পক্ষে অনেক সহজ হয়ে যেতো। ওর গবেট ভাইটির কি

হলো না হলো, তা নিয়েও তারলোচনের আদৌ কিছু এসে যেতো না। তার একমাত্র দুশ্চিন্তা কারপাল কাউরের জন্যে, অন্যেরা কেউ কিছু নয়।

মুখে বাতাসের স্পর্শটা ভালো লাগছিলো তারলোচনের। ফের কারপাল কাউরের কথা ভাবতে লাগলো সে। ক্ষেতে কঠিন পরিশ্রমের কাজ করতে হয় বলে গাঁয়ের সাধারণ মেয়েরা কেমন যেন পুরুষালি হয়ে ওঠে। কারপাল কাউর গাঁয়েই বড়ো হয়ে উঠেছে। কিন্তু গাঁয়ের সাধারণ মেয়েদের তুলনায় ও সম্পূর্ণ আলাদা—ও নরম-কোমল, ওর পুরোটাই মেয়েলি। ওর চোখ-মুখ সুন্দর। স্তন দুটি ছোটো, এখনও বাড়ছে। অধিকাংশ শিখ মেয়েদের তুলনায় ও বেশি ফর্সা এবং বেশি লাজুক ও অন্তর্মুখী। তারলোচন ওই একই গাঁয়ের ছেলে, কিন্তু শহরের স্কুলে পড়ার জন্যে বহু বছর আগেই সে গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছিলো। মাঝখানে বেশ কয়েকবার গাঁয়ে গেলেও কারপাল কাউরের সঙ্গে তার কোনোবারেই দেখা হয়নি, যদিও ওদের পরিবারের সঙ্গে তার পরিচয় ছিলো। বম্বেতেই কারপাল কাউরের সঙ্গে ভালো করে পরিচয় হয়েছে তার।

বম্বেতে তারলোচন যে বাড়ির বাসিন্দা, তার নাম আদভানি চেম্বার্স। ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে উষার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মোজেইলের কথা মনে হলো তার। মোজেইল একটি ইহুদি মেয়ে, এ বাড়িতে ওরও একটা ফ্ল্যাট আছে। তারলোচনের নিজের ভাষায়, এক সময় সে তার 'হাঁটু অব্দি' মোজেইলের প্রেমে ডুবে ছিলো। তার পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে কোনো মহিলার সম্পর্কে এমন অনুভূতি তার আর কোনোদিনও হয়নি।

আদভানি চেম্বার্সে এসে ওঠার প্রথম দিনেই মোজাইলের সঙ্গে হঠাৎ ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েছিলো তারলোচন। প্রথম দর্শনে তার মনে হয়েছিলো, মেয়েটা একটু খ্যাপাটে গোছের। ওর বাদামী রঙের চুলগুলো ছোটো করে ছাঁটা, সব সময়েই কেমন যেন এলোমেলো। ঠোঁটে পুরু করে লিপস্টিক মাখতো আর পরনে থাকতো সাদা রঙের একটা ঢিলে পোশাক—যার গলার কাছটা এতো গভীর করে কাটা যে সেখান দিয়ে হালকা নীল রঙের সূক্ষ্ম শিরায় রাঙানো ওর ঢলোঢলো বিশাল স্তন দুটোর প্রায় পুরোটাই দেখা যেতো। দেখে যতোটা মনে হতো, আসলে ওর ঠোঁট দুটো কিন্তু ততোটা পুরুষ্ট নয়। মুক্তহস্তে লিপস্টিকের আস্তরণ লাগাবার জন্যেই অমন মাংসের টুকরোর মতো পুরুষ্ট বলে মনে হতো ওর ঠোঁট দুটোকে।

তারলোচনের ফ্ল্যাটের ঠিক মুখোমুখি ওর ফ্ল্যাট, মাঝখানে শুধু একটা সরু বারান্দা।

ওর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাটা মনে পড়লো তারলোচনের। সে তখন

দরজার গা-তালায় চাবি ঢোকাবার চেষ্টা করছে, এমন সময় পায়ে কাঠের খড়ম পরে হাজির হয়েছিলো মোজেইল। চলার সময় ওর ওই খড়মে প্রচণ্ড আওয়াজ হতো। অলজ্জিত ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে হাসলো মোজেইল এবং তারপরেই আচমকা পিছল খেয়ে তার ঘাড়ে এসে পড়লো। তারপর সে এক দারুণ মজার ব্যাপার: পা দুটোকে দিয়ে কাঁচির মতো করে তারলোচনকে মেঝেতে পেড়ে ফেললো মোজেইল, এবং ওর গাউনটা একেবারে ওপরের দিকে উঠে গিয়ে প্রকাশ করে দিলো ওর উদার উরু দুটিকে। তারলোচন তখন উঠে পড়ার চেষ্টা করেছিলো এবং তা করতে গিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে ছুঁয়ে ফেলছিলো মোজেইলের দেহের প্রতিটি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অঙ্গকে। সে তখন ক্রমাগত ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকে আর মোজেইল ওর পোশাকটাকে টেনেটুনে সোজা করে নিয়ে মৃদু হেসে বলে, 'এই খড়মগুলো খালি পিছলে যায়।' তারপর নিজের বড়ো বড়ো আঙুলগুলোকে সাবধানে ফের খড়মের ফিতের মধ্যে ঢুকিয়ে হেঁটে চলে গিয়েছিলো মেয়েটা।

তারলোচনের আশঙ্কা ছিলো, হয়তো মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা সহজ হবে না। কিন্তু সে ভুল করেছিলো। সামান্য কয়েক দিনের মধ্যেই ওরা পরস্পরের বিশেষ বন্ধু হয়ে ওঠে। মেয়েটা যেমন একগুঁয়ে, তেমনি ওর মতিগতিরও কোনো ঠিকঠিকানা নেই। তারলোচনের সঙ্গে ও ডিনার, সিনেমা কিংবা সমুদ্রসৈকতে গেছে—কিন্তু তারলোচন ওর হাত-ধরা ছাড়া আর কিছু করার চেষ্টা করলেই, মেয়েটা তাকে সামলে থাকতে বলেছে।

এর আগে তারলোচন কখনও কারুর প্রেমে পড়েনি।···এ কি প্রেম, না কি মোহ?···লাহোর, বার্মা, সিঙ্গাপুর—গত দশ বছরে সে যেখানেই থেকেছে, দেখেছে কাজ আদায়ের জন্যে পয়সা দিয়ে মেয়েমানুষ বেছে নেওয়াটাই সবচাইতে সুবিধেজনক। একদিন বম্বের একটি ইহুদি মেয়ের প্রেমে সে যে 'হাঁটু অব্দি' ডুবে যাবে, তা সে কখনও ভাবতে পারেনি।

মোজেইলের মতিগতির সত্যিই কোনো হদিশ পাওয়া যেতো না। সিনেমায় গিয়ে হঠাৎ পেছনের সারিতে কোনো বন্ধুকে দেখতে পেলে, ও কোনো কথা-বার্তা না বলে তক্ষুণি উঠে চলে যেতো এবং বাদবাকি সময়টা তার পাশেই বসে থাকতো। রেস্তোরাঁতে গিয়েও সেই একই ব্যাপার। ওর জন্যে কোনো ভালো খাবারের ফরমাশ দিতো তারলোচন এবং তারপরই উদ্বিগ্ন নিশ্চুপতায় লক্ষ্য করতো, মোজেইল আচমকা উঠে গিয়ে পাশের টেবিলে কোনো পরিচিত মানুষের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারলোচন এসবের প্রতিবাদ জানালে ও বেশ কিছুদিন তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা বন্ধ করে দিতো, সে পীড়াপীড়ি করলে ও মাথাধরা

কিংবা পেটখারাপের ওজুহাত দেখাতো। অথবা বলতো, 'তুমি একজন শিখ। কোনো সূক্ষ্ম জিনিস বোঝার মতো ক্ষমতা তোমার নেই।'

'সূক্ষ্ম জিনিস বলতে—যেমন তোমার প্রেমিকরা ?' তারলোচন বিদ্রূপ করে বলতো।

মোজেইল তখন দুই নিতম্বে দুটো হাত রেখে পা ছড়িয়ে দাঁড়াতো, 'হ্যাঁ, আমার প্রেমিকরা। কিন্তু তাতে তোমার এমন জ্বলুনি কিসের ?'

'এভাবে আমাদের দিন চলতে পারে না,' তারলোচন বলেছে।

তাই শুনে হেসেছে মোজেইল। বলেছে, 'তুমি শুধু একজন সাচ্চা শিখই নও, তুমি একটি নির্বোধও বটে ! সে যাই হোক, আমার সঙ্গে দিন চালাতে তোমাকে কে বলেছে ? আমি তোমাকে একটা প্রস্তাব দিতে পারি। তুমি বরং তোমার পাঞ্জাবে ফিরে যাও, গিয়ে একটি শিখনিকে বিয়ে করো।'

প্রতিবার শেষ পর্যন্ত তারলোচনকেই হার মানতে হয়েছে—কারণ মোজেইল তার দুর্বলতা হয়ে উঠেছিলো, সর্বক্ষণই মোজেইলের আশেপাশে থাকতে ইচ্ছে করতো তার। অথচ প্রায়ই এখান-সেখান থেকে জুটিয়ে নেওয়া কিছু খ্রীষ্টান চ্যাংড়া ছেলের সামনে মোজেইল তাকে অপমান করতো। সে রেগে যেতো, কিন্তু বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারতো না। মোজেইলের সঙ্গে এমনি ইঁদুর-বেড়াল খেলা দু বছর অব্দি চলেছিলো, কিন্তু ততোদিন সে ওর সম্পর্কে অচল-অটলই ছিলো।

একদিন, মোজেইল তখন যথারীতি ওর খুশিয়াল মেজাজেই ছিলো, তারলোচন ওর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে জিগেস করলো, 'মোজেইল, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না ?'

মোজেইল নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একখানা কুর্সিতে গিয়ে বসলো, একাগ্র হয়ে তাকিয়ে রইলো নিজের পোশাকটার দিকে, তারপর ওর আয়ত ইহুদি চোখ দুটি তুলে, ঘন অক্ষিপক্ষ্মগুলোকে কাঁপিয়ে বললো, 'একজন শিখকে আমি ভালোবাসতে পারি না।'

'তুমি সব সময় আমাকে নিয়ে মজা করো, আমার ভালোবাসাকে নিয়ে বিদ্রূপ করো,' ক্রুদ্ধ স্বরে বললো তারলোচন।

মোজেইল উঠে দাঁড়ালো, মাথায় ঝাঁকুনি তুলে বাদামী চুলগুলোকে সরিয়ে দিলো এদিক থেকে ওদিকে, তারপর দুষ্টুমী করে বললো, 'তুমি যদি তোমার দাড়ি কামিয়ে ফেলো আর পাগড়ির নিচে রাখা লম্বা চুলগুলোকে খুলে দাও, তাহলে অনেক পুরুষমানুষই তোমার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাবে—কারণ তুমি ভীষণ সুস্বাদু !'

তারলোচনের মনে হলো, তার চুলগুলোতেও যেন আগুন ধরে গেছে।

মোজেইলকে কাছে টেনে এনে ওকে দু হাতে জাপটে ধরলো সে, তারপর নিজের দাড়ি গোঁফ ভর্তি ঠোঁট দুটো রাখলো ওর ঠোঁটের ওপরে।

'ফুঃ!' তারলোচনকে ঠেলে সরিয়ে দিলো মোজেইল, 'সকালেই আমি দাঁত মেজেছি। তোমাকে আর কষ্ট করে দাঁত মাজিয়ে দিতে হবে না।'

'মোজেইল!' চিৎকার করে উঠলো তারলোচন।

মোজেইল এতোটুকু ভ্রূক্ষেপ না করে, সব সময় সঙ্গে বয়ে বেড়ানো ব্যাগটা থেকে লিপস্টিক বের করে, নিজের ঠোঁট দুটোকে মেরামত করতে শুরু করলো। তারলোচনের দাড়ি গোঁফের নিবিড় সংস্পর্শে আসায় বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিলো ওর ঠোঁট দুটোকে।

'তোমাকে একটা কথা বলি,' খানিকক্ষণ বাদে চোখ না তুলেই মোজেইল বললো, 'তোমার লোমশ সম্পদগুলোকে কিভাবে সঠিক ব্যবহার করবে, সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই। আমার নীল রঙের স্কার্টটা থেকে ধুলো ঝাড়ার কাজে ওগুলো একেবারে নিখুঁত জিনিস হবে।'

নিজের জায়গা থেকে উঠে তারলোচনের পাশে এসে বসলো মোজেইল—তারপর খুলতে শুরু করলো তারলোচনের দাড়ির বাঁধন। তারলোচন সত্যিই সুদর্শন, কিন্তু নিষ্ঠাবান শিখ বলে সে কোনোদিন নিজের শরীর থেকে একটি চুলও কামায়নি। ফলে তার যে চেহারাটা হয়েছে, তা মোটেই স্বাভাবিক নয়। নিজের ধর্ম এবং প্রথাগুলোকে সে শ্রদ্ধা করে, ধর্মের আচার-বিচারগুলোকে বদলে নেবার কোনো ইচ্ছেই তার নেই।

'কি করছো তুমি?' প্রশ্ন করলো তারলোচন। কিন্তু ততোক্ষণে বাঁধনমুক্ত হয়ে দাড়িগুলো ঢেউয়ের মতো ঝুলে পড়েছে তার বুকের ওপরে।

'তোমার চুল এতো নরম—তাই ভাবছি, এগুলো আর আমার নীল স্কার্ট থেকে ধুলো ঝাড়ার কাজে লাগাবো না।' দুষ্টুমীর হাসি ছড়িয়ে মোজেইল বললো, 'তার চাইতে বরং কোনো সুন্দর, নরম, বুনোট করা হাতব্যাগ···'

'আমি কক্ষণো তোমার ধর্ম নিয়ে বিদ্রূপ করি না। তাহলে তুমি কেন সব সময় আমার ধর্মকে বিদ্রূপ করো? এটা ঠিক নয়। তবু আমি নিঃশব্দে তোমার সমস্ত অপমান সহ্য করেছি, তার কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি কি জানো যে আমি তোমাকে ভালোবাসি?'

'জানি,' তারলোচনের দাড়িগুলোকে ছেড়ে দিয়ে জবাব দেয় মোজেইল।

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই,' দাড়িগুলোকে ফের আটকাবার চেষ্টা করতে করতে তারলোচন জানিয়ে দেয়।

'জানি,' মাথায় সামান্য একটু ঝাঁকুনি তোলে মোজেইল। 'আমিও তোমাকে বিয়ে করবো বলে প্রায় মনস্থির করে ফেলেছি।'

'সত্যি বলছো?' তারলোচন প্রায় লাফিয়ে ওঠে।

'বলছি তো।'

অর্ধেক গোটানো দাড়ির কথা ভুলে গিয়ে মোজেইলকে আবেগে জড়িয়ে ধরে তারলোচন, 'কবে···কবে?'

তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয় মোজেইল, 'যেদিন তুমি তোমার কেশ থেকে মুক্ত হবে।'

'ওগুলো কালই বিদেয় হবে,' কোনো কিছু চিন্তা না করে জবাব দেয় তারলোচন।

'তুমি বাজে বকছো, তারলোচন।' মোজেইল সারা ঘর জুড়ে পা দাপিয়ে নাচতে শুরু করে, 'তোমার সে সাহস আছে বলে আমার মনে হয় না।'

'দেখতেই পাবে,' তারলোচন জোর দিয়ে বলে।

'দেখবো,' তারলোচনের ঠোঁটে চুমু দেয় মোজেইল এবং তারপরে যথারীতি বলে ওঠে, 'ফুঃ!'

সেদিন সারাটা রাত তারলোচন প্রায় ঘুমোতেই পারেনি। সিদ্ধান্তটা ছোটো-খাটো নয়। তবু পরদিন সে ফোর্ট অঞ্চলে এক নাপিতের কাছে গিয়ে চুল ছাঁটালো, দাড়ি কামালো। কাজটা যতোক্ষণ চলছিলো, ততোক্ষণ সে চোখ বন্ধ করে রেখেছিলো। যখন শেষ হলো, সে আরশিতে নিজের মুখখানার দিকে তাকালো। দেখতে ভালোই লাগলো। এখন বম্বের যে কোনো মেয়ের পক্ষে তার দিকে দ্বিতীয় বার, একটু বেশি সময় ধরে, না তাকিয়ে থাকা শক্ত হবে।

কেশ-বর্জনের প্রথম দিনটিতে তারলোচন তার ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোয়নি। তবে মোজইলকে এই বলে খবর পাঠিয়েছিলো যে, তার শরীর ভালো নেই এবং কিছু মনে না করলে মোজেইল যেন এক মিনিটের জন্যে তার ফ্ল্যাটে একটু আসে। ফ্ল্যাটে ঢুকে তাকে দেখে একেবারে নিশ্চল হয়ে থমকে দাঁড়ালো মোজেইল। 'তারলোচন, সোনা আমার,' চিৎকার করে উঠে তারলোচনের দুই বাহুর মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়লো ও। তারপর তারলোচনের মসৃণ গালে হাত বোলালো, আঙুল দিয়ে আঁচড়ে দিলো তার ছোটো ছোটো চুলগুলোকে এবং এমন হাসি হাঁসলো যে ওর নাক দিয়ে জল গড়াতে শুরু করলো। সঙ্গে রুমাল ছিলো না, তাই শান্তভাবে স্কার্ট তুলে নাকটা মুছে নিলো ও। তারলোচন লাল হয়ে উঠলো, 'তলায় কিছু একটা পরা উচিত তোমার।'

'পরলে, আমার কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। তাই পরি না,' জবাব দিলো মোজেইল।

'চলো, কালই আমরা বিয়েটা সেরে ফেলি।'

'অবশ্যই,' তারলোচনের চিবুকে ঘষা দিয়ে বললো মোজেইল।

ওরা পুনায় গিয়ে বিয়ে করবে বলে ঠিক করলো, কারণ সেখানে তারলোচনের অনেক বন্ধু-বান্ধব।

ফোর্ট অঞ্চলে বড়োসড়ো একটা বিভাগীয় বিপণিতে দোকানি-মেয়ের কাজ করতো মোজেইল। পরদিন ও তারলোচনকে ওর জন্যে দোকানের সামনে ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করতে বলেছিলো, কিন্তু ও নিজেই আসেনি। পরে তারলোচন জানতে পেরেছিলো, মোজেইল ওঁর এক পুরনো প্রেমিকের সঙ্গে—সম্প্রতি সে একটা নতুন গাড়ি কিনেছে—দেওলালি চলে গেছে এবং 'কিছুদিনের মধ্যে' ও আর বম্বেতে ফিরবে বলে মনে হয় না।

তারলোচন মুষড়ে পড়েছিলো, তবে সামলেও উঠেছিলো কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। এই সময়েই কারপাল কাউরের সঙ্গে তার দেখা হয় এবং ওকে সে ভালোবেসে ফেলে। এখন সে বুঝতে পারে, মোজেইল কি রকম স্থূল এবং পুরোপুরি হৃদয়হীনা ছিলো। ওকে বিয়ে করেনি বলে এখন নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেয় সে।

কিন্তু মাঝে মাঝে মোজেইলের জন্যে অভাব অনুভব করে তারলোচন। মনে পড়ে, একবার সোনার দুল কিনে দেবে বলে ওকে সে এক জহুরির দোকানে নিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু ও কিনতে চেয়েছিলো সস্তার ঝুঁটা গয়না। এই রকমই ছিলো মোজেইল। তারলোচনের সঙ্গে ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিছানায় শুয়ে থাকতো, তাকে চুমু খেতে দিতো, যতো খুশি আদর করতে দিতো—কিন্তু কিছুতেই যৌন সংসর্গে লিপ্ত হতে দিতো না। হেসে বলতো, 'তুমি শিখ, শিখদের আমি ঘেন্না করি।'

একটা ব্যাপারে ওদের সর্বদাই তর্কাতর্কি হতো এবং তা হলো, মোজেইলের কোনো অন্তর্বাস না পরার অভ্যেস। একবার মোজেইল তাকে বলেছিলো, 'তুমি একজন শিখ এবং আমি জানি, তোমরা পাতলুনের তলায় এক ধরনের হাস্যকর ছোটো ছোটো ইজের পরো—কারণ সেটা শিখ ধর্মের একটা দাবি। কিন্তু ধর্মকে পাতলুনের নিচে গুঁজে রাখতে হবে, এটা আমার কাছে একটা অর্থহীন বাজে ব্যাপার বলে মনে হয়।'

ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠা আকাশের দিকে তাকালো তারলোচন।

'জাহান্নামে যাক মোজেইল,' জোরে জোরে বললো সে এবং ঠিক করলো, ওর কথা সে আর একেবারেই চিন্তা করবে না। কারপাল কাউর এবং

ওর ওপরে ঘনিয়ে আসা অস্পষ্ট বিপদের আশঙ্কাতেই সে চিন্তিত। ইতিমধ্যেই ওদের অঞ্চলে বেশ কয়েকটা সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটে গেছে। জায়গাটা গোঁড়া মুসলমানে ভর্তি। কারফিউ থাক বা না থাক, তারা সহজেই ওদের বাড়িতে ঢুকে সবাইকে খুন করে ফেলতে পারে।

মোজেইল তাকে ছেড়ে যাবার পর থেকে তারলোচন ফের চুল দাড়ি রাখবে বলে স্থির করেছিলো। তার দাড়ি আবার বড়ো হয়েছিলো, কিন্তু এ ব্যাপারে সে একটা আপোষ করে নিয়েছিলো। দাড়ি সে খুব একটা বড়ো হতে দেবে না। তার পরিচিত একটা নাপিত আছে, সে এমন কায়দায় দাড়িগুলোকে ছেঁটে দিতে পারবে যে তা আদৌ ছাঁটা হয়েছে বলে বোঝা যাবে না।

কারফিউ এখনও চালু রয়েছে, তবে রাস্তায় একটু পায়চারি করা যায়—বেশি দূরে না গেলেই হলো। তাই করবে বলে স্থির করলো তারলোচন। বাড়ির সামনেই একটা জলের কল। তার তলায় বসে মাথা আর মুখ ধুতে শুরু করলো সে।

হঠাৎ খোয়া-বাঁধানো রাস্তায় খড়মের শব্দ শুনতে পেলো তারলোচন। তাদের বাড়িতে আরও অনেক ইহুদি মহিলা থাকেন এবং যে কোনো কারণেই হোক তাঁরা সকলেই অমনি খড়ম ব্যবহার করেন। তারলোচন ভাবলো, শব্দটা তাঁদেরই কারুর। কিন্তু আসছিলো মোজেইল। ওর পরনে যথারীতি সেই ঢিলে পোশাক এবং তারলোচন দেখলো, পোশাকের তলায় দুলে দুলে উঠছে ওর স্তন দুটি। তারলোচনের মনে হলো, মোজেইল হয়তো তার পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। তাই ওর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে একটু কাশলো সে। মোজেইল তার দিকে এগিয়ে এলো, তার দাড়িটা লক্ষ্য করলো, তারপর বললো, 'এটা কে—দ্বিতীয়বার জন্ম নেওয়া একজন শিখ?' তারলোচনের দাড়িতে হাত ছোঁয়ালো ও, 'এখনও এটা দিয়ে দিব্যি আমার নীল স্কার্টটার ধুলো ঝাড়া যায়। তবে কি না, সেটা আমি দেওলালিতে ফেলে এসেছি।'

তারলোচন কিছু বললো না। তার হাতে চিমটি কাটলো মোজেইল, 'কি গো, কিছু বলছো না কেন সর্দার সাহেব?'

ওর দিকে তাকালো তারলোচন। ওজন কমে গেছে ওর। 'তোমার কোনো অসুখ করেছিলো নাকি?' জিগেস করলো সে।

'না।'

'কিন্তু তোমাকে রোগা লাগছে।'

'নিয়ম করে খাওয়াদাওয়া করছি। তাহলে এখন তুমি ফের একজন শিখ?'

তারলোচনের পাশেই মাটিতে উবু হয়ে বসলো মোজেইল।

'হ্যাঁ।'

'অভিনন্দন রইলো। অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছো না কি ?'

'হ্যাঁ।'

'আবার অভিনন্দন! তা মেয়েটি কি এখানে, মানে আমাদের বাড়িতেই থাকে ?'

'না।'

তারলোচনের দাড়ি ধরে টানলো মোজেইল, 'এগুলো কি সেই মেয়েটির কথামতোই রাখা হয়েছে ?'

'না।'

'ত্যাখো, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি—তুমি যদি তোমার এই দাড়িগুলো কামিয়ে ফেলো, তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে করবো। শপথ করলাম।'

'মোজেইল, আমি আমার গাঁয়ের এই সাদাসিধে মেয়েটিকে বিয়ে করবো বলে ঠিক করেছি। ও একজন নিষ্ঠাবতী শিখ, তাই আমি আবার চুল-দাড়ি রাখছি।'

মোজেইল উঠে পড়লো। তারপর গোড়ালিতে ভর রেখে আধ পাক ঘুরে নিয়ে বললো, 'নিষ্ঠাবতী শিখ হলে ও তোমাকে বিয়ে করবে কেন ? তুমি যে একবার সমস্ত নিয়ম-কানুন ভেঙেছো, চুল-দাড়ি কামিয়েছো—ও কি তা জানে না ?'

'না, জানে না। যেদিন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে, ঠিক সেদিন থেকেই আমি আবার দাড়ি রাখতে শুরু করেছি—বলতে পারো, এটা এক ধরনের প্রতিশোধ। তার কিছুদিন বাদে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কিন্তু আমি যেভাবে পাগড়ি বাঁধি, তুমি বুঝতেই পারবে না যে আমার পুরো চুল নেই।'

'ওঃ, মশাগুলো এমন হতচ্ছাড়া'! উরু চুলকোবার জন্যে পোশাকটা টেনে তুললো মোজেইল। তারপর বললো, 'বিয়ে করছো কবে ?'

'জানি না,' তারলোচনের কণ্ঠে উদ্বেগের রেশ।

'কি ভাবছো, তারলোচ ?' জিগেস করলো মোজেইল।

তারলোচন ওকে সব বললো।

'তুমি একটা এক নম্বরের বুদ্ধু। সমস্যাটা কোথায় ? সোজা যাও, গিয়ে ওকে এখানে নিয়ে এসো—এখানে ও নিরাপদে থাকবে।'

'মোজেইল, তুমি এ সমস্ত জিনিস বুঝতে পারো না। এটা অমন সহজ ব্যাপার

নয়! তুমি কখনও কোনো কথার গুরুত্ব দাও না এবং তাই আমাদের ছাড়ছাড়ি হয়ে গেলো। আমি দুঃখিত!'

'দুঃখিত? ওসব কথা ছাড়ো, হাঁদারাম। কোথায় তুমি এখন চিন্তা করবে, কি করে আমরা ওকে···কি নাম যেন মেয়েটির···ওকে এখানে নিয়ে আসবো—তা নয়, তুমি আমাকে হারাবার জন্যে তোমার দুঃখের কথা ফেঁদে বসেছো। আমাদের ব্যাপারটা কোনোমতেই সফল হতো না। তোমার অসুবিধেটা কোথায় জানো? তুমি একই সঙ্গে বোকা, আর সাবধানী। এদিকে আমি চাই, আমার মরদ হবে বেপরোয়া। যাকগে, ওসমস্ত কথা ভুলে যাও। এখন চলো, গিয়ে তোমার কোথাকার কোন কাউর যেন—তাকে নিয়ে আসিগে।'

তারলোচন বিচলিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো, 'কিন্তু কারফিউ রয়েছে যে!'

'মোজেইলের জন্যে কোনো কারফিউ নেই। চলো—' তারলোচনের হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চলে ও। তারপরেই তার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

'কি হলো?' জিগেস করে তারলোচন।

'তোমার দাড়ি। তবে খুব একটা লম্বা নয়। যাই হোক, তুমি ওই পাগড়িটা খুলে নাও--তাহলে কেউ আর তোমাকে শিখ বলে মনে করবে না।'

'আমি খালি মাথায় যাবো না।'

'কেন যাবে না?'

'তুমি বুঝতে পারছো না। বিনা পাগড়িতে আমার পক্ষে ওদের বাড়িতে যাওয়াটা ঠিক নয়।'

'কেন নয়?'

'তুমি কেন বুঝতে পারছো না? ও কোনোদিনও আমাকে পাগড়ি ছাড়া দেখেনি। ও মনে করে আমি একজন সাচ্চা শিখ। ও আমাকে অন্য রকম ভাববে, সে ঝুঁকি নেবার সাহস আমার নেই।'

পা ঠুকে খড়মের আওয়াজ তোলে মোজেইল, 'তুমি শুধু একটা পয়লা নম্বরের বুদ্ধুই নও, তুমি একটি গর্দভও বটে। ওই যে তোমার কাউর—তা ওর যে নামই হোক না কেন—এটা ওর জান বাঁচাবার প্রশ্ন। বুঝেছো?'

তারলোচন তবুও হাল ছাড়তে রাজি নয়।

'ও যে কতোটা ধার্মিক, সে বিষয়ে তোমার কোনো ধারণা নেই মোজেইল। একবার আমাকে বিনা-পাগড়িতে দেখলে ও আমাকে ঘেন্না করতে শুরু করবে।'

'চুলোয় যাক তোমার প্রেম! আচ্ছা বলো তো, সব শিখই কি তোমার মতো বোকা? এক দিকে তুমি ওর জানও বাঁচাবে, আবার সেই সঙ্গে ওই পাগড়ি আর

হয়তো ওই অদ্ভুতুরে ইজেরও পরে থাকার জন্যে গোঁ ধরে থাকবে—কারণ ওগুলো তোমাদের কক্ষণো ছেড়ে থাকার কথা নয়।'

'আমি সব সময়েই, তোমার ভাষায়, ওই ইজের পরে থাকি।'

'ভালো কথা। কিন্তু ভেবে ছাখো—তুমি যে ভয়ঙ্কর জায়গাটাতে যেতে চলেছো, সেখানটা ওই রক্তপিপাসু মুসলমান আর তাদের বড়ো বড়ো মৌলানাতে বোঝাই। তুমি যদি পাগড়ি পরে সেখানে যাও তাহলে জেনে রাখো, তারা একবার তোমার দিকে তাকিয়েই মস্তো বড়ো একটা ধারালো ছুরি তোমার গলায় চালিয়ে দেবে।'

'তাতে আমি পরোয়া করিনে, কিন্তু পাগড়ি আমি পরবোই। আমি আমার জীবনের জন্যে ঝুঁকি নিতে পারি, ভালোবাসার জন্যে নয়।'

'তুমি একটি গর্দভ,' মোজেইল বিরক্ত হয়ে ওঠে। 'আচ্ছা বলো তো, তুমি যদি মরেই যাও, তাহলে ওই কাউরটি তোমার কোন কর্মে লাগবে? সত্যি বলছি, তুমি শুধু শিখই নও—একটা হাঁদা শিখ।'

'বাজে বোকো না,' তারলোচন ছোট্ট করে বলে।

মোজেইল হেসে ওঠে। তারপর দু হাতে তারলোচনের গলা জড়িয়ে ধরে নিজের শরীরটাকে সামান্য একটু দোল খাওয়ায়।

'ঠিক আছে, তুমি যেমনটি চাও—তাই হবে। তুমি তোমার পাগড়ি পরে এসো। আমি রাস্তায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।'

'তোমার একটা পোশাকটোশাক কিছু পরে নেওয়া উচিত,' তারলোচন বললো।

'আমি এভাবেই বেশ আছি,' জবাব দিলো মোজেইল।

তারলোচন ফিরে এসে দেখলো, মোজেইল রাস্তার মাঝখানে পুরুষদের মতো পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। সে কাছাকাছি আসতেই মোজেইল তার মুখে একরাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলো।

'তোমার মতো ভয়ঙ্কর মানুষ আমি জন্মেও দেখিনি,' তারলোচন বললো। 'তুমি তো জানো, আমরা শিখ—আমাদের ধূমপান করা নিষেধ!'

'চলো, যাওয়া যাক।' বললো মোজেইল।

বাজারটা জনশূন্য। সাধারণত বম্বেতে ফুরফুরে হাওয়া, কিন্তু কারফিউ যেন তাতেও ছায়া ফেলেছে—বাতাসের অস্তিত্ব প্রায় বোঝাই যাচ্ছে না। কিছু কিছু আলো জ্বলছে, কিন্তু তাদের আভা নেহাতই ক্ষীণ। সাধারণত এই সময়ে ট্রেন চলাচল শুরু হয়ে যায়, দোকানপাট খুলতে থাকে। কিন্তু এখন কোথাও জীবনের কোনো লক্ষণ নেই।

তারলোচনের আগে আগে হাঁটছিলো মোজেইল। চারদিক নিস্তব্ধ, শব্দ বলতে একমাত্র মোজেইলের খড়মের আওয়াজ। ওকে ওই বিশ্রী জিনিসটা খুলে খালি পায়ে হাঁটার কথা প্রায় বলতে যাচ্ছিলো তারলোচন। কিন্তু শেষ অব্দি আর বলেনি, কারণ মোজেইল তাতে রাজি হতো না।

তারলোচনের ভয় করছিলো। কিন্তু মোজেইল দিবি খোশ মেজাজে সিগারেট টানতে টানতে তার আগে আগে হাঁটছিলো নিরুদ্বিগ্ন প্রশান্ত ভঙ্গিতে। একটা পার্কের কাছে আসতেই একজন পুলিস ওদের গতিরোধ করলো, 'কোথায় যাচ্ছেন?' তারলোচন থমকে দাঁড়ালো, কিন্তু মোজেইল সোজা এগিয়ে গেলো পুলিসটার দিকে। তারপর মাথায় ছোট্ট একটু খুশিয়াল ঝাঁকুনি তুলে বললো, 'আরে তুমি! তুমি আমাকে চেনো না? আমি মোজেইল! আমি এর পরের রাস্তাটায় আমার বোনের বাড়িতে যাচ্ছি। আমার বোন অসুস্থ কি না! আর ওই লোকটা একজন ডাক্তার।'

পুলিসটি মনস্থির করার চেষ্টা করছিলো। মোজেইল ততোক্ষণে ওর ব্যাগ থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে লোকটার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলো, 'নাও, একটু ধূমপান করো।'

পুলিসটি সিগারেটটা নিলো। মোজেইল নিজের সিগারেট দিয়ে তার সিগারেটটাকে ধরাতে সাহায্য করলো। বুক ভরে ধোঁয়া টানলো মানুষটা। মোজেইল তাকে বাঁ চোখ এবং তারলোচনকে ডান চোখ টিপলো, তারপর ফের হাঁটতে শুরু করলো দুজনে।

তখনও ভীষণ ভয় করছিলো তারলোচনের। মোজেইলের পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে যে কোনো মুহূর্তে ছুরি খাওয়ার আশঙ্কায় ক্রমাগত বাঁ দিক আর ডান দিকে তাকাচ্ছিলো সে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মোজেইল, 'শোনো তারলোচ, ভয় পাওয়াটা ভালো নয়। ভয় পেলেই সর্বদা কোনো না কোনো ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যায়। এটা আমার অভিজ্ঞতা।'

তারলোচন কোনো জবাব দিলো না।

কারপাল কাউর যে মহল্লায় থাকে, সেখানে যাবার রাস্তাটাতে পৌঁছে গিয়েছিলো ওরা। একটা দোকান লুট হচ্ছিলো। লুটের মাল মাথায় নিয়ে যেতে থাকা একজন দাঙ্গাকারি তারলোচনের সঙ্গে ধাক্কা খেতেই, তার মাথা থেকে জিনিসগুলো মাটিতে পড়ে গেলো। লোকটা তারলোচনের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলো, তারলোচন শিখ। সঙ্গে সঙ্গে ছুরি বের করার জন্যে নিজের জামার নিচে হাত ঢোকালো সে।

মোজেইল তৎক্ষণাৎ এমন ভান করলো, যেন ও মাতাল হয়ে আছে। এক

ধাক্কায় লোকটাকে সরিয়ে দিলো ও, 'তুমি কি পাগল, যে তুমি নিজের ভাইকে খুন করার চেষ্টা করছো? এই লোকটাকেই তো আমি বিয়ে করবো!'

তারলোচনের দিকে তাকালো ও, 'করিম, তুমি ওর মালটা ওর মাথায় তুলে দাও।'

লোলুপ দৃষ্টিতে মোজেইলের দিকে একবার তাকালো লোকটা। তারপর কনুই দিয়ে ঠোনা মারলো ওর স্তন দুটিতে, 'যা, মজা লোটগে শালী!'

হাঁটতে হাঁটতে খুব শীগগিরি ওরা কারপাল কাউরদের মহল্লায় পৌঁছে গেলো।

'কোন্ রাস্তাটা?' জিগেস করলো মোজেইল।

'বাঁ দিকে তিন নম্বর রাস্তা।' তারলোচন ফিসফিসিয়ে বললো, 'মোড়ের ওই বাড়িটা।'

বাড়ির কাছাকাছি যেতেই ওরা দেখতে পেলো, একটা লোক ছুটতে ছুটতে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা পেরিয়ে বিপরীত দিকের অন্য একটা বাড়িতে ঢুকে পড়লো। সামান্য কয়েক মিনিট বাদে তিনজন লোক দ্বিতীয় বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসে ছুটতে ছুটতে কারপাল কাউরদের বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো।

মোজেইল দাঁড়িয়ে পড়লো, 'তারলোচ, তুমি তোমার পাগড়িটা খুলে নাও লক্ষ্মীটি।'

'কক্ষণো না।'

'তোমার যা খুশি হয় করো। তবে এখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে, আশা করি তুমি তা লক্ষ্য করছো।'

ভয়ঙ্কর কিছু ঘটছিলো। ওই তিনটে লোক ইতিমধ্যে কতকগুলো বস্তা নিয়ে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসেছে—ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে বস্তাগুলো থেকে। মোজেইলের মাথায় একটা মতলব খেলে গেলো।

'শোনো তারলোচ, আমি এক ছুটে রাস্তা পেরিয়ে ওই বাড়িটাতে গিয়ে ঢুকবো। তুমি তখন এমন ভান করবে, যেন তুমি আমাকে ধরার চেষ্টা করছো। কিছু চিন্তা কোরো না, যা বলছি করে যাও!'

জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে মোজেইল রাস্তা পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়িটাতে গিয়ে ঢুকে পড়ে। ওর পেছন পেছন তারলোচন। সামনের উঠোনে ঢুকে তারলোচন যখন মোজেইলকে দেখতে পায়, তখন সে রীতিমতো হাঁফাচ্ছে।

'কোন্ তলায়?' জিগেস করে মোজেইল।

'তিন।'

'চলো,' সিঁড়ির প্রতিটা ধাপে খড়মের শব্দ তুলে ওপরে উঠতে শুরু করে

মোজেইল। সর্বত্রই প্রচুর রক্তের দাগ।

তিন তলায় উঠে একটা সরু বারান্দা ধরে এগিয়ে গিয়ে একটা দরজার সামনে দাঁড়ায় তারলোচন। দরজায় টোকা দিয়ে সে নিচু গলায় ডাকে, 'মেহঙ্গা সিং-জি, মেহঙ্গা সিং-জি!'

'কে?' একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'তারলোচন।'

দরজাটা সামান্য একটু খুলে যায়। তারলোচন তার পেছন পেছন মোজেইলকে ভেতরে ঢুকতে বলে। মোজেইল দেখতে পায়, একটি ভীষণ ছেলেমানুষ আর ভারি সুন্দরী মেয়ে দরজাটার পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। মনে হয় ওর ঠাণ্ডাও লেগেছে। 'ভয় পেও না,' মোজেইল ওকে বলে, 'তারলোচন তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে।'

'সর্দার সাহেবকে তৈরি হয়ে নিতে বলো,' তারলোচন বলে, 'তবে তাড়াতাড়ি কিন্তু।'

ওপর-তলা থেকে একটা আর্তচিৎকার শোনা যায়।

'ওরা নির্ঘাত মানুষটাকে মেরে ফেলেছে,' আতঙ্কে কণ্ঠস্বর ভেঙে যায় কারপাল কাউরের।

'কাকে?' প্রশ্ন করে তারলোচন।

কারপাল কাউর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু তার আগেই মোজেইল ওকে একটা কোণে ঠেলে দিলো, 'তুমি তোমার জামা-কাপড় খুলে ফ্যালো।'

কারপাল কাউর হতভম্ব হয়ে যায়, কিন্তু মোজেইল ওকে চিন্তা করার কোনো সময় দেয় না। এক ঝটকায় ওর গা থেকে ঢিলে জামাটা খুলে নেয় মোজেইল। মেয়েটি পাগলের মতো নিজের হাত দুটোকে তুলে আড়াল করে রাখে স্তন দুটিকে। ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে ও। তারলোচন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। মোজেইল তখন নিজের কাফতানের মতো গাউনটা খুলে, কারপাল কাউরকে সেটা পরে নিতে বলে। ও নিজে তখন সম্পূর্ণ নগ্ন।

'ওকে নিয়ে যাও,' তারলোচনকে বললো মোজেইল। মেয়েটির চুলের বাঁধন খুলে দিলো ও, চুলগুলো লুটিয়ে পড়লো ওর কাঁধের ওপরে। 'যাও,' ফের বললো মোজেইল।

মেয়েটিকে দরজার দিকে ঠেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো তারলোচন। মোজেইল দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে, শীতে কেঁপে কেঁপে উঠছে সামান্য।

'যাচ্ছো না কেন?' জিগেস করলো মোজেইল।

'ওর বাবা-মায়ের কি হবে?'

'তারা জাহান্নামে যাক। তুমি ওকে নিয়ে যাও।'

'আর তুমি ?'

'আমার জন্যে চিন্তা কোরো না।'

ওরা শুনতে পেলো, রক্তপিপাসুরা সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে আসছে। পরক্ষণেই ওদের দরজায় তারা ঘুষি মারতে শুরু করলো। অন্য ঘরে কঁকিয়ে উঠলেন কারপাল কাউরের বাবা আর মা।

'এখন করার মতো একটা কাজই আছে। আমি দরজাটা খুলে দিচ্ছি।' মোজেইল তারলোচনকে বললো, 'দরজা খুলেই আমি ছুটে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকবো। তুমি আমার পিছু নেবে। এই লোকগুলো তাতে এমন বেকুব হয়ে যাবে যে তারা তখন সবকিছু ভুলে গিয়ে আমাদের পেছন পেছন আসবে।'

'তারপর ?' প্রশ্ন করলো তারলোচন।

'তখন এই মেয়েটা, তা ওর যে নামই হোক না কেন, ওই ফাঁকে এখান থেকে কেটে পড়তে পারবে। ওই পোশাকে ও নিরাপদেই থাকবে। সবাই ওকে ইহুদি বলে মনে করবে।'

দরজাটা সপাটে খুলে দিয়েই ছুটে বেরিয়ে পডলো মোজেইল। লোকগুলো কিছু চিন্তা করার সুযোগ পেলো না, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা ওর পথ করে দিলো। ওর পেছন পেছন ছুটলো তারলোচন। পায়ে কাঠের খড়ম পরে ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো মোজেইল, ওর পেছনে তারলোচন।

হঠাৎ পিছল খেয়ে সিঁড়ি দিয়ে সশব্দে নিচে পড়ে গেলো মোজেইল, মাথাটা পড়লো প্রথমে। থমকে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো তারলোচন। ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে আসছে মোজেইলের নাক কান আর মুখ দিয়ে। যে লোকগুলো ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিলো, তারা সাময়িকভাবে ভুলে গেছে কি জন্যে তারা এখানে এসেছে—তারা বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়িয়েছে মোজেইলকে। তারা তাকিয়ে রয়েছে ওর কালশিরে পড়া নগ্ন দেহটার দিকে।

তারলোচন ঝুঁকে দাঁড়ালো ওর ওপরে, 'মোজেইল···মোজেইল —'

চোখ খুলে মৃদু হাসলো মোজেইল। তারলোচন পাগড়িটা খুলে ঢেকে দিলো ওর শরীরটাকে।

'এই লোকটাকে আমি ভালোবাসি। ও একটা হতচ্ছাড়া মুসলিম—কিন্তু ও এমন খ্যাপা যে আমি সব সময় ওকে শিখ বলি,' লোকলোগুকে বললো মোজেইল।

আরও রক্ত বেরিয়ে এলো ওর মুখ দিয়ে।

'ধ্যাত্তেরি !' বললো মোজেইল। তারপর তারলোচনের দিকে তাকিয়ে এক পাশে সরিয়ে দিলো তার পাগড়িটাকে, যেটা দিয়ে তারলোচন ওর নগ্নতাকে ঢেকে দেবার চেষ্টা করেছিলো।

'সরিয়ে নাও তোমার ধর্মের এই ন্যাকড়াটাকে। এটাকে আমার দরকার নেই।'

ওর অবারিত বুকের ওপরে ওর বাহু দুটি নিস্তেজ হয়ে ঢলে পড়লো, আর কিছু বললো না মোজেইল।

নাচুনি-মেয়ে

সিপ্রিয়ান একওয়েন্সি

পশ্চিম আফ্রিকার রাজনীতিতে যেমন নক্রুমা, সাহিত্যে সিপ্রিয়ান একওয়েন্সি তেমনি এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। নাইজেরিয়ার 'ড্যানিয়েল ডেফো' নামে খ্যাত এই কথাসাহিত্যিকের জন্ম ১৯২১ সালে। শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ইবাদান, আকিমোটা, লাগোস এবং লণ্ডনে। একসময় নাইজেরিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। গৃহযুদ্ধের সময় (১৯৬৭-৭১) চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বিদ্রোহী পূর্ব নাইজেরিয়ার (বিয়াফ্রা) বেতার বিভাগে যোগ দেন। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ: 'পিপ্‌ল অফ দ্য সিটি', 'বিউটিফুল ফেদারস', 'লোকোটাউন'। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'জাগুয়া নানা'।

বাজারের একটা দোকান। দোকানের কাউন্টারে মোমবাতির বাণ্ডিল, দেশলাই আর বিভিন্ন খাবার ভর্তি টিনের কৌটো সারি সারি সাজানো। কাউন্টারের পেছনে দোকানি মেয়েটি মাথা তুলে দাঁড়াতেই কাউন্টারে আড়াআড়িভাবে ওর ছায়াটা পড়লো। বাইরে গাড়ি-রাখার জায়গাটার ওপাশ দিয়ে সপ্রতিভ এক যুবক দ্রুত হেঁটে আসছিলো। যুবকের নাম চিবো। প্রতিদিনের মতো গাড়ির চালকদের সঙ্গে আজ সে আর কোনো আলাপ-সালাপ করলো না। মিদের দোকানিকে মদ দেবার ফরমাশ করলো না কিংবা বরবটি বিক্রি করতে থাকা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চোখ মটকবার জন্যে দাঁড়ালোও না। মনে হচ্ছিলো কিসের যেন প্রচণ্ড তাড়া রয়েছে তার। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা মেয়েটির দোকান লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলো সে।

চিবো এ অঞ্চলেরই ছেলে। দেখতে শুনতেও ভালো। কিন্তু তার দিকে তাকালেই মেয়েটির মনে একসঙ্গে বেদনা আর অপরাধবোধ জেগে ওঠে। হলুদ রঙের গেঞ্জি আর লাল পাতলুনে ঢাকা চিবোর পুরুষ-শরীর এবং তার অকপট মন, যে কোনো মেয়ের কাছেই পরম বাঞ্ছিত। তাকে মনোনীত করে মেয়েটির বাবা-মা মেয়েটির জন্যে সেরা ছেলেটিকেই বেছে নিয়েছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আজ প্রায় পনেরো বছর পরে, মেয়েটির কেন যেন মনে হচ্ছে, কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। এখন চিবোর সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারটাকে ওর যেন আর অনিবার্য বলে মনে হয় না।

কাউণ্টারের কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে, পাতলুনটা একটু ওপরের দিকে টেনে নিলো চিবো। তার মুখে এতোটুকু হাসি নেই।

'শোনো আকুনমা, মোড়ল মশাই তোমাকে একবারটি গিয়ে দেখা করতে বলেছেন।'

'ও। কিন্তু তোমার মুখ ভার কেন, চিবো? কিছু গোলমাল হয়েছে? নাকি এমনিই…'

'নাঃ, কি আর হবে। মোড়ল মশাই কথাটা বলেছেন, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। ব্যাস।' চিবোর চোখ দুটো কঠোর।

'অ!' আকুনমা নিঃশ্বাস ফেললো, 'কিন্তু কেন? কি চায় সে?'

'আমি তা কি করে বলবো? কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম—তা উনি ডেকে বললেন, বাজারে গিয়ে গজদন্ত নাচুনিকে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে বলবে। তাই এলাম। তুমিই তো আমাদের গজদন্ত নর্তকী, নানকুয়ো গাঁয়ের সেরা নাচুনি-মেয়ে। তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ, লোকে তাই বলে বটে,' লাজুক স্বরে জবাব দেয় আকুনমা। 'কিন্তু আমি যে অন্য এক জায়গায় নাচবো বলে কথা দিয়েছি?'

'কাকে কথা দিয়েছো, পিটার্সকে?' চিবোর মুখে বিরস হাসি ফুটে ওঠে, 'কিন্তু সে তো এখানে নেই!'

'এখন না থাকলেও ফিরে এসে জানতে পারবে, আমি অন্য জায়গায় নেচেছি। তুমি তো জানো, নানকুয়োর মেয়েরা পিটার্স বলতে অজ্ঞান! তাকে পাবার জন্যে ওরা সবকিছু করতে পারে।'

'তাদের আর দোষ কোথায়, বলো? কলেজ থেকে পাস করা ছেলে, গলায় টাই ঝোলায়, চোখে ভাঙা বোতলের কাচের মতো চশমা লাগায়—তার ওপরে তার বাপ তাকে নাকি আবার বিলেতেও পাঠাবে। কাজেই মেয়েরা তো তার পেছনে ছুটবেই! তুমি অবিশ্যি আমার প্রেমিকা—তবু তুমিই বা ছোটাছুটিতে বাদ যাবে কেন?'

'চিবো!' আকুনমার কণ্ঠস্বরে আহত বেদনা ফুটে ওঠে। কিন্তু মাথার রুমালটা ঠিক করতে গিয়ে ওর হাত কেঁপে যায়…ভয় হয়, চিবোর কাছে ও ধরা পড়ে গেছে। 'আসলে তোমার হিংসে হয়েছে, আর কিচ্ছু নয়। যাকগে, আমি তাহলে ঘুরে আসি। তুমি ততোক্ষণ দোকানটা একটু দেখো, কেমন?' চিবোর হাতে আলতো করে চিমটি কাটলো ও, 'এক্ষুণি ফিরে আসবো।'

'আমার কিন্তু খেতের কাজ সব পড়ে রয়েছে। আমি তো আর কলেজের

ছোঁড়া নই, আমাকে খেটে খেতে হয়! চশমা আর টাই হাঁকিয়ে বাবুগিরি করার মতো সময় আমার নেই।'

মোড়ল মশাই বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখলেন আকুনমাকে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের কড়িকাঠ গুণলো আকুনমা। প্রবীণ ও বয়স্কদের এই সভাঘরের দেয়ালগুলো রকমারি জন্তু-জানোয়ারের শিঙ আর চামড়া দিয়ে সাজানো। আদ্যিকালের ঘড়িও রয়েছে কতকগুলো, তার মধ্যে গোটা কয়েক আবার অচল। আকুনমা সবচাইতে পুরনো ঘড়ির শ্লথ দোলকটার দিকে তাকিয়েছিলো, হঠাৎ দরজাটা খুলে গেলো।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঢিলেঢালা পোশাক পরা বিশাল চেহারার এক মানুষ ঢুলুঢুলু চোখে আকুনমার দিকে তাকালেন।

'সর্দার দীর্ঘজীবী হোন,' হাঁটু মুড়ে অভিবাদন জানালো আকুনমা।

'সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াও, বাছা।' সর্দার গম্ভীর গলায় বললেন, 'শোনো, আজ রাতে তোমাকে নাচতে হবে। তাই তোমাকে খবর দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছি।'

'কিন্তু সর্দার...'

'আবার কিন্তু কিসের? হুকুমটা কি আমার মুখ থেকে বেরোয়নি? বিনা প্রশ্নে গুরুজনের কথা মেনে চলতে হয়, তুমি কি তা ভুলে গেছো?'

'ক্ষমা করুন, প্রভু!'

যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে ফের কথা বলতে শুরু করেন সর্দার। কিন্তু আকুনমা বুঝতে পারে, অপ্রত্যাশিত বাধায় উনি বিরক্ত হয়েছেন। গাঁও-বুড়া নানকার মুখের ওপরে কথা বলাটা ওর পক্ষে ঠিক হয়নি।

'শোনো মেয়ে, দুজন নামজাদা লোক আজ আমার গ্রামের অতিথি হবেন। সেনেটে আমাদের প্রতিনিধি স্যার আজুমোবি আসবে গ্রাম দেখতে। এদিকে বহুদিন ধরেই আমরা গ্রামে জল সরবরাহের কথাটা সরকারকে বলে আসছি, কিন্তু এ যাবৎ তারা আমাদের কথা কানে তোলেনি। আজ আমাদের গাঁয়ের ছেলে আজুমোবির কাছেই কথাটা তুলবো। সেই পনেরো বছর আগে পিটাওয়াকায় গিয়ে আমাদের আজুমোবি সেই যে একজন মাতব্বর হলো, তারপর থেকে সে আর কক্ষণো এমুখো হয়নি। তোমার নাচ দেখিয়ে আমরা তাকে খুশি করে দেবো, তাহলে মন্ত্রীদের ধরাধরি করে সেও গ্রামের জন্যে জলের বন্দোবস্তটা করে দেবে। তাছাড়া আজুমোবি তার একটি বন্ধুকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসবে—আমেরিকার এক সাহেব। সে কেমন মানুষ জানিনে, এলে

আজুমোবির কাছে জানতে পারবো। আমাদের ভাগ্যি ভালো, সেরা নাচুনি মেয়ে আমাদের গাঁয়েই রয়েছে। তোমার সঙ্গে নাচে পাল্লা দিতে পারে, এমন মেয়ে এ তল্লাটে আর একটিও নেই। নাচ দেখে আজুমোবি নির্ঘাত খুশি হয়ে আমাদের কাজটা করে দেবে।···কি হলো, তুমি শুনতে পাচ্ছো না আমার কথা?···যাও, তোমার নাচের দলবল নিয়ে এসোগে।'

'অনুষ্ঠানটা কাল সন্ধ্যের সময় করলে হয় না?' হাঁটু মুড়ে বসে থাকা অবস্থাতেই জিগেস করে আকুনমা।

'বড়োদের মুখের ওপরে কথা বলার অভ্যেসটা ছাড়ো। তোমাকে যা বলেছি, তুমি তাই করবে।'

'মাফ করবেন, সর্দার। কিন্তু আমি···আমি আমার ভাবি স্বামীকে কথা দিয়েছি, আর কক্ষণো বাইরের লোকের সামনে নাচবো না!'

'কে তোর ভাবি স্বামী?' সর্দার চিৎকার করে ওঠেন, 'চিবো?'

'না, সে নয়। আমি···আমি পিটার্সের কথা বলছি। পিটার্স···মানে, ওই যে কলেজের···আপনি তো তাকে চেনেন!'

'ওই যে, যে ছোঁড়াটা সর্বদা গলায় টাই ঝুলিয়ে রাখে? আচ্ছা! তাহলে তাকে তো একটু দেখতে হচ্ছে!'

'ও···ও এখানে ছুটি কাটাতে এসেছে, সর্দার!'

'দ্যাখো বাপু, আমি ওসব বুঝিনে। আমি কেন, গাঁয়ের কেউই তা বুঝবে না। শুধু তোমরা, ডাগর মেয়েরাই, ওসব রঙঢঙে একেবারে মজে যাও। যাকগে, ওসব কথা থাক—তুমি তোমার দলবলের সবাইকে ডেকে নিয়ে এসোগে। আমাকে যেন জোর খাটাতে না হয়।'

'নাইজের নদীর স্টিমারগুলোর জন্যে যে লরিগুলো কয়লাখাদের শহর থেকে কয়লা বয়ে আনে, পিটার্স এখানে এসে তারই একটা লরিতে মিস্ত্রির কাজ নিয়েছে। আসলে ও যে সত্যিই কাজের মানুষ, তা দেখাবার জন্যেই ও কাজটা নিয়েছে। এখন ও সেই কয়লাখাদের শহরে গেছে। ওর বাড়ির লোকজন সেখানেই থাকে—তাদের সঙ্গে ও বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলবে, তারপর সবাই মিলে আজ রাতে আমার মায়ের কাছে অনুমতি চাইতে আসবে।···মোড়ল মশাই, এবারে আপনি নিজেই বলুন, আজ রাতে আমি নাচি কি করে!'

'তুমি কি পাগল হয়েছো, মেয়ে? আমাদের এই নানকুয়ো গ্রামে কে চেনে ওই পিটার্সকে? ওদিকে চিবোর সঙ্গে তো কতোদিন আগে থেকেই তোমার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে রয়েছে! এখন তাকে তুমি এভাবে ঠেলে সরিয়ে দেবে? না না,

বয়স্কদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতে হচ্ছে! তাছাড়া···কিন্তু তুমি এখন যাও—আর সময় নষ্ট কোরো না। বিয়ের ব্যাপারটা তুমি তোমার মা আর আমার হাতেই ছেড়ে দাও। তুমি বরং গিয়ে ওদিকটাতে মনোযোগ দাও। সন্ধ্যে হতে আর বেশি দেরি নেই, অতিথিরা কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন।'

'আমি পারবো না, আজ আমি কিছুতেই নাচতে পারবো না,' বলতে বলতে কেঁদে ফেললো আকুনমা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার ওর দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন নানকা সর্দার। আকুনমা শুনতে পেলো, ক্রুদ্ধ গলায় উনি কি যেন বলছেন অন্দর মহলে। আতঙ্কিত হয়ে উঠলো ও। সবাই জানে, সর্দার ভীষণ নিষ্ঠুর। কিন্তু আকুনমা ভেবে পায় না, কি এমন অপরাধ করেছে ও। বুঝতে পারে না, এখন ও কি করবে। কিছুটা সময় এমনি করেই কেটে যায়। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম, অথচ বুকের ভেতরে এক নিদারুণ অস্বস্তি।

হঠাৎ পাশের দরজাটা খুলে যায়। মুখোস-পরা দুটো লোক এগিয়ে এসে শক্ত হাতে ওর কবজি চেপে ধরে, যথাসম্ভব শান্তভাবে ওকে অন্দরমহলের দিকে টেনে নিয়ে যায়। ভেতরে খোলা অঙ্গন, তার এক পাশে সারি সারি কয়েকখানা ঘর। প্রতিটা ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে একটি করে মহিলা কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে রেখেছে আকুনমার দিকে। এটাই সর্দারের বিবিমহল।

লোক দুটো আকুনমাকে একটা ঘরের ভেতরে ঠেলে দিয়ে চলে গেলো। ঘরটা ভালোই। আলো বাতাস আছে। এক পাশে একটা মোটামুটি দামী খাটিয়া আর বইভর্তি একটা টেবিল। দেয়ালের আঙ্‌টা থেকে ঝোলানো জামাগুলোর কাটছাঁট ভালোই। ঘরটা কার হতে পারে, ভাবতে লাগলো আকুনমা। পরক্ষণেই দরজা খুলে সুবেশা একটি তরুণী ঘরে এসে ঢুকলো। তরুণীটি সর্দারের ছোটো বউ।

'আচ্ছা, তাহলে তুমিই সেই মেয়ে!' তরুণী হাসি মুখে বললো, 'তোমার মত বদলাবার জন্যে সর্দার আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। ছাখো, পিটার্স একটা অপদার্থ। ওর পেছন পেছন ঘুরে তোমার কোনো লাভ হবে না, আসলে ও তোমাকে ঠকাচ্ছে। দুদিন বাদে ও একজন নেতাটেতা হয়ে উঠবে—তখন তোমার মতো একটা মেয়েকে নিয়ে ওর পোষাবে কি?'

'আমি জানি, তোমার মতো মেয়ের সঙ্গেই ওকে ভালো মানায়।' আকুনমা বললো, 'তুমি তো আবার সেন্ট অ্যান কনভেন্ট থেকে পাসও করেছো, তাই না? এদিকে সর্দার ভালোমতো পড়তে বা লিখতে পর্যন্ত পারেন না, অথচ তিনিই তোমাকে বিয়ে করে বসেছেন!'

'আমার কাজ ওঁকে সাহায্য করা, সেজন্যেই আমি এখানে আছি। আমি জানি সতীনরা আমাকে দেখতে পারে না, কিন্তু তাতে আমার ভারি বয়েই গেছে!'

'তুমি স্বার্থপর, কুচুটে—তাই তোমাদের মিলটা ভালোই হয়েছে। কিন্তু আমি জানি, আসলে তুমি সর্দারকে ঠকাচ্ছো। তুমি চুপিচুপি টাকা-পয়সা জমাচ্ছো। বেশ কিছু জমিয়ে, একদিন ওঁর সমস্ত কিছু নিয়ে তুমি এখান থেকে কেটে পড়বে।'

'বাজে কথা!' তরুণী রেগে উঠলো, 'তুমি খবর্দার আমার সঙ্গে এমন করে কথা বলবে না।'

'তুমি কি মতলবে এসেছো এখানে?' জিগেস করলো আকুনমা।

'বেশ করেছি এসেছি। এটা আমার ঘর।' তরুণী বিছানায় উঠে বসলো, 'আমি তোকে বলতে এসেছি, আজ তুই না নাচলে তোর মায়ের সমস্ত জমি সর্দার কেড়ে নেবেন। জানিসই তো তোর মা কতো গরীব! জমি না থাকলে সে খাবে কি করে? অবিশ্যি তোর বাপ ওই ইরোকা গাছগুলোও রেখে গেছে—কিন্তু তার দখল নিয়ে তো এখনও ঝামেলা চলছে। সর্দার তাতেও তোর মাকে বাগড়া দিতে পারেন। অবিশ্যি তাতে তোর আর কি! তোর তো পিটার্সই রয়েছে। তোরা ছুটিতে দিব্যি কেটে পড়বি আর তোর মা বেচারী না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে।'

'শয়তান!' আকুনমা মুখ নিচু করলো, 'তোমরা দুজনেই শয়তান!'

কয়েক ঘণ্টা সময় কেটে গেলো। আকুনমা তখনও অসহায় বন্দীর মতো ঘরের এক কোণে বসে রয়েছে চুপচাপ। ইতিমধ্যে ফুলের মালা হাতে নিয়ে মেয়েরা একে একে আসতে শুরু করেছে। আকুনমার দলে পাঁচ থেকে তেরো বছর বয়সী একুশটি ছোটো ছোটো মেয়ে। প্রত্যেকেই সুন্দর। নাচের প্রতিটি জটিল ছন্দ ওরা শিখে নিয়েছে, নাচ ওদের কাছে এক অনিঃশেষ আনন্দের উৎস। পায়ে ঘুঙুরের শব্দ তুলে, সারা অঙ্গে কেমউড গাছের রঙ মেখে ওদের একজনকে আসতে দেখে আকুনমা অনুভব করলো, অতিথিদের নাচ না দেখিয়ে সর্দারের হাত থেকে নিস্তার মিলবে না। বদমাশ! নাচের মাঝখানেই পরিদর্শকের কানে মন্ত্র ঢেলে লোকটা গ্রামে জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেবে আর তার বিনিময়ে আকুনমা হারাবে ওর জীবনের সবচাইতে সেরা সুযোগ।

'কিগো, মহড়া শুরু করবে কখন?' সন্ধ্যা হতেই সর্দার ঘরের ভেতরে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার দলবল তৈরি তো? কি নাচবে আজ? ওই গজদন্ত নাচটাই বরং হোক, ওটার জন্যেই তো 'গজদন্ত নাচুনি' নাম হলো তোমার। ওটার মতো নাচ আর হয় না। তা হাতির দাঁতের বালাগুলো পালিশ করেছো তো?'

'তা আর করবে কখন,' ছোটোবউ বললো, 'সারাক্ষণ ও তো এক কোণে

ঘাপটি মেরে বসেই রইলো।'

'চলে যাও তোমরা,' আকুনমা জলে উঠলো। 'ওহ্, কেন আমার সব সাধ এমন করে নষ্ট হয়ে যাবে! গাঁয়ে সবাই বলে, আমি নাকি বেশি চটপটে—তাই কেউ আমাকে বিয়ে করতে চায় না। এমন কি চিবোও আমাকে ভয় পায়। অথচ আজ একটা ভদ্র ছেলে যেচে আমার কাছে এসেছে, কিন্তু...'

'চোপড়াও!' সর্দার ধমকে উঠলেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়! এতো যখন অবাধ্য, তখন বাধ্য হয়েই আমাকে জোর খাটাতে হবে। ঠিক আছে, সেনেটর এলে আমি তাঁকে জানিয়ে দেবো যে তোর পিটার্স ওই কয়লাখাদের শহরে যাবার রাস্তায় একটা লোককে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে। তাছাড়া আর কি করার আছে?'

'পিটার্স একজনকে মেরে ফেলেছে?' আকুনমার মুখ থেকে কথাগুলো যেন বেরোতে চায় না।

সর্দার ততোক্ষণে বাইরে চলে গেছেন।

'তুই কিছু শুনিসনি?' ছোটোবউ বললো, 'তবে খবরটা অবিশ্যি চেপে দেওয়া হয়েছে। গাড়িটা তোর পিটার্স'ই চালাচ্ছিলো। এদিকে গাড়ি চালাবার লাইসেন্সও তার নেই। তা সেটা সে পুলিসকে জানাতে চায়নি। তাই তাকে বাঁচাতে এক লরিওলা নিজের কাঁধে দোষটা নিয়ে জরিমানার টাকা দিয়ে দিয়েছে। লোকটা সত্যিই ভালো বলতে হবে।'

'সত্যি বলছো তুমি?...পিটার্স'ই দায়ী? ওই লোকটা নয়? চাপা দেবার কথাটা আমিও শুনেছিলাম। কিন্তু সে তো সেই দু মাস আগেকার কথা! পিটার্স এখানে আসার কয়েকদিন পরেই!'

'তুই ভুল শুনেছিস।'

'ওহ্, ভগবান!'...আকুনমা ছোটোবউকে বললো, 'লক্ষ্মী ভাইটি, তুমি তোমার স্বামীটিকে একটু বলো, উনি যেন ওই কথাটা আর না তোলেন! সর্দার তো তোমার ভালোবাসায় ডুবে রয়েছেন, অন্য বউদের ওপরে তোমাকে জায়গা দিয়েছেন। তোমার কথা উনি ফেলবেন না। তুমি ওঁকে ওই পুরনো ব্যাপারটা তুলতে মানা করে দাও!'

'আমি আর কি করতে পারি? তবে তুই যদি নাচতে রাজি থাকিস তো সে তখন আলাদা কথা।'

'না, তা অসম্ভব। তার চাইতে বরং মরে যাওয়াও ভালো!

সূর্যটা গাছের আড়ালে অস্ত যেতেই একটা পন্টিয়াক গাড়ি গ্রামে এসে ঢুকলো, পেছন পেছন একপাল চিৎকৃত কাচ্চাবাচ্চা! স্যার আজুমোবির পরনে গাঢ় ধূসর রঙের স্যুট। ঠোঁটের ফাঁকে চেপে রাখা চুরুটটাকে ধরাতে ধরাতে গাড়ি থেকে নেমে এলেন উনি। তাঁর পেছন পেছন গ্যাবার্ডিনের স্যুট পরা এক অ্যামেরিকান ভদ্রলোক।

'ইনিই স্যাম বিলিংস—ফিল্মের প্রয়োজক,' বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে সর্দারের পরিচয় করিয়ে দিলেন আজুমোবি। 'উনি আফ্রিকা নিয়ে একটা ছায়াছবি করছেন, তাতে একটা নাচের দৃশ্য রাখতে চান। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চয়ই ওঁকে সাহায্য করতে পারবেন?'

'হ্যাঁ, তা পারবো বৈকি! কিন্তু কথা হচ্ছে যে···ইয়ে হয়েছে,' সর্দার খানিকটা ইতস্তত করে বললেন, 'মানে···আপনাদের জন্যে রেস্টহাউস তৈরি আছে, স্যার! আপনারা ক্লান্ত, একটু সাফসুফো হয়ে নেবেন না? পোশাকআশাকও তো বদলাবেন! কাল সকালেই যখন চলে যাবেন, তখন আজ রাতেই না হয় নাচের বন্দোবস্ত করে দেবো। তবে রাত নটার আগে হবে না, স্যার। মেয়েদের তৈরি হতে সময় লাগবে তো!'

ওদের গাড়িটা রেস্টহাউসের দিকে চলে যেতেই সর্দার ফের আকুনমাকে কথাটা বলার জন্যে ভেতরে গেলেন। কিন্তু 'পিটার্সের সঙ্গে বেইমানি করতে পারবো না' ছাড়া ও আর একটি কথাও বললো না।

'কিন্তু তুই জেনে রাখ, আটটার মধ্যে পিটার্স ফিরে না এলে তোকে নাচতেই হবে।' সর্দার বললেন, 'এখন সাতটা বাজে।'

আধঘণ্টা বাদে চিবো দোকানের চাবি নিয়ে এসে আকুনমাকে জানালো, ইতিমধ্যে সে কুড়ি শিলিংয়ে একটা কাপড় বিক্রি করেছে। সত্যিই চিবো কাজের ছেলে। ব্যাকুল কণ্ঠে সে বললো, 'সারা নানকুয়োতে রটে গেছে, তুমি নাকি আজ নাচবে না বলে দিয়েছো। এমন বোকামো তুমি কেন করছো, আকুনমা?'

'কিচ্ছু বোকামো নয়।'

'তুমি আমার কথা শোনো, আকুনমা। একটু চিন্তা করে কাজ করো, লক্ষ্মীটি! সর্দারকে তুমি তো ভালো করেই চেনো!'

জঙ্গলের মাঝখানে একটা খোলা জায়গায় নাচ হবে। ঝরা পাতা ঝাড় দিয়ে সাফ করা হয়েছে জায়গাটা। মেয়েরা সেখানে কুর্সিগুলোকে সাজিয়ে রাখলো, ধুলো-ময়লা ঝেড়ে সাফ করলো বাতিগুলোকে। সর্দারের বড়োবউয়ের ঘরে সুগন্ধি

আর রঙ মেখে অপেক্ষা করছে কুড়িটি মেয়ে। বড়ো সর্দারনী তাদের কাউকে ঘুঙুর, কাউকে বালা পরিয়ে দিলেন। সমস্ত গ্রামে প্রবল উত্তেজনা, শুধু আকুনমার মুখে উত্তেজনার কোনো ছাপ নেই। ওদিকে বাজনা বাজতে শুরু করেছে।

সর্দারের সব কটি বউ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন মুখে কি যেন আলোচনায় ব্যস্ত। পিটার্সে'র এখনও কোনো পাত্তা নেই। সময় কেটে যাচ্ছে। শেষ অব্দি সর্দারনীরা কলকল করতে করতে নাচের আসরের দিকে চলে গেলো।

কোথাও এতোটুকু শব্দ হলেই আকুনমা দরজার কাছে ছুটে যাচ্ছিলো বারবার। কিছুতেই ও নিজেকে সামলে রাখতে পারছিলো না আর। উদ্বেগ অবশেষে আতঙ্ক হয়ে উঠলো। সর্দারকে নাকাল করলে শেষ অব্দি ওর যে কি হাল হবে, তা কে জানে!

ঘরের বাইরে থেকে বয়স্ক মানুষরা উঁচু গলায় ডাকলেন, 'কই রে আকুনমা? তোর কদ্দুর হলো?'

বয়স্করা চলে যাবার পরেই বিহ্বল এক যুবক ঘরে ঢুকে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তার বেশবাস এলোমেলো, সারা গায়ে ক্ষতচিহ্ন।

'একি, পিটার্স'!' আকুনমা চমকে উঠলো, 'কি হয়েছে তোমার? তোমার বাড়ির লোকজনই বা কোথায়?'

'সে অনেক গোলমেলে ঘটনা। শোনো আকুনমা, আজ তোমাকে নাচতেই হবে। সর্দারের মতলব সুবিধের নয়। তুমি নাচো, লক্ষ্মীটি। সর্দারের কথায় রাজি হয়ে তুমি নাচো···আমাকে···আমাকে বাঁচাও!'

'কিন্তু বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আমাদের বিয়ের কথাবার্তা···'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—সে সমস্ত হবে এখন। তাঁরা তো তোমার নাচের আসরে আসবেনই। নাও, তোমার হাতির দাঁতের বালাগুলো পরে নাও, সোনা! আর একটুও দেরি কোরো না! শীগগিরি নাচের আসরে চলে যাও।'

এক ছুটে বেরিয়ে যায় পিটার্স'। আকুনমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে। এ অবস্থায় কেমন করে ভালো নাচবে ও? হাতির দাঁতের বালাগুলো যেন বড্ড ভারি হয়ে উঠেছে, দুর্বল কাঁধ মুখোসটাকে আর সামলে রাখতে পারছে না। অথচ নাচের গোল অঙ্গনটাতে ঢুকতেই আকুনমার দু চোখে যেন হাজারো বাতির রোশনাই জ্বলে ওঠে, মুহূর্তের মধ্যে হালকা হয়ে ওঠা পা দুটো অজস্র জটিল তালের নৈবেদ্য সৃষ্টি করে মাটির বুকে। অসংখ্য মানুষ উৎসুক হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। হ্যাজাকের আলোয় গণ্যমান্য লোকগুলোকে দেখতে

পায় আকুনমা। সর্দার বসে আছেন মাঝখানে। তাঁর এক পাশে বসে স্যাম বিলিংস সিগারেট টানছেন—অন্য পাশে আজুমোবি। আগুনের শিখাটাকে বাতাস থেকে আড়াল করার জন্যে একটু ঝুঁকে বসে রয়েছেন উনি।

পরদিন সকালেও গায়ের ব্যথা যায়নি আকুনমার। ওর মনে তখনও আতঙ্কের থরথরানি, কানে ঘুঙুরের গুঞ্জন আর দর্শকদের প্রবল হর্ষধ্বনি। কিন্তু সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে বিলিংসের 'আবার হোক' ধ্বনি সকালবেলাতেও ওর তন্দ্রা ভেঙে দিচ্ছিলো বারবার। জেগে উঠে, ফের আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলো আকুনমা।

হঠাৎ ঘরের সামনেই কোথায় যেন চিবোর গলা শোনা গেলো। প্রাণপণ প্রয়াসে কোনো রকমে উঠে দাঁড়ালো আকুনমা। এই সকালবেলাতেই ওর জন্যে খেত থেকে এক ঝুড়ি তাজা কমলালেবু আর কলা নিয়ে এসেছে চিবো। ওর নাচের প্রশংসায় সে উচ্ছ্বসিত। তাই পিটার্সকে দেখতে না পাওয়ার প্রাথমিক হতাশাটুকুকে গোপন করে রাখলো আকুনমা। চিবো দুঃখ পেতে পারে ভেবে পিটার্স সম্পর্কে কোনো প্রশ্নও ও জিগেস করলো না।

চিবো সবিস্তারে জানাতে লাগলো, সেনেটর তাদের দীর্ঘদিনের জলের পাম্পের দাবি মিটিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে গাঁয়ের সবাই এ জন্যে বাড়তি খাজনা দেবে বলে চিবো মনে করে না। অ্যামেরিকার সাহেবটি আফ্রিকা নিয়ে যে ছবিটা তুলছেন, তাতে উনি 'গজদন্ত-নর্তকী'কে নেবেন—এমন কথাও নাকি সে শুনেছে। এবং এর সমস্ত কিছুরই মূলে রয়েছে গতকাল রাতে আকুনমার অমন দুর্ধর্ষ নাচ।

'কিন্তু কিছু কিছু লোক কি করে যে এমন ভণ্ডামি করে, আমি বুঝে পাই না।' চিবো বললো, 'আমি ওই পিটার্সের কথা বলছিলাম।'

আকুনমা দম বন্ধ করে রাখে। ওর মুখ থেকে হাসি মুছে যায়।

'পিটার্স!' ওর গলায় নামটা যেন প্রতিধ্বনির মতো শোনায়। হিমেল নীরবতায় যেন অশ্রুতই থেকে যায় ওর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ, পিটার্স। তুমি মিছিমিছি এতোদিন সময় নষ্ট করেছো, আকুনমা! গতকাল রাতে তুমি যখন ওই ছোকরার প্রাণ বাঁচাতে নাচছিলে, সে তখন সর্দারের বড়োবউটিকে নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়েছে। না, শুধু শুধু চোখের জল ফেলো না। ওরা যেমন মানুষ, ওরা তেমনি ওদের উপযুক্ত কাজই করেছে। তাছাড়া এর একটা ভালো দিকও তো রয়ে গেছে, তাই নয় কি?'

'তুমি যাও, একটু একা থাকতে দাও আমাকে!' বিছানায় ফিরে গেলো আকুনমা। চোখের জল মোছা বা ফোঁপানি বন্ধ করার কোনো চেষ্টাই করলো না নাচুনি-মেয়েটি।

পথে যেতে

মিলান কুন্দেরা

জন্ম ১৯২৯ সালে। বেশ কয়েক বছর প্রাগের ইনসটিটিউট ফর অ্যাডভান্সড সিনেম্যাটোগ্রাফিক স্টাডিজে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৬৮ সালে দেশে রুশ অনুপ্রবেশের পর বিভিন্ন অসম্মানজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালে তিনি ফ্রান্সে চলে যান এবং ১৯৭৯ সালে 'বুক অফ লাফটার অ্যাণ্ড ফরগেটিং' (পেঙ্গুইন, ১৯৮২) প্রকাশিত হবার পর তাঁর চেক নাগরিকত্বও কেড়ে নেওয়া হয়। ১৯৬৮ সালের আগেই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দ্য জোক' এবং গল্পসংকলন 'লাফেবল লাভস'। পরবর্তীকালে 'লাইফ এলস্‌হোয়্যার' ফ্রান্সে (১৯৭৩) এবং 'দ্য ফেয়ারওয়েল পার্টি (১৯৭৬) ইতালিতে শ্রেষ্ঠ বিদেশী উপন্যাসের সম্মান অর্জন করেছে।

তেল পরিমাপক যন্ত্রের কাঁটাটা আচমকা শূন্যের দিকে ঢলে পড়তেই স্পোর্টস গাড়ির তরুণ চালক জানিয়ে দিলো, গাড়িটা এতো তেল খেয়ে ফেলেছে যে তা একেবারে মাথা খারাপ করে দেবার মতো। 'দেখো, আবার যেন তেল ফুরিয়ে না যায়,' মেয়েটি (বয়েস বাইশের মতো) আপত্তি জানিয়ে বেশ কয়েকটি জায়গার কথা চালককে মনে করিয়ে দিলো, যে সমস্ত জায়গায় ইতিমধ্যেই ওই ব্যাপারটি ঘটেছে। তরুণ জবাব দিলো, সেজন্যে সে মোটেই চিন্তিত নয়। কারণ যতো বিপদই আসুক না কেন, মেয়েটি সঙ্গে থাকলে তার মধ্যেও একটা আলাদা রোমাঞ্চের আকর্ষণ থাকে। মেয়েটি প্রতিবাদ জানিয়ে বললো, বড়ো রাস্তায় যতোবার তেল ফুরিয়েছে ততোবার শুধু ওকেই রোমাঞ্চকর অভিযান করতে হয়েছে। তরুণটি লুকিয়ে থেকেছে আর ওকে নিজের আকর্ষণীশক্তির অপব্যবহার করে বুড়ো আঙুল তুলে অন্যের গাড়ি থামিয়ে, তাতে চেপে সবচাইতে কাছের পেট্রল পাম্পে যেতে হয়েছে এবং সেখান থেকে এক টিন তেল নিয়ে ফের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অন্য কোনো গাড়িতে চেপে ফিরে আসতে হয়েছে। যুবক জিগেস করলো, যে সমস্ত চালকরা ওকে গাড়িতে তুলেছে তারা ওর সঙ্গে কোনো অপ্রীতিকর ব্যবহার করেছে কি না —কারণ কথা শুনে মনে হচ্ছে কাজটা খুবই কষ্টের। মেয়েটি জবাব দিলো (অপটু ছেনালির ভঙ্গিতে), মাঝে মাঝে তারা 'খুবই' প্রীতিপ্রদ ব্যবহার করেছে বটে, কিন্তু তাতে ওর কোনো লাভ হয়নি—কারণ তেলের টিনের বোঝাটা সঙ্গে থাকায়,

কিছু শুরু করার আগেই ওকে গাড়ি থেকে নেমে পড়তে হয়েছে। 'লোভী কোথাকার!' যুবক বললো। মেয়েটি প্রতিবাদ জানিয়ে বললো, ও মোটেই লোভী নয়—আসলে যুবকটিই লোভী। ঈশ্বর জানেন, দূরপাল্লায় একা গাড়ি চালাবার সময় রাজপথে আজ অব্দি কতো মেয়ে তার গাড়ি থামিয়েছে! গাড়ি চালাতে চালাতেই যুবক এক হাতে মেয়েটির কাঁধ জড়িয়ে ওর কপালে আলতো করে চুমু দিলো। সে জানে মেয়েটি তাকে ভালোবাসে এবং তাই ওর মনে এই ঈর্ষা। ঈর্ষা জিনিসটা সদ্‌গুণের মধ্যে পড়ে না বটে, কিন্তু অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি না করলে (এবং একটু লজ্জা-শালীনতা মেশানো থাকলে) অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও তা মনকে কেমন যেন স্পর্শ করে যায়। অন্তত যুবকটি তা-ই ভাবলো। তার বয়েস মোটে আঠাশ, তাই তার ধারণা সে বুড়ো হয়ে গেছে এবং মেয়েদের সম্পর্কে একজন পুরুষমানুষের যা কিছু জানা সম্ভব তার সবই সে জেনে ফেলেছে। পাশে বসে থাকা মেয়েটির একমাত্র যে জিনিসটাকে সে দাম দেয় তা হলো, বিশুদ্ধতা—যা আজ অব্দি সে মেয়েদের মধ্যে খুব কমই দেখেছে।

ডানদিকে একটা সাইনবোর্ড দেখে যুবক যখন জানালো পেট্রল পাম্প আর সিকি মাইল দূরে, কাঁটাটা ততোক্ষণে পুরোপুরি শূন্যতে নেমে এসেছে। মেয়েটি যে কতোটা স্বস্তি পেয়েছে তা বলার মতো সময়টুকু পাবার আগেই যুবক বাঁ দিকে ঘোরার ইঙ্গিত দেখিয়ে পাম্পের সামনের জায়গাটাতে গাড়ি ঢুকিয়ে দিলো। তবে একটু এগিয়েই তাকে থামতে হলো, কারণ পাম্পের সামনেই বিশাল এক তেলের ট্রাক, তাতে মস্তোবড়ো একটা ধাতব ট্যাঙ্ক—সেটার থেকে মোটাসোটা একটা নল দিয়ে পাম্পগুলোকে ফের ভরে নেওয়া হচ্ছে।

'আমাদের অপেক্ষা করতে হবে,' মেয়েটিকে বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো যুবক। 'কতোক্ষণ লাগবে?' ঢিলে আঙ্‌রাখা পরা লোকটাকে চিৎকার করে জিগেস করলো সে।

'এক্ষুণি হয়ে যাবে,' জবাব দিলো পরিচাকরটি।

'ও-কথাটা আমি আগেও শুনেছি,' বললো যুবক। সে ভাবছিলো, ফের গাড়িতে গিয়ে বসবে—কিন্তু দেখলো, মেয়েটি ততোক্ষণে উলটো দিকের দরজা দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে।

'এই ফাঁকে একটু হেঁটে আসি,' মেয়েটি বললো।

'কোথায় যাচ্ছো?' মেয়েটির কুণ্ঠিত অস্বস্তি দেখবে বলে ইচ্ছে করেই জিগেস করলো যুবক। আজ এক বছর হলো সে মেয়েটিকে চেনে, কিন্তু এখনও তার সামনে লজ্জা পায় মেয়েটি। ওর সেই লজ্জাভরা মুহূর্তগুলোকে উপভোগ

করে যুবক, কারণ সেই মুহূর্তগুলো আগেকার পরিচিত মহিলাদের সঙ্গে ওর পার্থক্যটাকে বুঝিয়ে দেয়। তাছাড়া জাগতিক নশ্বরতা সম্পর্কে সচেতন থাকায় মেয়েটির এই লজ্জা তার কাছে আরও মহার্ঘ হয়ে ওঠে।

পথে যেতে যেতে যখন বাধ্য হয়ে কোনো গাছগাছালির জটলার সামনে সামান্য একটু সময়ের জন্যে যুবকটিকে গাড়ি থামাবার কথা বলতে হয় (যুবক আবার একটুও না থেমে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে একটানা গাড়ি চালায়), তখন মেয়েটির সত্যিই ভালো লাগে না। নকল-বিস্ময়ে যুবক তখন জিগেস করে কেন সে গাড়ি থামাবে, আর সর্বদাই রেগে ওঠে ও। ও জানে, ওর এই লজ্জাটা সত্যিই হাস্যকর আর নেহাতই সেকেলে। কর্মস্থলেও বহুবার ও লক্ষ্য করেছে সবাই ওর এই ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি করে, ইচ্ছে করে ওকে রাগিয়ে দেয়। কিভাবে লজ্জা পাবে, তাই ভাবতে গিয়ে সব সময় ও আগে থেকেই লজ্জা পেতে শুরু করে। চারদিকের অধিকাংশ মেয়ের মতো মাঝেমাঝেই ও নিজের শরীর সম্পর্কে সহজ ও স্বাধীন হতে চেয়েছে। এমন কি নিজেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাবার জন্যে একটা বিশেষ পথও আবিষ্কার করেছে : বারবার ও নিজেকে বলবে, একটা বিশাল হোটেলের কোটি কোটি ঘরের মধ্যে একজন মানুষ একটিমাত্র নির্দিষ্ট কামরাই পায়—তেমনি কোটি কোটি পাবার মতো শরীরের মধ্যে থেকে জন্মের সময় প্রতিটি মানুষ একটি করে শরীর পায়। সত্যি বলতে কি শরীর নামক বস্তুটি নৈর্ব্যক্তিক, দৈবগত—সেটা আগে থেকে তৈরি হয়ে থাকা, ধার করে পাওয়া জিনিস। কথাটা ও বারবার বিভিন্নভাবে নিজের কাছে পুনরাবৃত্তি করেছে, কিন্তু কখনই সঠিকভাবে অনুভব করতে পারেনি। শরীর ও মনের এই দ্বন্দ্ব ওর কাছে একেবারে অপরিচিত। নিজের শরীরের সঙ্গে ও বড্ড বেশি সম্পৃক্ত, তাই শরীর সম্পর্কে ও সর্বদা এতো উৎকণ্ঠা অনুভব করে।

যুবকটির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিয়েও মেয়েটি সেই একই উৎকণ্ঠা অনুভব করে। যুবকটিকে ও আজ এক বছর ধরে চেনে এবং তাকে নিয়ে ও সুখী—তার কারণ, হয়তো সে কখনও ওর আত্মা থেকে শরীরটাকে বিচ্ছিন্ন করেনি, তাই তার সঙ্গে ও একেবারে 'সম্পূর্ণ' হয়ে থাকতে পারে। এই একত্বের মধ্যে সুখ আছে, কিন্তু সুখের ঠিক পেছনেই ওত পেতে থাকে সন্দেহ, আর মেয়েটি সেই সন্দেহে বোঝাই। যেমন, মেয়েটির প্রায়ই মনে হয় যে অন্য মেয়েরা (যাদের মনে কোনো উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নেই) ওর চাইতে অনেক বেশি আকর্ষণীয়া এবং অনেক বেশি মোহময়ী। ওই ধরনের মেয়েদের সঙ্গে তার যে ভালোমতোই মেলামেশা ছিলো তা ওই যুবক

কখনই লুকোয়নি। কাজেই কোনো একদিন সে হয়তো তেমনি কোনো মেয়ের জন্তে ওকে ছেড়ে চলে যাবে। (এ কথা সত্যি যে যুবকটি জানিয়ে দিয়েছে, ওই সমস্ত মেয়েদের সঙ্গে সে যা মেলামেশা করেছে তা এ জন্মের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মেয়েটি জানে, যুবক নিজেকে যা মনে করে তার চাইতে সে এখনও অনেক তরুণ।) মেয়েটি চায় যুবক পুরোপুরি শুধু ওরই হবে এবং ও-ও হবে পুরোপুরি শুধু তার। কিন্তু প্রায়ই ওর মনে হয়, ও যতোই যুবকটিকে সবকিছু দেবার চেষ্টা করে ততোই কি যেন একটা দিতে পারে না—দিতে পারে না ঠিক সেই জিনিসটি যা মানুষ পায় হালকা অগভীর প্রেম কিংবা ছেনালিপনার কাছ থেকে। গভীরতার সঙ্গে হালকা খুশি মেশাতে পারে না বলে দুশ্চিন্তা হয় মেয়েটির।

কিন্তু এখন ও কোনো দুশ্চিন্তা করছে না এবং তেমন কোনো কথা এখন ওর মন থেকে অনেক দূরে। বেশ লাগছে ওর। আজ ওদের ছুটির প্রথম দিন (দু সপ্তাহের ছুটি—যা নিয়ে পুরো একটা বছর ও স্বপ্ন দেখেছে), আকাশটা নীল (আকাশ সত্যিই নীল থাকবে কি না, ভেবে গোটা বছরটাই ও দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছে), এবং ওর পাশে রয়েছে যুবকটি। তার 'কোথায় যাচ্ছো ?' প্রশ্নটা শুনে লাল হয়ে উঠলো মেয়েটি, কোনো কথা না বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো ও, হাঁটতে লাগলো পেট্রল পাম্পটার সীমানা ধরে। রাজপথের পাশে একটা সম্পূর্ণ নির্জন অঞ্চলে পাম্পটার অবস্থিতি, চারদিকে ফাঁকা মাঠ। প্রায় শ-খানেক গজ দূরে (ওরা যেদিক পানে যাচ্ছিলো) একটা জঙ্গল শুরু হয়েছে। সেদিকে রওনা দিয়ে ছোট্ট একটা ঝোপের আড়ালে উধাও হয়ে গেলো মেয়েটি, নিজেকে ও বিলিয়ে দিলো নিজের খোশ মেজাজের কাছে। (ভালোবাসার মানুষটির উপস্থিতি ও সব চাইতে বেশি উপভোগ করে নিঃসঙ্গ নির্জনতায়। উপস্থিতিটা একটানা হলে আনন্দটাও বারবার হারিয়ে যেতো। একমাত্র যখন ও একা, তখনই ও আনন্দটাকে 'ধরে' রাখতে পারে।)

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠে মেয়েটি পেট্রল পাম্পটা দেখতে পেলো। তেলের বিশাল ট্রাকটা তখন পাম্প থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আর স্পোর্টস গাড়িটা এগিয়ে গেছে তেল ভরার লাল মিনারটার দিকে। রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো ও, আর মাঝে মাঝে পেছনে ফিরে ফিরে দেখতে লাগলো স্পোর্টস গাড়িটা আসছে কিনা। অবশেষে গাড়িটাকে দেখতে পেলো ও এবং থেমে গিয়ে হাত নাড়তে শুরু করলো—যেন গাড়িতে চেপে এগিয়ে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো অচেনা লোকের গাড়ির দিকে হাত নাড়ছে কোনো অজ্ঞাত পথিক।

গাড়িটা গতি শ্লথ করে মেয়েটির একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালো। জানলার

দিকে ঝুঁকে, কাচ নামিয়ে, যুবক মৃদু হাসলো, 'কোথায় যাবেন, মিস ?'

মেয়েটি চট করে সামান্য একটু হাসি ছড়ালো যুবকের দিকে, 'আপনি কি বিস্‌ত্রিৎসায় যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ, উঠে আসুন,' দরজা খুলে দিলো যুবক। মেয়েটি ভেতরে ঢুকে পড়লো, গাড়িও চলতে শুরু করলো।

বান্ধবী খুশির মেজাজে থাকলে যুবকটির সর্বদাই ভালো লাগে। কিন্তু প্রায়শই তা হয় না। মেয়েটির চাকরিটা যথেষ্ট ক্লান্তিকর, পরিবেশও বিশ্রী, ক্ষতিপূরক ছুটি ছাড়াই বেশ কয়েক ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করতে হয়—ওদিকে বাড়িতে আবার অসুস্থ মা। তাই প্রায়ই ও ক্লান্তি অনুভব করে। স্নায়ুর জোর বা আত্মবিশ্বাস কোনোটাই তেমন ভালো না থাকায়, খুব সহজেই ও উদ্বেগ এবং আতঙ্কে ডুবে যায়। এই জন্যেই ওর প্রফুল্লতার প্রতিটি বহিপ্র্কাশকে যুবক একজন পালক-পিতার মমতাময় উৎকণ্ঠা নিয়ে স্বাগত জানায়। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে সে বললো, 'আজ আমার ভাগ্যটা ভালো। পাঁচ বছর ধরে গাড়ি চালাচ্ছি, কিন্তু এমন সুন্দরী মেয়েকে কোনোদিনও গাড়িতে চাপাইনি !'

মেয়েটি স্তাবকতার প্রতিটি কণার জন্যে যুবকের কাছে কৃতজ্ঞ এবং তার ওই মিষ্টি-কথার উষ্ণতার মধ্যে আরও এক লহমা থাকতে ইচ্ছে করে ওর। তাই ও বললো, 'আপনি মিথ্যে কথা বলায় খুব ওস্তাদ !'

'আমাকে দেখে কি মিথ্যেবাদী বলে মনে হয় ?'

'দেখে মনে হয়, মেয়েদের কাছে মিথ্যে বলতে আপনার খুব ভালো লাগে,' বললো মেয়েটি এবং ওর অজান্তেই ওর কথাগুলোর মধ্যে সেই পুরনো দুশ্চিন্তাটার ছোঁয়া লেগে গেলো—কারণ ও সত্যিই বিশ্বাস করে, ওর তরুণ সঙ্গীটি মেয়েদের কাছে মিথ্যে বলতে ভালোবাসে।

মেয়েটির ঈর্ষা প্রায়শই যুবককে বিরক্ত করে তোলে। কিন্তু এবারে সে সহজেই ওর কথাগুলোকে উপেক্ষা করতে পারলো। কারণ শত হলেও কথাগুলো বলা হয়েছে একজন অজানা চালককে উদ্দেশ করে, কাজেই তার সম্পর্কে ওগুলো খাটে না। তাই হালকা চালে সে প্রশ্ন করলো, 'তাতে আপনার কিছু এসে-যায় কি ?'

'আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকলে এসে-যেতো,' মেয়েটি বললো। 'কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনিই না, কাজেই আমার তাতে কিছুই এসে যায় না।'

ওর কথার মধ্যে যুবকটির উদ্দেশে একটা সূক্ষ্ম, শিক্ষামূলক বার্তা ছিলো। কিন্তু বাক্যের শেষ অংশটা শুধুমাত্র সেই অজানা চালকের সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

'নিজের মানুষটির বেলায় মেয়েরা অনেক জিনিসই পছন্দ করে না, অচেনা মানুষের বেলায় কিন্তু অতোটা নয়।' (এখন এটা আবার মেয়েটির প্রতি যুবকের সূক্ষ্ম শিক্ষামূলক বার্তা) 'তা আমরা যখন পরস্পরের অপরিচিত, আমরা তো দিব্যি জমিয়ে নিতে পারি!'

মেয়েটি ইচ্ছে করেই যুবকের বার্তার অন্তর্নিহিত অর্থটা বুঝতে চাইছিলো না। তাই এবারে ও শুধুমাত্র সেই অজানা চালকের উদ্দেশেই বললো, 'ক্ষতি কি? সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যেই তো আমরা আবার আলাদা হয়ে যাবো।'

'কেন?' যুবক প্রশ্ন করলো।

'আমি তো বিস্ত্রিৎসায় নেমে যাচ্ছি।'

'আর আমিও যদি তোমার সঙ্গে নেমে পড়ি?'

কথাটা শুনে মেয়েটি চোখ তুলে যুবকের দিকে তাকিয়ে দেখলো, ঈর্ষাকণ্টকিত চরম মানসিক যন্ত্রণার সময় ও যেমনটি কল্পনা করেছিলো, যুবককে এখন ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। মানুষটা যেভাবে ওর চাটুকারিতা করছে, ওর সঙ্গে (এক অজানা যাত্রিনীর সঙ্গে) ফষ্টিনষ্টি রঙ্গরসিকতা করছে এবং তাতে মানুষটাকে 'কেমন মানিয়ে যাচ্ছে'—তা দেখে শঙ্কিতা হয়ে উঠলো মেয়েটি। তাই উশকে দেবার মতো তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ও প্রশ্ন করলো, 'তাহলে আমাকে নিয়ে কি করবেন আপনি?'

'তোমার মতো একটি সুন্দরী মহিলাকে নিয়ে কি করবো, তা নিয়ে আমাকে খুব একটা ভাবতে হবে না,' মনোরঞ্জনের সুরে বললো যুবক এবং এই মুহূর্তে সে আবার তার প্রেমিকার সঙ্গেই কথা বললো, গাড়িতে চাপতে চাওয়া অপরিচিতা মেয়েটির সঙ্গে নয়।

কিন্তু যুবকের এই স্তাবকতা শুনে মেয়েটির মনে হলো, ও যেন যুবকের কোনো অপকর্ম ধরে ফেলেছে, যেন মিষ্টি কথার চাতুরিতে ভুলিয়ে তার কাছ থেকে কোনো স্বীকারোক্তি কবুল করিয়ে নিয়েছে। সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের জন্যে যুবকের প্রতি এক সুতীব্র ঘৃণা অনুভব করলো ও, 'নিজের সম্পর্কে আপনি বড্ড বেশি সুনিশ্চিত, তাই নয় কি?'

মেয়েটির দিকে তাকালো যুবক। ওর তাচ্ছিল্যেভরা মুখখানাকে যেন সম্পূর্ণ বিকৃত, আক্ষিপ্ত বলে মনে হলো তার। ওর জন্যে দুঃখ অনুভব করলো সে, ওর মুখের স্বাভাবিক ও পরিচিত অভিব্যক্তিটা দেখতে ইচ্ছে করলো তার (যেটাকে সে সরল ও ছেলেমানুষী বলতো)। মেয়েটির দিকে ঝুঁকে, ওর কাঁধে নিজের হাত মেলে দিলো যুবক এবং মৃদুভাবে সেই নাম ধরে ডাকলো যে নামে সাধারণত সে

ওকে ডেকে থাকে—এইভাবেই খেলাটাকে এখন থামাতে চাইছিলো সে।

কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি বললো, 'আপনি একটু বেশি তাড়াতাড়ি এগুচ্ছেন!'

এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যানে যুবক বললো, 'মাফ করবেন।' তারপর নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো সামনের রাজপথের দিকে।

মেয়েটির করুণ-ঈর্ষা অবিশ্যি যতো তাড়াতাড়ি এসেছিলো, তেমনি দ্রুতই চলে গেলো। শত হলেও ওর বুদ্ধিসুদ্ধি আছে এবং ও ভালোমতোই জানে যে এর পুরোটাই স্রেফ একটা খেলা। এমন কি যে ঈর্ষাময় ক্রোধের প্রকোপে ও নিজের প্রেমিককেও ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে—সেটাও ওর কাছে এখন সামান্য হাস্যকর বলে মনে হলো। যুবক যদি জানতে পারে কেন ও অমনটি করেছিলো, তাহলে সেটা ওর পক্ষে খুব একটা প্রীতিকর হবে না। ভাগ্যক্রমে মেয়েদের একটা আশ্চর্য অলৌকিক ক্ষমতা আছে—কোনো কিছু ঘটে যাবার পরেও তারা নিজেদের কাজ-কর্মের মানেটা বদলে ফেলতে পারে। এই ক্ষমতাটা কাজে লাগিয়ে মেয়েটিও স্থির করে নিলো : রাগ করে নয়—যুবককে ও সরিয়ে দিয়েছে, যাতে ও আরও খানিক-ক্ষণ খেলাটা চালিয়ে যেতে পারে—খামখেয়ালিপনা নিয়ে যে খেলাটা এমন চমৎকার মানিয়ে গেছে ওদের ছুটির প্রথম দিনটাতে। তাই ফের ও বিনা-ভাড়ায় পথ-চলতি গাড়িতে উঠতে চাওয়া অজানা একটি মেয়ে হয়ে গেলো, যে এইমাত্র গাড়ির অতি-উৎসাহী চালকটিকে বিমুখ করেছে—কিন্তু সেটা ও করেছে চালকের বিজয়পর্বকে একটু বিলম্বিত করতে, ব্যাপারটাকে আরও উত্তেজনাময় করে তুলতে। যুবকের দিকে অর্ধেকটা ঘুরে বসে ও সোহাগী সুরে বললো, 'আমি কিন্তু আপনাকে আঘাত করতে চাইনি!'

'মাফ করবেন,' যুবক বললো, 'আমি আর আপনার গায়ে হাত দেবো না।'

মেয়েটির ওপরে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলো যুবক—কারণ মেয়েটি তার কথা শুনছিলো না, তার ইচ্ছা অনুযায়ী ও নিজের প্রকৃত সত্তায় ফিরে যাচ্ছিলো না। এবং যেহেতু মেয়েটি জোর করেই অভিনয় চালিয়ে যেতে চাইছিলো, তাই যুবকটিও তার সমস্ত রাগ গাড়িতে-চাপতে-চাওয়া ওই অজানা যাত্রিণীর ওপরে নিয়ে ফেললো, যার ভূমিকায় অভিনয় করছে মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভূমিকাটাও আবিষ্কার করে ফেললো যুবক : একটু ঘুরপথে প্রেমিকার মনোরঞ্জনের জন্যে যে তোষামুদে মন্তব্যগুলো সে করছিলো, সেগুলো বলা সে বন্ধ করে দিলো। এবারে সে একটা কড়া-লোকের ভূমিকায় অভিনয় করতে শুরু করলো, যে লোকটা পৌরুষত্বের

নির্মম রুক্ষতা নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে—প্রকাশ করে নিজের স্বেচ্ছাচারিতা, বিদ্রূপ আর আত্মনির্ভরতা।

কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে যুবক মমতাময় ব্যবহারেই অভ্যস্ত, এবং এই ভূমিকাটা তার ঠিক বিপরীত। সত্যি বলতে কি, এই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হবার আগে পর্যন্ত অন্য মহিলাদের সঙ্গে সে কখনও রুক্ষ ছাড়া কোমল ব্যবহার করেনি। কিন্তু তাই বলে তাকে কখনও একটা হৃদয়হীন গুণ্ডা বলেও মনে হয়নি, কারণ সে কোনো-দিনও বিশেষ কোনো জেদ অথবা নির্মমতা প্রকাশ করেনি। তবে তাকে দেখে মস্তান বলে মনে না হলেও, একসময় সে অমনি কিছু হবার 'বাসনা' পোষণ করতো। বাসনাটা অবিশ্যি নেহাতই সাদামাঠা, কিন্তু সেটা ছিলো। বয়স্ক মনের সমস্ত প্রলোভন প্রতিরোধ করে শিশুসুলভ বাসনাগুলি প্রায়শই বৃদ্ধ বয়স অব্দি টিকে থাকে। এবং যুবকের এই শিশুসুলভ বাসনাটা এখন দ্রুত ওই উপস্থাপিত ভূমিকাটাতে নিজেকে মূর্ত করে তোলার সুযোগটা গ্রহণ করলো

যুবকের বিদ্রূপাত্মক গাম্ভীর্য মেয়েটির পক্ষে খুবই সুবিধেজনক হলো—সেটা নিজের কাছ থেকে ওকে মুক্ত করে দিলো। কারণ সবচাইতে বড়ো কথা, মেয়েটি নিজে একটি হিংসের পুঁটুলি। যে মুহূর্তে ও পাশে বসে থাকা সুতীব্র-মোহময় যুবকটির দিকে তাকানো বন্ধ করলো, শুধু তার দুর্বোধ্য মুখটাই দেখলো—সেই মুহূর্তেই ওর হিংসেটা থিতিয়ে গেলো। নিজেকে ভুলে গিয়ে নিজের ভূমিকাটার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলো ও।

ওর ভূমিকা? কোন্‌টা ওর ভূমিকা? একটা অখাদ্য বাজে সাহিত্য থেকে নেওয়া একটা ভূমিকা। অজানা একটি মেয়ে যুবকের গাড়িটা থামিয়েছে তার গাড়িতে চেপে কোথাও যাবার জন্যে নয়, গাড়িটা যে চালাচ্ছে তাকে মজাবার জন্যে। লুব্ধ করে তোলার মতো অনেক ছলাকলা জানা আছে তার। নিজের সৌন্দর্যকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় তাও ও ভালোভাবেই জানে। এই বোকা বোকা রোম্যান্টিক ভূমিকায় মেয়েটি এতো সহজে ডুবে গেলো যে তা ওকেই বিস্মিত করে তুললো, মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলো।

শুধু হালকা-খুশির আনন্দ ছাড়া যুবকটির জীবনে আর কোনো অভাববোধ ছিলো না। নিখুঁত স্পষ্টতায় আঁকা ছিলো তার জীবনের প্রধান সড়কটা। তার চাকরি সারাটা দিনের মধ্যে শুধুমাত্র আটটা ঘণ্টাই খরচ করতো না, সভাসমিতির আবশ্যিক একঘেয়েমি এবং বাড়িতে পড়াশোনার মাধ্যমে তা ঢুকে পড়েছিলো তার বাকি সময়টাতেও। ব্যক্তিগত জীবনের জন্যে সামান্য যেটুকু সময় তখনও বাকি

থাকতো, চাকরিটা তার মধ্যেও হাত বাড়াতো অসংখ্য পুরুষ ও মহিলা সহকর্মীর সৌজন্যতার রূপ ধরে। ফলে তার এই ব্যক্তিগত জীবন কখনই গোপন থাকতো না, এমন কি মাঝে মাঝে তা আড্ডা এবং সমবেত আলোচনার বিষয়বস্তুও হয়ে উঠতো। দু সপ্তাহের এই ছুটিটা তাকে মুক্তি বা রোমাঞ্চের কোনো অনুভূতি এনে দেয়নি। এখানেও নির্ভুল পরিকল্পনার ধূসর ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে সর্বত্র স্থানাভাব হয় বলে তাকে বাধ্য হয়েই ছ মাস আগে তাত্রায় একটা ঘর ঠিক করতে হয়েছে এবং ওই জন্যে তাকে অফিস থেকে সুপারিশপ নিতে হয়েছিলো বলে তার প্রতি মুহূর্তের কার্যকলাপ অফিসের সর্বত্র ছড়িয়ে-থাকা-মস্তিষ্কের কাছে আদৌ অজানা থাকেনি।

এর সমস্ত কিছুর সঙ্গেই যুবক নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলো। তবু সিধে সড়ক সম্পর্কে ভয়ঙ্কর ভাবনাটা মাঝে মাঝেই তাকে দিশেহারা করে তোলে। তার মনে হয় ওই পথটা ধরে সে ক্রমাগত তাড়া খেয়ে ছুটে চলেছে, সবাই তাকে দেখতে পাচ্ছে, অথচ সে পথটা ছেড়ে সরে যেতে পারছে না। এই মুহূর্তে সেই চিন্তাটা আবার তার মনে ফিরে এলো। কয়েকটা ধারণার এক অদ্ভুত ও সংক্ষিপ্ত মিলনে কল্পনার সেই সড়কটা বাস্তবের এই রাজপথের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলো, যার ওপর দিয়ে সে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে এবং এর ফলস্বরূপই যুবক আচমকা একটা পাগলামো করে বসলো।

'তুমি যেন কোথায় যেতে চাও বললে?' মেয়েটিকে জিগেস করলো সে।

'বানস্কা বিস্ত্রিৎসায়,' জবাব দিলো মেয়েটি।

'সেখানে গিয়ে কি করবে?'

'একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।'

'কার সঙ্গে?'

'এক ভদ্রলোকের সঙ্গে।'

গাড়ি একটা বড়োসড়ো চৌমাথার কাছে এসে গিয়েছিলো। পথের নির্দেশ পড়ার জন্যে চালক গাড়ির গতি শ্লথ করলো, তারপর ডানদিকে ঘুরলো।

'দেখা করার জন্যে তুমি সেখানে না পৌছুলে কি হবে?'

'সেটা আপনার দোষ হবে আর তাহলে আমার দেখাশোনার ভার আপনাকেই নিতে হবে।'

'তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করোনি, আমি নোভে জামকির দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়েছি।'

'সত্যি? আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন না কি!'

'ভয় পেয়ো না, আমি তোমার দেখাশুনো করবো,' যুবক বললো।

গাড়ি চালাতে চালাতে এইভাবে গল্প করতে লাগলো ওরা দুজনে—গাড়ির চালক আর মেয়েটি, যারা কেউ কাউকে চেনে না।

খেলাটার গতি একেবারে আচমকা দ্রুততর হয়ে উঠেছে। স্পোর্টস গাড়িটা শুধু তার কাল্পনিক গন্তব্যস্থল বানস্কা বিসত্রিৎসা থেকেই দূরে সরে যাচ্ছে না, সরে যাচ্ছে তার সত্যিকারের গন্তব্য তাত্রা আর আগে থেকে ঠিক করে রাখা সেই ঘরটা থেকেও, যার উদ্দেশ্যে ওরা সকালবেলাতেই রওনা হয়েছিলো। অলীক কল্পনা আচমকা এসে আঘাত হানতে শুরু করেছে বাস্তব জীবনকে। যুবকটি তার নিজের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে—সরে যাচ্ছে সেই অনিবার্য সোজা রাস্তাটা থেকে, যেখান থেকে সে আজ অব্দি এক চিলতেও সরেনি।

'কিন্তু তুমি যে বলেছিলে তুমি তাত্রায় যাচ্ছো?' মেয়েটি অবাক হলো।

'আমার যেখানে ইচ্ছে করছে, আমি সেখানেই যাচ্ছি। আমি স্বাধীন মানুষ। আমার যা করতে ইচ্ছে হয়, যা করে আনন্দ পাই—আমি তাই করি।'

গাড়ি নিয়ে ওরা যখন নোভে জামকিতে ঢুকলো, ততোক্ষণে অন্ধকার ঘনাতে শুরু করেছে।

যুবক আগে কখনও এখানে আসেনি, তাই নিজেকে গুছিয়ে নিতে তার একটু সময় লাগলো। বেশ কয়েকবার গাড়ি থামিয়ে সে পথচারীদের কাছে হোটেলে যাবার রাস্তাটা জানতে চেয়েছে। হোটেলটা যদিও খুবই কাছাকাছি ছিলো (যাদের কাছে জিগেস করা হয়েছিলো তারা প্রত্যেকেই তাই বলেছে), কিন্তু বেশ কিছু রাস্তা খুঁড়ে রাখা হয়েছে বলে অনেকবার পথ বদলে অনেকটা ঘুরপথে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে করাতে প্রায় সিকি ঘণ্টা সময় লেগে গেলো। হোটেলটাকে দেখেশুনে খুব একটা সুবিধেজনক বলে মনে হলো না, কিন্তু শহরে এটাই একমাত্র হোটেল—তাছাড়া যুবকটিরও আর গাড়ি চালাতে ইচ্ছে করছিলো না। তাই মেয়েটিকে সে বললো, 'তুমি এখানেই অপেক্ষা করো,' তারপর নেমে পড়লো গাড়ি থেকে।

গাড়ি থেকে নামতেই যুবক আবার নিজেকে ফিরে পেলো। সন্ধ্যের সময় নিজের উদ্দিষ্ট জায়গা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা জায়গায় পৌঁছে তার এমনিতেই বেশ খারাপ লাগছিলো। আরও খারাপ লাগছিলো, তার কারণ কেউ তাকে জোর খাটিয়ে এখানে আসতে বাধ্য করেনি এবং সত্যি বলতে কি, আসলে সে নিজেও ঠিক এমনটি চায়নি। এই বোকামোটার জন্যে সে নিজেকেই দোষ দিলো, কিন্তু

তারপরেই মেনে নিলো ব্যাপারটা। তাত্রার সেই ঘরটা আগামীকাল অব্দি অপেক্ষা করতে পারবে। ইতিমধ্যে তাদের ছুটির প্রথম দিনটা অপ্রত্যাশিত কিছু দিয়ে পালন করলে তো কোনো ক্ষতি নেই!

ধোঁয়া, হট্টগোল আর ভিড়ে বোঝাই রেস্তোরাঁর মধ্যে ঢুকে গিয়ে যুবক অভ্যর্থনা-টেবিলের খোঁজ করলো। সবাই তাকে সিঁড়ির কাছাকাছি বারান্দার পেছন দিকটাতে পাঠিয়ে দিলো। সেখানে কাচের আড়ালের ওধারে সোনালি চুলের এক বৃদ্ধা চাবি বোঝাই একটা বোর্ডের নিচে বসেছিলেন। বহু কষ্টে একমাত্র খালি ঘরটার চাবি হাতে পেলো যুবক।

নিজেকে একা দেখে মেয়েটিও ওর ভূমিকাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। আলটপকা অন্য একটা শহরে এসে হাজির হয়েছে বলে ওর মেজাজ খারাপ হয়নি। যুবকটির প্রতি ও এতোই অনুরক্ত যে তার কোনো কাজেই ওর কোনোদিন কোনো সন্দেহ জাগে না। নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও পরম আস্থায় তাকেই সমর্পণ করেছে। আবার অন্য দিকে ওর মনে ফের সেই চিন্তাটা এসে ঢুকলো : ওর মনে হলো, ওই সমস্ত মেয়েরা—ব্যবসার কাজে বাইরে গিয়ে যাদের সঙ্গে যুবকের আলাপ হয়েছে, হয়তো তারাও ওর প্রেমিকটির জন্যে তার গাড়িতে বসে অপেক্ষা করেছে —এখন ও যেমনটি করছে। অথচ আশ্চর্য, কথাটা ভেবে এখন ওর একটুও খারাপ লাগলো না। বরং এই ভেবে মজা পেয়ে হাসলো যে আজ ও নিজেই সেই 'অন্য নারী'—দায়িত্বহীন, অসভ্য, ছেনাল মেয়েছেলে—যাদের ও অমন হিংসে করে। ওর মনে হলো ও ওই সমস্ত মেয়েদের সবাইকে ছাপিয়ে যাচ্ছে, ও তাদের অস্ত্রগুলোর ব্যবহার শিখে নিয়েছে, জেনে নিয়েছে কি করে যুবককে দিতে হবে সেই সমস্ত জিনিস—হালকা খুশির আনন্দ, নির্লজ্জ বেহায়াপনা আর নৈতিক শিথিলতা—যা কি করে দেওয়া যায় তা আজ অব্দি ও জানতো না। তৃপ্তির এক আশ্চর্য অনুভূতি মেয়েটিকে ভরিয়ে তুললো, কারণ ওর মনে হলো একমাত্র ওরই সব ধরনের মেয়ে হবার মতো ক্ষমতা আছে এবং এইভাবেই ও (একমাত্র ও) ওর প্রেমিককে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে ফেলতে পারবে, তার আগ্রহকে ধরে রাখতে পারবে।

যুবক গাড়ির দরজা খুললো, তারপর মেয়েটিকে রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেলো। গোলমাল, নোংরা আর ধোঁয়ার মধ্যে এক কোণে একটা খালি টেবিল খুঁজে পেলো সে।

'তাহলে এখন তুমি কিভাবে আমার দেখাশুনোটা করতে যাচ্ছো?' উত্তেজক ভঙ্গিতে জিগেস করলো মেয়েটি।

'খাওয়াদাওয়ার আগে তুমি কি পানীয় নেবে ?'

মেয়েটি অ্যালকোহল খুব একটা পছন্দ করে না, তবে এক-আধটু সুরা পান করে আর ভারমুথটা মোটামুটি ভালোই বাসে। এখন অবিশ্যি ও ইচ্ছে করেই বললো, 'ভদকা।'

'বেশ,' যুবক বললো, 'আশা করি মাতাল হবে না।'

'যদি হই ?'

কোনো জবাব না দিয়ে, যুবক একজন পরিচারককে ডেকে দুটো ভদকা আর দুটো স্টেক আনার ফরমাশ দিলো। মুহূর্তের মধ্যেই পরিচারকটি একটা ট্রেতে করে দুটো ছোটো ছোটো গ্লাস এনে ওদের সামনে নামিয়ে রাখলো।

যুবক নিজের গ্লাসটা তুলে ধরলো, 'তোমার স্বাস্থ্য কামনায় !'

'এর চাইতে রসালো কোনো কামনার কথা ভাবতে পারলে না ?'

মেয়েটির খেলার মধ্যে এমন কিছু ছিলো যা যুবককে বিরক্ত করে তুলছিলো। এখন ওর মুখোমুখি বসে যুবক বুঝতে পারলো, শুধু ওর 'কথাবার্তাই' ওকে অপরিচিত করে তুলছে না, আসলে ওর 'পুরো ব্যক্তিত্বটাই' বদলে গেছে। ওর অঙ্গভঙ্গি এবং মুখের অভিব্যক্তিতে সেই ধরনের মেয়েদের বিশ্রী এবং বিশ্বস্ত সাদৃশ্য জেগে উঠেছে যাদের সে ভীষণ ভালোভাবে জানে, যাদের সম্পর্কে সে এক ধরনের বিতৃষ্ণা অনুভব করে।

এবং তাই (উঁচু করে তুলে রাখা হাতে গ্লাসটা ধরে থাকা অবস্থায়) যুবক নিজেকে শুধরে নিয়ে বললো, 'বেশ, তাহলে তোমার উদ্দেশ্যে নয়—আমি তোমার জাতের উদ্দেশ্যে পান করবো, যাদের মধ্যে পশুর সদ্‌গুণ আর মানুষের খারাপ জিনিসগুলো এমন সুন্দরভাবে মিশে আছে।'

'আমার 'জাত' বলতে তুমি কি সমস্ত মেয়েদের কথা বলতে চাইছো ?' মেয়েটি শুধালো।

'না, আমি শুধু তোমার মতো মেয়েদের কথা বলছি।'

'যাই হোক, একটা মেয়ের সঙ্গে জানোয়ারের তুলনাটা আমার কাছে খুব একটা রসালো মনে হচ্ছে না।'

'বেশ,' যুবক তখনও গ্লাসটাকে উঁচু করে তুলে রেখেছে, 'তাহলে তোমার জাতের উদ্দেশ্যে নয়, আমি তোমার আত্মার উদ্দেশ্যে পান করবো। রাজি আছো ? তোমার আত্মা—যা তোমার মাথা থেকে পেটে নেমে আসার সময় আলোকিত হয়ে ওঠে আর ফের মাথায় উঠে যাবার সময় নিভে যায়।'

'ঠিক আছে,' মেয়েটি ওর গ্লাস তুলে ধরলো, 'আমার আত্মার উদ্দেশ্যে, যা

আমার পেটের মধ্যে নেমে যায়।'

'আর একবার আমি নিজেকে শুধরে নেবো,' যুবক বললো। 'তোমার পেটের উদ্দেশ্যে, যার মধ্যে তোমার আত্মাটা নেমে যায়।'

'আমার পেটের উদ্দেশ্যে,' বললো মেয়েটি এবং ওর পেট (এখন ওরা নামটা বিশেষভাবে বলেছে বলেই) যেন ওর আহ্বানে সাড়া দিলো—পেটের প্রতিটি ইঞ্চির অস্তিত্ব যেন অনুভব করলো ও।

তারপর পরিচারিকটি ওদের জন্যে স্টেক নিয়ে এলো, যুবক তাকে আরও একটা ভদকা আর সোডা আনার ফরমাশ দিলো (এবারে ওরা মেয়েটির স্তনযুগলের উদ্দেশ্যে পান করলো), এবং ওদের কথাবার্তা এই অদ্ভুত চপল চালেই চলতে লাগলো। খারাপ মেয়েমানুষ হয়ে ওঠার ব্যাপারে মেয়েটি যে কতোটা 'সুদক্ষ' তা দেখে যুবক ক্রমশ আরও বেশি করে বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলো। সে ভাবলো, অভিনয়টা যখন এতো ভালো করতে পারে, তার মানে ও সত্যি সত্যিই ওই রকম। শত হলেও মহাশূন্যের কোনো জায়গা থেকে বহিরাগত কোনো আত্মা তো আর ওর মধ্যে ঢুকে পড়েনি! এখন ও যার অভিনয় করছে, সেটা ও নিজেই; হয়তো ওর অস্তিত্বের এই অংশটা আগে তালাচাবি দেওয়া ছিলো, এখন এই খেলার ছুতোয় সেটা খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়েছে। হয়তো মেয়েটি ভেবেছিলো, এই খেলার মাধ্যমে ও নিজেকে 'অস্বীকার' করছে—কিন্তু ঘটনাটা কি ঠিক তার বিপরীত নয়? খেলার মাধ্যমে ও কি নিজের নিজত্বকেই প্রকাশ করছে না? নিজেকে মুক্ত করে দিচ্ছে না? না, তার বিপরীত দিকে বসে থাকা তার প্রেমিকার শরীরের মধ্যে কোনো অচেনা নারী বসে নেই—ও তারই প্রেমিকা, সে নিজে, অন্য কেউ নয়। মেয়েটির দিকে তাকালো যুবক এবং অনুভব করলো, ওর প্রতি তার বিতৃষ্ণা ক্রমশ বেড়ে উঠছে।

অবিশ্যি এটা শুধুমাত্র বিতৃষ্ণা নয়। মেয়েটি যতোই তার কাছ থেকে 'মানসিক দিক দিয়ে' দূরে সরে যাচ্ছে, সে ততোই মেয়েটিকে 'শারীরিক দিক দিয়ে' কামনা করছে। ওর আত্মার অচেনা বৈশিষ্ট্যগুলোই ওর দেহটার দিকে যুবকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছে। হ্যাঁ, সত্যি বলতে কি ওই বৈশিষ্ট্যগুলিই মেয়েটির শরীরটাকে 'তার জন্যে' প্রয়োজনীয় একটা দেহতে পরিণত করেছে। যেন এই যুবকের জন্যেই আজ অব্দি ওই দেহটা লুকিয়েছিলো মেঘের আড়ালে—করুণা, কোমলতা, উৎকণ্ঠা, প্রেম আর আবেগের মেঘ—হারিয়ে গিয়েছিলো সেই মেঘের মধ্যে (হ্যাঁ, যেন হারিয়ে গিয়েছিলো এই শরীরটা!)। যুবকের মনে হলো, আজ এই প্রথম সে তার প্রেমিকার শরীরটাকে দেখছে।

তৃতীয় দফার ভদকা ও সোডা শেষ করে মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। তারপর ন্যাকামোর ঢঙে বললো, 'কিছু মনে কোরো না, আমি একটু আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছো, জিগেস করতে পারি কি ?'

'হিস্যু করতে, যদি তুমি অনুমতি দাও,' বললো মেয়েটি। তারপর টেবিলগুলোর মাঝখান দিয়ে চলে গেলো পেছনের মখমলের পর্দাটার দিকে।

ওই শব্দটা দিয়ে যেভাবে ও যুবককে হতবাক করে দিয়েছে, তাতে খুশি হলো মেয়েটি। যদিও সম্পূর্ণ নিরীহ, তবু যুবক কোনোদিনও মেয়েটির মুখ থেকে ওই শব্দটা শোনেনি। মেয়েটির ধারণা, যে মহিলার ভূমিকাতে ও অভিনয় করছে তার চরিত্রের পক্ষে এই বিশেষ শব্দটাকে এমন ন্যাকামোপনায় জোরালো করে তোলার চাইতে বেশি বাস্তব আর কিছু হতে পরে না। হ্যাঁ, ও খুশি হয়েছিলো—মেজাজটা হয়ে উঠেছিলো সব চাইতে শরিফ। খেলাটা ওকে মোহিত করে দিয়েছে। আজ অব্দি ও কোনোদিনও যা পায়নি, খেলাটা ওকে সেই অনুভূতি এনে দিয়েছে : 'দায়িত্বহীন বেপরোয়া খুশির অনুভূতি'।

প্রতিবার পা ফেলার সময় ও চিরদিনই আগে থেকে অস্বস্তিতে ভুগতো, কিন্তু এখন ও আচমকা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে উঠেছে। যে অপরিচিত জীবনটার সঙ্গে ও জড়িত হয়ে পড়েছে সেটা লজ্জাহীন, জৈবনিক বিশিষ্ট্যতাহীন, অতীত বা ভবিষ্যৎ-হীন, নৈতিকতাহীন জীবন। এমন একটা জীবন যা অস্বাভাবিক স্বাধীন। মেয়েটি, পথ-চলতি গাড়িতে এক বিনা-ভাড়ার যাত্রী হিসেবে সবকিছু করতে পারে, 'সমস্ত কিছুই ওর জন্যে মঞ্জুর'। ও যা খুশি তাই বলতে পারে, অনুভব করতে পারে।

ঘরের মধ্যে দিয়ে এগুতে এগুতে মেয়েটি বুঝতে পারলো, সবকটা টেবিলের লোক ওকে লক্ষ্য করছে। এ এক নতুন রোমাঞ্চ, এটাকে ও ঠিক জানতো না : 'ওর শরীরের জন্যে সৃষ্টি হওয়া এক অশোভন আনন্দ'। আজ অব্দি ও নিজের ভেতরকার সেই চোদ্দ বছরের কিশোরীটিকে দূর করতে পারেনি যে নিজের স্তন দুটির জন্যে লজ্জা পায়, যার এই ভেবে খুব খারাপ লাগে যে ও অশালীন, কারণ ওর স্তন দুটো শরীর থেকে ঠেলে বেরিয়েছে, তাদের দেখা যায়। সুন্দরী বলে, শরীরের গড়নটা ভালো বলে ওর একটা অহঙ্কার আছে। কিন্তু লজ্জা ওর অহঙ্কারের সেই অনুভূতিটাকে ছোটো করে দেয়। ও সঠিকভাবেই মনে করে, মেয়েদের রূপ প্রধানত যৌন-উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে এবং এটাকেই ওর অরুচি-কর বলে মনে হয়। ওর ঐকান্তিক বাসনা ছিলো, ওর শরীর শুধুমাত্র ওর ভালো-বাসার মানুষটির সঙ্গেই শারীরিক সম্পর্ক রাখবে। রাস্তার লোক যখন অপলক

দৃষ্টিতে ওর বুকের দিকে তাকিয়ে থাকে, ওর মনে হয় লোকগুলো ওর একান্ত গোপন ব্যক্তিগত কোনো জিনিসের ওপরে অন্যায় আক্রমণ করছে—যে জিনিসের ওপরে একমাত্র অধিকার ওর আর ওর প্রেমিকের। কিন্তু এখন ও একজন হিচহাইকার, বিনা-ভাড়ায় অন্যের গাড়িতে উঠে বসা একটা অজানা মেয়ে যার কোনো নির্দিষ্ট নিয়তি নেই। এই ভূমিকার মধ্যে ও নিজের ভালোবাসার কোমল বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং নিজের শরীর সম্পর্কে প্রচণ্ডভাবে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এবং ওর শরীর যতোই জেগে উঠতে লাগলো, ওকে লক্ষ্য করতে থাকা চোখগুলো ও ততোই আরও বেশি করে বেথাপ্পা হয়ে উঠলো।

মেয়েটি শেষ টেবিলটার পাশ দিয়ে যাবার সময় এক মাতাল পার্থিব ভোগ-বিলাস সম্পর্কে নিজের অনুরক্তি জাহির করার জন্যে ফরাসী ভাষায় ওকে জিগেস করলো, 'কোঁবিয়ে, মাদমোয়াজেল ?'

মেয়েটি কথাটার অর্থ বুঝতে পারলো। বুক বাড়িয়ে, নিতম্বের প্রতিটি সঞ্চালন পুরোপুরি অনুভব করলো ও, তারপর উধাও হয়ে গেলো পর্দার আড়ালে।

এ এক অদ্ভুত খেলা। এবং খেলাটা যে অদ্ভুত, তাও স্পষ্ট। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় : যুবকটি যদিও অচেনা চালকের ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু এমন একটি মুহূর্তও যায়নি যখন তার গাড়িতে উঠে বসা 'অচেনা মেয়েটির মধ্যে' সে নিজের প্রেমিকাকে দেখেনি। আর ঠিক এই ব্যাপারটাই তাকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা দিচ্ছিলো। সে দেখছিলো তার প্রেমিকা একটা অপরিচিত লোককে প্রলুব্ধ করছে এবং ও যখন লোকটাকে ঠকাচ্ছে (যখন ঠকিয়েছে, ঠকাবে) তখন ও কিভাবে তাকিয়েছে, কি বলেছে—তা একেবারে কাছাকাছি উপস্থিত থেকে দেখার ও শোনার তিক্ত সুবিধেটাও সে পেয়েছে। আর পেয়েছে আপাতদৃষ্টিতে আত্মবিরোধী এক মর্যাদা—যেহেতু সে নিজেই মেয়েটির অবিশ্বস্ততার কারণ।

পুরো ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়ে উঠলো এই জন্যে যে মেয়েটিকে সে, ঠিক ভালোবাসা নয় বরং বলা চলে, পুজো করতো। চিরদিনই তার মনে হয়েছে, শুধুমাত্র সততা আর বিশুদ্ধতার সীমানার মধ্যেই মেয়েটির ভেতরের প্রকৃতিটা 'সত্য' এবং ওই সীমানার বাইরে তার আর কোনো অস্তিত্ব নেই। ওই সীমানার বাইরে চলে গেলে এই মেয়ে আর সেই মেয়ে থাকবে না, স্ফুটনাঙ্ক পেরিয়ে গেলে জল যেমন আর জল থাকে না। তাই এখন মেয়েটিকে নিরুদ্বিগ্ন উদাসীনতায় সেই ভয়ঙ্কর সীমানাটা পেরিয়ে যেতে দেখে যুবকের মন রাগে ভরে উঠলো।

মেয়েটি বিশ্রাম-ঘর থেকে ফিরে এসে অভিযোগ করলো, 'ওই দিকে একটা

লোক আমাকে জিগেস করলো, 'কতো লাগবে, মাদমোয়াজেল ?'

'তাতে তোমার অবাক হওয়া উচিত নয়,' যুবক বললো। 'শত হলেও, তোমাকে একটা বেশ্যার মতোই দেখাচ্ছে।'

'তুমি কি জানো, ও-সমস্ত কথায় আমার কিছুই এসে-যায় না ?'

'তাহলে তো ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার যাওয়া উচিত!'

'কিন্তু আমার তো তুমিই রয়েছো।'

'আমার সঙ্গে কাজ সেরে তুমি ওর কাছে যেতে পারো। যাও, গিয়ে কথাবার্তা বলে একটা কিছু ঠিক করে এসো।'

'লোকটাকে দেখতে ভালো নয়।'

'কিন্তু নীতির দিক দিয়ে এক রাতে বেশ কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে শুতে তো তোমার কোনো আপত্তি নেই ?'

'তারা দেখতে ভালো হলে, শোবো না কেন ?'

'তুমি কি একে একে তাদের সঙ্গে শোয়াটা পছন্দ করো, না কি সকলের সঙ্গে একই সময়ে ?'

'দুটোই,' জবাব দিলো মেয়েটি।

আলোচনাটা ক্রমশ আরও চরম অভদ্রতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। মেয়েটি এতে সামান্য একটু ধাক্কা খেলেও প্রতিবাদ করতে পারে না। কারণ খেলার মধ্যেও স্বাধীনতার অভাব লুকিয়ে থাকে, এমন কি খেলাটাও খেলোয়াড়দের জন্যে পাতা একটা ফাঁদ। এটা যদি খেলা না হতো, ওরা দুজনে যদি সত্যি সত্যিই পরস্পরের অপরিচিত হতো, তাহলে মেয়েটি হয়তো অনেক আগেই রাগ করে চলে যেতো। কিন্তু খেলা থেকে কোনো রেহাই মেলে না। খেলা শেষ হবার আগে কোনো দল মাঠ থেকে পালাতে পারে না, দাবার গুঁটি ছক ছেড়ে চলে যেতে পারে না। মেয়েটি জানতো খেলাটা যে চেহারাই নিক না কেন তা ওকে মেনে নিতে হবে তার একমাত্র কারণ, সেটা একটা খেলা। ও জানতো খেলাটা যতোই চরমে পৌঁছুবে, সেটা ততোই আরও বেশি করে খেলা হয়ে উঠবে এবং ওকে ততোই আরও বাধ্যভাবে তা খেলে যেতে হবে। খেলাটার থেকে ওর তফাতে থাকা উচিত, খেলাটাকে ওর গুরুত্ব দিয়ে দেখা ঠিক নয়—এসব বলে ওর শুভবুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলা বৃথা, বৃথা ওর বিমূঢ় আত্মাটাকে সতর্ক করে দেওয়া। ব্যাপারটা নিছকই একটা খেলা বলে ওর আত্মাটা ভয় পায়নি, খেলতে আপত্তি করেনি এবং মাদকাসক্তের মতো খেলাটার আরও গভীরে ডুবে গেছে।

যুবক পরিচারকটিকে ডেকে টাকা মিটিয়ে দিলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে বললো, 'আমরা যাচ্ছি ?'

'কোথায় ?' বিস্ময়ের ভান করলো মেয়েটি।

'প্রশ্ন কোরো না, চলে এসো।'

'আমার সঙ্গে এ কেমনভাবে কথা বলছো তুমি ?'

'বেশ্যাদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলি,' যুবক বললো।

স্বল্প আলোয় আভাসিত সিঁড়ি দিয়ে ওরা ওপরে উঠে গেলো। তিন তলার নিচে সিঁড়িটার চত্বরে কয়েকটা মাতাল পেচ্ছাপখানার কাছে দাঁড়িয়েছিলো। যুবক পেছন থেকে এমনভাবে মেয়েটিকে জাপটে ধরলো যাতে ওর স্তন দুটো তার হাতের মুঠোয় ধরা থাকে। পেচ্ছাপখানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো দৃশ্যটা দেখে জোর আওয়াজ দিতে শুরু করলো। মেয়েটি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছিলো, কিন্তু যুবক ওকে চিৎকার করে বললো, 'চুপ করে দাঁড়াও!' লোকগুলো তাই শুনে অশ্লীল অভিনন্দন জানালো আর কয়েকটা ইতর মন্তব্য ছুঁড়ে দিলো মেয়েটির দিকে। যুবক ও মেয়েটি তিন তলায় গিয়ে পৌঁছুলো। ঘরের দরজা খুলে, বোতাম টিপে আলোটা জ্বেলে দিলো যুবক।

ঘরটা সরু। ঘরের ভেতরে দুটো খাট, একটা ছোট্ট টেবিল, একখানা কুর্সি আর হাত-মুখ ধোবার একটা বেসিন। যুবক দরজায় চাবি লাগিয়ে মেয়েটির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। দু চোখে উদ্ধত বাসনা নিয়ে দুর্বিনীত ভঙ্গিতে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটি। ওর দিকে তাকিয়ে ওর ওই আসঙ্গ-লিপ্সা-জাগানো অভিব্যক্তির পেছনে যুবক তার সেই পরিচিত মুখখানাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলো, যাকে সে অমন নিবিড় করে ভালোবাসতো। মনে হচ্ছিলো সে যেন একই লেন্সের ভেতর দিয়ে দুটো প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছে, একটার প্রতিবিম্ব আর একটার ওপরে চাপানো, একটার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে অন্যটাকে। পরস্পরের ভেতর দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করে তোলা ওই রূপমূর্তি দুটো তাকে যেন বলছে, মেয়েটির মধ্যে 'সমস্ত কিছুই' আছে—ওর আত্মাটা এখনও ভয়ঙ্কর অনিয়তাকার, এখনও তার নির্দিষ্ট কোনো আকার গড়ে ওঠেনি এবং তা একই সঙ্গে ধরে রেখেছে বিশ্বস্ততা আর অবিশ্বস্ততা, প্রতারণা আর সারল্য, ছেনালিপনা আর সতীত্ব। একই আস্তাকুঁড়ের গাদায় বিভিন্ন আবর্জনার বৈচিত্র্যের মতো তালগোল পাকানো এই এলোমেলো বিশৃঙ্খলা যুবককে যেন বিরক্ত করে তুললো। প্রতিবিম্ব দুটো তখনও একের ভেতর দিয়ে অপরকে দেখিয়ে চলেছে। যুবক এবারে

বুঝতে পারলো অন্য মহিলাদের সঙ্গে তার প্রেমিকার প্রভেদ শুধুমাত্র ওপর-ওপর, কিন্তু তলায়-তলায় ও তাদেরই মতো : সমস্ত রকমের সম্ভাব্য চিন্তা, অনুভূতি আর অনৈতিকতায় ভরা। তার মানে, তার সমস্ত গোপন আশঙ্কা এবং আচমকা হিংসার প্রকোপ—সবই সঙ্গত। বিশেষ কয়েকটা দেহরেখা মেয়েটিকে একটা আলাদা মানুষ হিসেবে ফুটিয়ে তুলেছে—এই ধারাণাটা স্রেফ একটা বিভ্রম এবং সেই মোহময় ভ্রান্তির সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছে অন্য মানুষটা, যে ওকে দেখছে—অর্থাৎ যুবক নিজে। যুবকের মনে হলো যাকে সে ভালোবাসতো সেই মেয়েটি তার নিজেরই বাসনা, ভাবনা, আর বিশ্বাসের সৃজন এবং 'সত্যিকার' মেয়েটি—যে এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে—নৈরাশ্য জাগিয়ে তোলার মতো অচেনা, নৈরাশ্য জাগিয়ে তোলার মতো 'দোলায়িত'। মেয়েটিকে ঘৃণা করলো সে।

'দেরি করছো কেন ? পোশাক খোলো,' যুবক বললো।

মেয়েটি মদালসা ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালো, 'তার কোনো দরকার আছে কি ?'

মেয়েটি যে স্বরে কথাটা বললো তা যুবকের কাছে ভীষণ পরিচিত বলে মনে হলো। মনে হলো যেন বহু আগে অন্য কোনোদিন অন্য কোনো মেয়ে ঠিক এই কথাটাই বলেছিলো তাকে—শুধু কে বলেছিলো তা এখন আর তার মনে নেই। মেয়েটিকে তার হেনস্থা করতে ইচ্ছে করছিলো। গাড়িতে উঠতে চাওয়া হিচহাইকার মেয়েটিকে নয়, তার নিজের প্রেমিকাকে। খেলাটা এখন জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। অচেনা হিচহাইকার মেয়েটিকে অবমানিত করার খেলা হয়ে উঠেছে তারই প্রেমিকাকে অবমানিত করার একটা ছল মাত্র। যুবক ভুলে গেছে, সে একটা খেলা খেলছিলো। সে শুধু ঘৃণা করছে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রমণীটিকে। ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের ওয়ালেট থেকে একটা পঞ্চাশ ক্রাউনের নোট বের করে নিলো যুবক। তারপর নোটটা এগিয়ে ধরলো মেয়েটির দিকে, 'এটা যথেষ্ট তো ?'

পঞ্চাশের নোটটা নিলো মেয়েটি, 'আমার দাম খুব একটা বেশি বলে তুমি মনে করো না, তাই না ?'

'তোমার দাম এর চাইতে বেশি নয়।'

যুবকের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো মেয়েটি, 'তুমি এভাবে আমাকে পটাতে পারবে না! তোমাকে অন্য কোনো পথে চেষ্টা করতে হবে, একটু খাটতে হবে !'

যুবকের গলা জড়িয়ে, তার মুখের কাছে নিজের মুখ নিয়ে এলো মেয়েটি। ওর ঠোঁটে নিজের আঙুলগুলো রেখে ওকে আস্তে করে ঠেলে সরিয়ে দিলো যুবক।

'আমি যে সমস্ত মেয়েদের ভালোবাসি, শুধু তাদেরই চুমু খাই।'

'তার মানে তুমি আমাকে ভালোবাসো না ?'
'না।'
'কাকে ভালোবাসো ?'
'তা দিয়ে তোমার কি হবে ? তুমি পোশাক খোলো!'

মেয়েটি আগে কখনও এভাবে পোশাক খোলেনি। লজ্জা, ভেতরকার আতঙ্কের অনুভূতি, মাথায় ঝিমধরানো বিহ্বলতা—যুবকের সামনে পোশাক ছাড়ার সময় ও সর্বদাই যেগুলো অনুভব করেছে (অন্ধকারে ও লুকোতে পারতো না), এখন তা সবই উধাও হয়ে গেছে। যুবকের সামনে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে—আত্মবিশ্বাসী, উদ্ধত আর আলোকস্নাতা হয়ে। অবাক হয়ে ভাবছে, আচমকা কোত্থেকে ও আবিষ্কার করে ফেললো বসন-উন্মোচনের এই ধীর, উত্তেজক ভঙ্গিমা যা এযাবৎ ওর অজানা ছিলো! যুবকের দৃষ্টিকে হতাশ করে সোহাগী ভঙ্গিমায় একটি একটি করে আবরণ খসাতে থাকে ও, উপভোগ করে নিজের পোশাক উন্মোচনের প্রতিটি স্তর।

কিন্তু তারপর আচমকাই ও সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়ায় যুবকের সামনে এবং সেই মুহূর্তে একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে যায় ওর মাথার ভেতরে। ওর মনে হয় এবারে পুরো খেলাটা শেষ হয়ে যাবে, পোশাক ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও নিজের মিথ্যে ছলা-কলাও ছেড়ে ফেলেছে এবং নগ্ন হবার অর্থ : এখন ও আর অন্য কোনো মেয়ে নয়—এখন ও সত্যিকারের ও—ও নিজে। এখন যুবকের উচিত ওর কাছে এগিয়ে এসে একটি অঙ্গভঙ্গিতে সমস্ত কিছু মুছে দেওয়া, যার পরে আসবে শুধুমাত্র ওদের ঘনিষ্ঠতম দেহলীলা। অতএব সেই মুহূর্তেই খেলা বন্ধ করে যুবকের সামনে নগ্ন শরীরে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েটি। ও কুণ্ঠা অনুভব করে। ওর মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে, যে হাসিটা সত্যিই ওর নিজের—লাজুক, বিমূঢ় হাসি।

কিন্তু যুবক ওর কাছে আসে না, খেলাটাও শেষ করে না। লক্ষ্যও করে না তার পরিচিত হাসিটাকে। শুধু দেখতে পায় চোখের সামনে তার প্রেমিকার সুন্দর, অচেনা শরীর—যাকে সে ঘৃণা করে। এই ঘৃণা তার ভোগবাসনা থেকে সমস্ত ভাব-প্রবণতার কোমল প্রলেপ সম্পূর্ণ মুছে দেয়। মেয়েটি যুবকের কাছে আসতে চায়, কিন্তু যুবক ওকে বলে, 'তুমি যেখানে আছো, সেখানেই থাকো। আমি তোমাকে একটু ভালো করে দেখতে চাই।' এখন তার একমাত্র ইচ্ছে মেয়েটির সঙ্গে এমন ব্যবহার করা যেন ও একটা বেশ্যা। কিন্তু যুবক কখনও কোনো বেশ্যা-সংসর্গ করেনি এবং বেশ্যাদের সম্পর্কে তার যতোটুকু ধারণা তা সবই এসেছে সাহিত্য আর জন-শ্রুতি থেকে। তাই সে ওই ধারণাগুলোর দিকেই মুখ ফেরায় এবং প্রথমেই তার

মনে পড়ে, কালো অন্তর্বাস (আর কালো মোজা) পরা এক নারীমূর্তি একটা পিয়ানোর চকচকে ঢাকনার ওপরে নাচছে। হোটেলের ছোট্ট ঘরটাতে কোনো পিয়ানো ছিলো না, শুধু লিনেন কাপড়ে ঢাকা ছোট্ট একটা টেবিল হেলে ছিলো দেয়ালের গায়ে। যুবক মেয়েটিকে টেবিলে চড়ার হুকুম দিলো। মেয়েটি অনুনয়ের ভঙ্গি করলো, কিন্তু যুবক বললো, 'তোমাকে তোমার দাম মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে !'

যুবকের চোখে একটা অনড় মোহাচ্ছন্নতা দেখে মেয়েটি আবার খেলাটা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করলো, যদিও ও আর তা পারছিলো না, বুঝতেও পারছিলো না কিভাবে এগুবে। দু চোখে জল নিয়ে টেবিলের ওপরে উঠলো ও। ওপরটাতে বড়ো-জোর তিন বর্গফুট জায়গা, একটা পায়া অন্যগুলোর চাইতে সামান্য একটু ছোটো—তাই ওখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে কেমন যেন টলমলে বলে মনে হলো মেয়েটির।

কিন্তু যুবক তার মাথা ছাপিয়ে ওপরের দিকে খাড়া উঠে যাওয়া নগ্ন দেহটাকে দেখে খুশি হলো, মেয়েটির লজ্জা জড়ানো অনিশ্চয়তা তার স্বেচ্ছাচারিতাকে স্রেফ উশকে দিলো। ওর দেহটাকে সে সব দিক দিয়ে সমস্ত রকমের ভঙ্গিতে দেখতে চাইছিলো—কারণ সে কল্পনা করে নিয়েছে, অন্য পুরুষরা ওকে তেমনি করেই দেখেছে এবং দেখবে। সে অমার্জিত ও কামার্ত হয়ে উঠলো। এমন সমস্ত শব্দ ব্যবহার করলো যা মেয়েটি জন্মেও যুবকটির মুখে শোনেনি। মেয়েটি এসবে আপত্তি করতে চাইছিলো, খেলাটা থেকে মুক্তি পেতে চাইছিলো। যুবকটিকে ও নাম ধরে ডাকলো, কিন্তু যুবক সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললো তাকে অমন ঘনিষ্ঠভাবে ডাকার কোনো অধিকার মেয়েটির নেই। তাই শেষ পর্যন্ত চরম বিহ্বলতায়, প্রায় কাঁদতে কাঁদতে, মেয়েটি সবকিছু মেনে নিলো—যুবকের ইচ্ছে অনুযায়ী ও সামনের দিকে ঝুঁকে উবু হয়ে বসলো, স্যালুট করলো, তারপর নিতম্ব দুলিয়ে ট্যুইস্টও নাচলো। একবার একটু বেশি নড়াচড়া করার ফলে পায়ের নিচে টেবিল-ঢাকাটা পিছলে যাওয়ায় মেয়েটি পড়ে যাচ্ছিলো প্রায়, কিন্তু তার আগেই যুবক ওকে লুফে নিয়ে বিছানায় টেনে নিয়ে গেলো।

মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গম করলো যুবক। মেয়েটি এই ভেবে খুশি হলো যে শেষ অব্দি এবারে অন্তত এই দুর্ভাগ্যজনক খেলাটা শেষ হবে, ওরা আবার আগেকার সেই দুটি মানুষ হয়ে যাবে, দুজন দুজনকে ভালোবাসবে। যুবকের ঠোঁটে ও নিজের ঠোঁট চেপে রাখতে চাইছিলো। কিন্তু যুবক মেয়েটির মাথা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ফের বললো, সে যে সমস্ত মেয়েদের ভালোবাসে শুধু তাদেরই চুমু দেয়। মেয়েটি জোরে জোরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু ওকে কাঁদতেও দেওয়া হলো না, কারণ যুবকের সুতীব্র যৌন কামনা ক্রমশ ওর শরীরটাকে জয় করে নিলো এবং

তারপর নিশ্চুপ করিয়ে দিলো ওর আত্মার সমস্ত অভিযোগ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিছানায় দেখা গেলো ওদের দুজনকে—সম্পূর্ণ এক সুরে-তালে বাঁধা দুটো শরীর, কামার্ত দুটো শরীর—যারা পরস্পরকে আদৌ চেনে না, জানে না। আবেগ-বিহীন অথবা প্রেমহীন যৌন-সংসর্গ—সারা জীবন মেয়েটি ঠিক এই জিনিসটাকেই সবচাইতে বেশি ভয় পেতো এবং আজ পর্যন্ত সতর্কভাবে এটাকে ও এড়িয়েও গিয়েছিলো। মেয়েটি জানতো ও নিষিদ্ধ সীমানাটা পেরিয়ে গেছে, কিন্তু সীমানাটা পেরুবার সময় ও এগিয়ে গেছে বিনা প্রতিবাদে, একজন পুরোদস্তুর অংশগ্রাহী হিসেবে। শুধু নিজের সচেতনতার কোনো একটা জায়গায়, সুদূর কোনো গোপন কোণে ও এই ভেবে আতঙ্ক অনুভব করছিলো যে এমন আনন্দ, এতো প্রচণ্ড সুখ ও আর কোনোদিনও পায়নি যা পাচ্ছে এই মুহূর্তে—সীমানাটা পেরিয়ে এসে।

তারপর সব শেষ। মেয়েটির শরীর থেকে উঠে, খাটের ওপরে ঝুলতে থাকা লম্বা তারটার দিকে হাত বাড়িয়ে আলোটা নিভিয়ে দিলো যুবক। মেয়েটির মুখ সে দেখতে চাইছিলো না। সে জানতো খেলা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তবু ওদের পুরনো প্রথাগত সম্পর্কটাতে তার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিলো না। এই ফেরার ব্যাপারটাকে সে ভয় পাচ্ছিলো। অন্ধকারে মেয়েটির পাশে সে এমনভাবে শুয়ে রইলো যাতে ওদের শরীর পরস্পরকে স্পর্শ না করে।

একটু পরে মেয়েটির ফুঁপিয়ে ওঠা কান্না শুনতে পেলো যুবক। মেয়েটির একখানা হাত আস্থাহীনের মতো, ছেলেমানুষের মতো তার হাত স্পর্শ করলো। স্পর্শ করলো, সরে গেলো, আবার স্পর্শ করলো। তারপর মিনতিভরা, ফুঁপিয়ে ওঠা একটা কণ্ঠস্বর স্তব্ধতা ভেঙে যুবকের নাম ধরে ডাকলো আর বললো, 'এটা আমি, আমি আমিই, আমি সেই আমি…'

যুবক নিশ্চুপ হয়ে থাকে, নড়ে না। মেয়েটির দৃঢ় ঘোষণাটা যে আসলে দুঃখজনকভাবে ফাঁকা—তা সে জানে। কারণ মেয়েটি একটা অজানা জিনিসকে সেই একই অজানা জিনিস দিয়ে বোঝাতে চাইছে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার পর্যায় পেরিয়ে শব্দ করে কাঁদতে শুরু করে। আর বারবার একটানা অবিরাম অনবরত একই অর্থের এই করুণ শব্দগুচ্ছকে বলতে থাকে : 'আমি আমিই, আমি আমিই, আমি আমিই…'

যুবক এবারে নিজের সাহায্যের জন্যে করুণাকে আহ্বান জানাতে শুরু করে (অনেক দূর থেকেই তাকে ডেকে আনতে হয়, কারণ কাছাকাছি কোথাও সে ছিলো না), যাতে সে মেয়েটিকে শান্ত করে তুলতে পারে। ছুটির তেরোটা দিন এখনও পড়ে আছে তাদের সামনে।

যুবতীর মন

ইনগ্রিড জোংকের

কেপ প্রদেশের এক প্রতিষ্ঠিত আফ্রিকান পরিবারে ১৯৩৩ সালে জন্ম হয় ইনগ্রিড জোংকেরের। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, একগুচ্ছ আফ্রিকান কবিতার সংকলন (এসকেপ, ১৯৫৩), তাঁকে কবিখ্যাতি এনে দেয়। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ (স্মোক অ্যাণ্ড ওক্যার, ১৯৬৩) গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে এক ভিন্ন কণ্ঠস্বরের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে। কিন্তু ১৯৬৫ সালে জলে ডুবে মৃত্যু হয় এই প্রতিভাময়ী কবির। আফ্রিকান ভাষায় লেখা তাঁর 'ডাই বক' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কনট্রাস্ট পত্রিকায়, ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় এবং তারই ইংরেজি অনুবাদ (জ্যাক কোপ সংশোধিত) 'দ্য গোট' ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় দ্য লণ্ডন ম্যাগাজিনে।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ভোরের কুয়াশার ভেতর দিয়ে শিলাময় পাহাড়টার অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখতে পাচ্ছিলো সুশান। ওখানেই কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে মদ্দা ছাগলটা। এতোক্ষণে ওর কুয়াশায় সাদা হয়ে সরু পাকদণ্ডি দিয়ে নিচে নেমে আসার কথা। সুশান জানে ও মুখ তুলে তাকালেই দেখতে পাবে, ওর বাগানের তারের বেষ্টনীটার ঠিক ওধারে অ্যাকাশিয়া গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ছাগলটা। কিন্তু ও সবচাইতে কাছের গোলাপ গাছগুলোর সারির দিকেই দৃষ্টি স্থির করে রাখলো। এর মধ্যেই কয়েকটা কুঁড়ি ফুটতে শুরু করেছে। বাতাসটা ফের ওকে স্পর্শ করে চলে যেতেই সুশান জানলা থেকে মুখ ঘুরিয়ে, ওর স্ফীত হয়ে ওঠা পেটের ওপর দিয়ে নীল রঙের রেশমী কিমোনাটা টেনে নিলো।

'হেইন!'

মানুষটা তবু ঘুমোয়, একটুও নড়ে না। যেন ওই নাছোড় কণ্ঠস্বরে অনবরত তার নাম ধরে ডাকা শুনে শুনে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে ওঠা গালের নিচে একখানা হাত রেখে, গালের শুকনো চামড়ায় ভাঁজ ফেলে, কাত হয়ে ঘুমোচ্ছে লোকটা। সাদা ছুঁচলো দাড়িগুলো চ্যাপটা হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে কম্বলের ওপরে। সুশানের মনে পড়লো কিভাবে ওই হাত দুটো এক সময় ছাগলের দুধ দুয়েছে, মাটি কুপিয়েছে আর গাছ পুঁতেছে—সুনিশ্চিতভাবে

প্রকাশ করেছে রোগা কব্জি দুটোর জোর আর আঙুলগুলোর উল্লাস। কিন্তু ইদানিং মানুষটা বাড়ির বাইরে বেশি সময় কাটাতে শুরু করেছে, অবহেলার চিহ্ন ফুটতে শুরু করেছে সমস্ত কাজকর্মে। সুশান কফি এনে দিতেই লোকটা একটা ঝাঁকুনি তুলে নিজের শরীরটাকে টেনে তুললো, তারপর চকাস-চকাস শব্দ তুলে লোভী চুমুক দিতে লাগলো কফির পেয়ালায়। জানলা দিয়ে এবারে সোজা সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে দিলো সুশান, গোলাপ বাগান পেরিয়ে তল্লাশি চালাতে লাগলো অ্যাকাশিয়া গাছটার তলায়। কিন্তু একটা গাঢ় সাদাটে ছায়া ছাড়া কুয়াশার মধ্যে জন্তুটার চেহারার কোনো আদলই বুঝতে পারলো না ও। তাকিয়ে থাকতে থাকতে শেষ অব্দি একটা আবছা দেহরেখা জেগে উঠলো চোখের সামনে। আস্তে আস্তে কুয়াশা কেটে গেলো—সুশান দেখলো, মদ্দা-ছাগলটা সতর্ক ও নির্ভুল পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে ওকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জানাতে।

দুর্বিনীত ভঙ্গিতে বাতাসে কয়েকবার ঢুঁ মারে ছাগলটা, হাওয়ায় উড়তে থাকে তার পায়ের হলদেটে রোমগুলো আর অভিব্যক্তিহীন চোখ দুটো একটানা দৃষ্টি মেলে রাখে সুশানের দিকে। তার পেছনে হালকা-নীল আকাশের পটভূমিকায় ছিপছিপে সবুজ পাতা আর হলুদ ফুলে ভরা অ্যাকাশিয়া গাছটা।

মানুষটা বিছানা ছেড়ে উঠলো। ফর্সা, কৃশ, নগ্ন শরীর। পেটের কাছটা কোঁচকানো, গ্রন্থিল হাঁটু। 'অমন হাঁ করে কি দেখছো গা?'

সুশান দেখলো, ছাগলটা ওর দিকে পেছন ফিরে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ঘাস খেতে শুরু করেছে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আয়েশ করে বুকে আলতো হাত বুলোতে থাকা মানুষটার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো ও, 'একদিন ওই ছাগলটাকে আমি খুন করে ফেলবো!'

'কাকে? ছাগলটাকে?'

'হ্যাঁ। আমি ওর গলাটা কেটে ফেলবো, এই বলে দিলুম!'

'কিন্তু ওর নামে তোমার নালিশটা কি?'

'আমার নালিশ? ওর নামে?' অধীর ভঙ্গিতে জানলার দিকে হাত দেখালো সুশান, 'ওটাকে তোমার বিক্কিরি করে দিতে হবে—ব্যাস!'

'ওফ্, বাজে বোকো না তো!'

'এখানে ও কোন্ মতলবে আসে, শুনি?'

'তা আমি জানিনে। জায়গাটা আমাদের বটে, তবে ছাগলগুলো তো চতুর্দিকেই ঘুরে বেড়ায়। এখানেই বা আসবে না কেন?'

'কেন আসবে? ও অন্যগুলোর সঙ্গে পাহাড়টার গায়ে থাকতে পারে না? এখানে কি চায় ও?'

'ওফ্, ভগবান! ছাগলটা তোমার কোন্ ক্ষতিটা করেছে?'

'ও আমার উঠোনে ঢোকার চেষ্টা করছে।'

'তুমি ভালোমতোই জানো, ও পেছনের উঠোনে ঢুকতে পারবে না। কারণ দরজাটা বন্ধ থাকে।'

'ঢুকে দেখুক না একবার!'

'ওফ্, এবারে তুমি...'

'আমি ওর জন্যে তৈরি হয়েই আছি, এই বলে দিলুম। এমন বিচ্ছিরি ওর... ওর চোখ দুটো...'

'ধ্যাত্তেরি, নিকুচি করেছে!'

'তুমি এবারে পোশাকটোশাক পরে নাও তো...সেই থেকে উদোম হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো! তুমি কি মনে করো, দিনভর তোমাকে ওভাবে ছাখাটা আমার খুব দরকার? যাও, গিয়ে ছাগলটাকে পাহাড়ের দিকে তাড়িয়ে দিয়ে এসোগে—সেটাই ওর জায়গা।'

দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে কুর্সির ওপরে রাখা স্তূপটা থেকে নিজের খাকি পাতলুন আর পশমী জামাটা তুলে নেয় মানুষটা। সুশানের দিকে পেছন ফিরেই সাজগোছ সেরে নেয় সে।

'সেই কখন সূর্য উঠেছে,' সুশান বিড়বিড় করতে থাকে। 'কাজে যাবার নাম নেই, এদিকে বাপ হবার ইচ্ছে ষোলো আনা।'

তাড়াতাড়ি জুতোজোড়া পায়ে গলিয়ে মানুষটা ঘর থেকে বেরুতে যেতেই সুশান ওকে থামিয়ে দেয়, 'পুরুষমানুষ হয়েছো বলে তোমার হাত-মুখ না ধুলেও চলে বোধহয়?' সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে সে।

মাঝে মাঝে মানুষটার দুর্বল আলিঙ্গনের স্মৃতি বেশ কিছুক্ষণ ধরে সুশানের মনে জেগে থাকে। মনে হয়, তার ঈষৎ আনত কাঁধ দুটোতে যেন খানিকটা আড়ষ্টতা আর আপত্তি বাসা বেঁধে আছে। আবার অন্য সমস্ত সময়ে যখন সে চুপচাপ শুয়ে থাকে, নিজের উষ্ণতার নীড়ে শিথিল হয়ে থাকে তার সারাটা শরীর—তখন নিজের শক্তিহীন নীরবতা দিয়ে তাকে তীব্র ভৎর্সনা জানায় সুশান। মানুষটা তখন ওর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে ওঠে এবং আসন্ন সন্তানটিও তখন সেই অপরিচয়ের গণ্ডিটাকে মুছে দিতে পারে না।

স্তব্ধতা ভেঙে লরিটা যখন গর্জন করে উঠলো, ততোক্ষণে সুশানের পোশাক

পরা হয়ে গেছে। হঠাৎ ওর মনে হলো বাড়িটা ভীষণ নিস্তব্ধ নিঝুম, রান্নাঘরে লেনারও কোনো সাড়া শব্দ নেই। এতোক্ষণে কুয়াশা পুরোপুরি সরে গেছে। হেইন হয়তো ছাগলটাকে পাহাড়ের ওপরে তাড়িয়ে দিয়ে এসেছে, কারণ অ্যাকাশিয়া গাছের তলায় ওর জায়গাটা এখন শূন্য।

রান্নাঘরের সিঙ্কে গাদাগুচ্ছের বাসনপত্র। স্টোভে লেনার নীল কানার কফি মগটা ফেনিয়ে উঠেছে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো সুশান। তারপর রান্নাঘরের দরজা দিয়ে দেখতে পেলো, ফুল ফুটতে থাকা গোলাপ ঝাড়গুলোর পাশ দিয়ে দোআঁশলা মেয়েটা হেলতে দুলতে আসছে। হাঁটার ধরন দেখে মনে হয়, ওর বুকের মধ্যে কোনো দুঃখের গান গুনগুনিয়ে উঠছে। কিন্তু রোদের মধ্যে আসতেই দেখা গেলো, মেয়েটার মুখে হাসি। কাঁধের ওপর দিয়ে সূর্যের আলো এসে পশমী ব্লাউজে নিচে ওর বন্ধনমুক্ত স্তন দুটোর ওপরে লুটিয়ে পড়েছে। বাগানের দরজার কাছে এসে থেমে দাঁড়ালো ও। তারপর দরজায় হাত রেখে, যেন গাছগাছালি-গুলোর মধ্যে ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকা সেই গানটা শুনবে বলেই, পেছনে ফিরে তাকালো আবার।

'লেনা!'

মেয়েটি দরজা খুলে দ্রুত ভেতরে ঢুকে পড়লো।

'তুই ফের জাগেরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলি? আর এদিকে সমস্ত নোংরা বাসনপত্রগুলো এখনও সেই সিঙ্কের মধ্যে পড়ে রয়েছে!'

মহিলার ভাবভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু ছিলো, যার জন্যে ওর পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে মেয়েটি এক ঝলক ওর ফোলা-ফোলা মুখটার দিকে তাকিয়ে নিলো।

'কিরে, কথা বলতে ভুলে গেছিস না কি?'

'কি বলছেন?'

'আমি জিগেস করছি, ফের তুই জাগেরের কাছে গিয়েছিলি কিনা।'

'হ্যাঁ।'

'কেন গিয়েছিলি?'

'ওকে কফিটা দিয়ে আসতে।'

'আর বাড়ির কাজকর্মের কি হবে? শোন লেনা, তুই বড্ড বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছিস। কফি খেতে চাইলে জাগের নিজেই নিজের কফিটা নিয়ে যেতে পারে। এটাও কি তোকে বলে দিতে হবে?'

গাছপালা ছাঁটার কাঁচিটা নেবার জন্যে সুশান ফের যখন রান্নাঘরে এলো, লেনা তখন ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে থালাগুলো শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিচ্ছে। এক মুহূর্ত

পেছন থেকে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ওর কাঁধের সঞ্চালন ভঙ্গিটা লক্ষ্য করলো স্থশান।

'হুঁ, মনে হচ্ছে সে তোকে নিয়ে শুয়েছে। তাই না?' পেছন ফিরে, দেয়ালে গোঁজা হুক থেকে কাঁচিটা পেড়ে নেবার জন্যে হাত বাড়ালো স্থশান। নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললো, 'আর যাই হোক, সে তোর চাইতে বয়সে অনেক বড়ো। যে ফলটা আগে পাকে, সেটা আগে পচে।' তারপরেই ফেটে পড়লো ও, 'আমার এখানে ওসব শোয়াটোয়া চলবে না, বুঝেছিস!'

পাশ দিয়ে যাবার সময় মেয়েটির কচি মুখখানার দিকে এক ঝলক তাকালো ও। ঠোঁট দুটো সামান্য একটু খোলা, যেন একটা চুমুর প্রতীক্ষায় রয়েছে। তার ওপরে আহত দুটি চোখ—ঘন বাদামী আর দীপ্তিহীন।

কাঁচিটা বাগানে ঝিকমিকিয়ে ওঠে, আগুন ছড়ায় চুনকাম করা বাড়িটার দেয়ালে দেয়ালে। ভারি শরীর নিয়ে প্রথম গোলাপ ঝোপটার কাছে ঝুঁকে দাঁড়ায় স্থশান, পাতার ভেতর দিয়ে সযত্নে খুঁজে বেড়ায় ওর একখানা হাত, স্পর্শ করে একটা প্রস্ফুটিত কুঁড়িকে। পাপড়িগুলো এখনও ভেতরের দিকে নরম হয়ে গুটিয়ে রয়েছে। মাথা নাড়ে স্থশান: 'কি কাণ্ড, এমন মাটিতেও এরা ফুটতে পারে!'

বাচ্চাটার কষ্ট হচ্ছিলো, নড়ে চড়ে উঠলো ওঁর হৃৎপিণ্ডটার নিচে। গোলাপের মাঝখানে আরাম করে উবু হয়ে বসলো স্থশান। অবারিত মাথায় খোলা রোদ আর ফুল-পাতার গন্ধ ওকে তন্দ্রালু করে তুলছিলো। বাগান করার কাজটাকে ও যে কি করে এতো ভালোবেসে ফেললো তা ভাবতে ওঁর নিজেরই অবাক লাগে। নিশ্চয়ই এটা ও হেইনের কাছ থেকে পেয়েছে। কারণ নেহাত বালিকা বয়সে হেইনের সঙ্গে ও যখন উপসাগরের কাছাকাছি এই পাথুরে অঞ্চলটাতে এসেছিলো, তখন বাগানের কাজকর্ম সম্পর্কে ও কিছুই জানতো না। শহরে বড়ো পরিবারের মধ্যে মানুষ হয়েছে ও। হেইনের সঙ্গে যখন দেখা হয়, তখন ও লাল-গালের একটি লালটু মেয়ে। হেইন তখন ওর চাইতে বিশ বছরের বড়ো, কিন্তু তৃণাঞ্চলের মানুষের মতোই সৎ ও শান্ত।

বাতাসের সঙ্গে ঝাঁঝালো গন্ধটা নাকে যেতেই স্থশানের গাল দুটো লাল হয়ে উঠলো। মদ্দা ছাগলটা ঠিক ওর পেছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর দিক থেকে চোখ না সরিয়ে, চট করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ব্লাউজের সামনের দিকে ওপরের বোতামগুলো এঁটে নিলো ও। ছাগলটা প্রথমে ছোটো ছোটো কয়েকটা লাফ দিলো যেন স্থশানকে বাইরে গিয়ে ওর সঙ্গে খেলতে আমন্ত্রণ জানালো। তারপর সামনের একটা পা তালে তালে ঠুকতে লাগলো মাটিতে।

কয়েকটা লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে এক ঝটকায় দরজাটা খুলে দিলো স্থশান। কাঁচিটা ঝলসে উঠলো ওর হাতে। ছাগলটাও লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এলো ওর দিকে।

'হতচ্ছাড়া, বুঝতে পারছিস না আমি তোকে জবাই করতে যাচ্ছি ?'

ছাগলটা তবু কাছে এগিয়ে আসে। আধো খুশিয়াল আর আধো প্ররোচনার ভঙ্গিতে লালা-ঝরানো জিভটাকে ঠেলে বের করে মুখ থেকে।

'খুন করে ফেলবো কিন্তু!' স্থশান ফের ওকে সাবধান করে দেয়। ছাগলটা তবু অপমানজনক ভঙ্গিতে ওর দিকে শিঙ নাড়ে, ঝকঝকে সাদা রোমশ শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অনড় হয়ে। স্থশান জানোয়ারটাকে চেপে ধরতেই, ওর হাত থেকে কাঁচিটা খসে পড়ে। কিন্তু এতো জোরে ও শক্ত মুঠিতে ছাগলটাকে চেপে ধরে যে ছাগলটার গলা দিয়ে একটা অস্বাভাবিক উঁচু ডাক বেরিয়ে আসে। জন্তুটাকে ছেড়ে দিয়ে বাগানের পথ ধরে ছুটতে ছুটতে রান্নাঘরের দিকে ফিরে যায় ও।

ঝাঁটাটাকে পরিপাটি করে এক কোণে দাঁড় করিয়ে রাখছিলো লেনা। রান্নাঘরের টেবিলের কাছে রাখা একখানা কুর্সিতে অমন করে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে, দু হাতে মাথা রেখে বসে পড়া মহিলাটির দিকে এক মুহূর্ত করুণার দৃষ্টিতে তাকালো ও।

'খাবারদাবার দিতে শুরু করবো, মিসাস ?'

অবসন্ন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো স্থশান।

'না···ধন্যবাদ, লেনা।' বরান্দা ধরে বিমূঢ়ের মতো এগিয়ে গেলো স্থশান। তারপর বাইরের চত্বরে এসে সবুজ রঙ করা কাঠের বেঞ্চিটাতে বসে দেখলো, দূরে ঝিলমিল করছে উপসাগরের নীল জল। ওখানেই জেলেদের সঙ্গে কোথাও রয়েছে হেইন। হয়তো তাদের কোনো ঠাণ্ডা পাথুরে ঝুপড়িতে বসে মদ গিলছে। কিংবা ঘোরাফেরা করছে জেটি সংলগ্ন ঢালু জায়গাটাতে, যেখানে ওরা নৌকো মেরামতি করে। অথবা ঘুরে বেড়াচ্ছে জেটির সর্বত্র, যার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে মাছ আর টোপের গন্ধ মাখানো। ও যেন দেখতে পাচ্ছিলো, জলে-ভেজা বাদামী পা-ওলা জেলেগুলোর মাঝখানে বসে রয়েছে মানুষটা। অথবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে উপসাগরে মাছ ধরতে আসা কোনো শহুরে লোকের সঙ্গে, যারা মাছ ধরার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, সাদা স্ট্র হ্যাটের নিচে যাদের মুখগুলো লাল আর তামাটে।

স্থশান যখন দেখলো, আঁকাবাঁকা পথ ধরে হেইনের লরিটা ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে আসছে তখন বেলা ফুরিয়ে এসেছে। কোলে নিয়ে রিফু করতে থাকা

মোজাজোড়াকে গুটিয়ে নিলো ও। দরজার কাছে এসে এঞ্জিন থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলো হেইন, তারপর বেলাশেষের আলোয় সামান্য অনিশ্চিত ভঙ্গিতে এগিয়ে গেলো স্বশানের দিকে।

'তাহলে তুমি এতোক্ষণ এই বাইরের চত্বরে বসে ছিলে ?'

'হুঁ,' ভারি শরীরটাকে নিয়ে একটু নড়েচড়ে বসলো স্বশান।

'তা বেশ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ওর পাশে বসলো মানুষটা। তারপর খাকি পাতলুনটা হাঁটু অব্দি টেনে তুলে, পাইপে তামাক ভরতে শুরু করলো।

'অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখন আর বেড়াটা ঠিকঠাক করার কাজ শুরু করা যাবে না,' স্বশান বললো। 'এর মধ্যে একদিন ছাগলটা ঠিক ভেতরে ঢুকে পড়বে।'

'যাকগে, আজ তো শনিবার!'

'সেটা কিছু নয়। তুমি কথা দিয়েছিলে, ওটা ঠিক করে দেবে।'

'ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে।...আজ আমি জাল রিফু করার কাজে জেলেগুলোকে সাহায্য করছিলুম। ওরা আজ রাতেই বেরুচ্ছে। তারপর কয়েক-জন নতুন লোককে মাছ ধরার পক্ষে সবচাইতে সেরা জায়গাটা দেখিয়ে আনলুম। সত্যি বলছি, এর চাইতে তাড়াতাড়ি আসার সময় করে উঠতে পারিনি।'

লোকগুলো কিভাবে তার স্ত্রী আর আসন্ন বাচ্চাটার সম্পর্কে রঙ্গ-রসিকতা করছিলো, ভেবে খানিকটা অস্বস্তি অনুভব করলো হেইন। কারণ সে বুড়ো হচ্ছে। ওদের কেমন একটা ধারণা, লরি আর জমিজমা নিয়ে সে নাকি দেদার টাকার মালিক। অথচ সে সত্যিই তা নয়। স্ত্রীর জন্যে একটু দুঃখ হয় তার—বেচারী অন্তঃসত্ত্বা, তায় বাড়িতে অমন একা একা থাকে। কিন্তু হয়তো ওকে একা থাকতে দেবার জন্যে স্বশান তার কাছে কৃতজ্ঞ। ওদিকে একটা বাচ্চা যখন আসছেই, তখন কাজকর্মে নিজেকে বেশি করে চাপ দেবারও আর তেমন কোনো দরকার নেই। এখন বুড়ো বয়সে একজনের ওপরে ভরসা করার আশা রাখতে পারে সে।

বাঁ চোখ দিয়ে হেইন দেখতে পেলো, কুসুমিত নাশপাতি গাছগুলোর মাঝখান দিয়ে জাগের পায়ে পায়ে নিজের ঝুপড়িটার দিকে এগিয়ে চলেছে। হেইনের ইচ্ছে হলো সে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বেজন্মাটাকে জিগেস করে, আজ সারাটা দিন ও কি করছিলো। কিন্তু সারাটা দিন সে নিজেই কাজ থেকে ছুটি নিয়েছে ভেবে, আচমকা লজ্জিত হয়ে কাঠের বেঞ্চিটাতেই ফের গা এলিয়ে দিলো।

'মনে হচ্ছে লেনা আর জাগেরের মধ্যে যেন একটা মিষ্টি সম্পর্ক রয়েছে,' খানিকটা রসিকতার ভঙ্গিতে বললো হেইন।

বাদামী লোকটাকে অমন অলস ভঙ্গিতে হেঁটে বেড়াতে দেখে সুশান ততোক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, 'শোনো বাপু, বিছানায় শুয়ে ও সমস্ত মাখামাখির ব্যাপারটাকে তোমার যদি মজাদার জিনিস বলে মনে হয়, তবে আমার কাছ থেকে একটা স্পষ্ট কথা শুনে নাও—আমি কিন্তু ব্যাপারটাকে মোটেই তেমন মজার বলে মনে করি না। সারাটা দিন ওদের নিয়ে আমার যে কি জ্বালা, তা নিয়ে তোমার একটুও মাথাব্যথা নেই। গোটা দিনটা সমুদ্রের কাছে ঘোরাঘুরি করে তুমি বিনা-কাজে নিজের সময় নষ্ট করো। একবারও ভাবো না যে বাড়িতে তোমার একটা বউ রয়েছে, একটা বাচ্চা আসছে। কিন্তু সেসব কথা এখন চুলোয় যাক। ওই মাগীটার আমার মতো হাল হতে আর বেশি দেরি নেই, পুরুষমানুষের ফুর্তির দৌলতে শীগগিরি ওর পেটটা ফুলে-ফেঁপে উঠবে। তাহলে এর মধ্যে মিষ্টি-মধুর ব্যাপারস্যাপার আর কোথায়, শুনি? না, নেই—কোথাও নেই...'

'এ আবার কোন্ ধরনের কথাবার্তা?' মানুষটাও উঠে দাঁড়ায়। গোলাপি আলোর পটভূমিকায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে তার মাথার ধবধবে সাদা চুল, দাড়িগুলো কাঁপতে থাকে চিবুকে, কিন্তু ফ্যাকাশে চোখ দুটো একেবারে শূন্য—অভিব্যক্তিহীন।

'আমি সোজাসুজি কথা বলছি।'

'ওফ্, ভগবান...'

'শোনো, কিছু বোঝার মতো বুদ্ধি যদি তোমার ঘটে না থাকে তাহলে বরং মুখ বুজে থাকো...'

মানুষটার গা ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে চত্বরটা থেকে নেমে যায় সুশান। কিন্তু অ্যাকাশিয়া গাছটা অব্দি গিয়েই থমকে দাঁড়ায় ও এবং তখনই দেখতে পায়, ম্লান গোধূলিতে বাগানে ঢুকে মস্ত ছাগলটা লোভীর মতো গোলাপের নতুন চারাগুলোকে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ওই গাছগুলোতে আর কোনোদিনও গোলাপ ফুটবে না—প্রবাদই আছে, ছাগলে মুড়িয়ে খেলে সে গাছে আর কিছু হয় না।

মাথাটা পেছন দিকে ঠেলে দিলো সুশান, একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো ওর কণ্ঠ থেকে: 'জাগের!'

জাগের তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগেই সবকটা চারা শেষ। জাগেরের জামাটা নাভি অব্দি খোলা, পাতলুন গোটানো। একটা ঝোঁকাটে হাসি কেঁপে কেঁপে উঠছে তার পুরুষ্টু ঠোঁট দুটোতে।

'মিসাস?'

'তোর কি চোখ নেই, না কি? তাকিয়ে ভাখ ওদিকে!'

স্বশানের নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো জাগের, তারপর ফের প্রশ্নালু দৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে।

'হতচ্ছাড়া ছাগলটাকে ধরে নিয়ে এসে ঝুপড়িতে বন্ধ করে রাখ্। দৌড়ে যা!'

ছাগলটা চিবোনো বন্ধ করে এই প্রথম ওদের দিকে তাকালো। তারপর বেহায়ার মতো, ধীর-সতর্ক পদক্ষেপে, সোজা এগিয়ে আসতে লাগলো স্বশানের দিকে।

'বদমাশটাকে চেপে ধর, জাগের!'

এক লাফে তারের বেষ্টনীটা পেরিয়ে, ছাগলটার একটা শিঙ চেপে ধরলো জাগের—হাতের আর পাতলা জামার নিচে পিঠের মাংসপেশীগুলো ফুলে উঠলো তার। জন্তুটার দেহের দু পাশে গোটা কতক লাথি বসিয়ে, দুটো শিঙই শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলো সে। তারপর সেটাকে টানতে টানতে নিয়ে চললো পেছন দিকে, জন্তুটার খুরগুলো পুরো সময়টাই হেঁচড়ে গেলো নুড়ি-কাঁকর মেশানো মাটির বুকে। ঝুপড়ির দরজাটা সপাটে খুলে দেবার জন্যে ছুটে গিয়েছিলো স্বশান। তারপর আড়ষ্ট হয়ে অ্যাকাশিয়া গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আবছা আলোয় অপলক দৃষ্টি মেলে রেখেছিলো জোরাজুরি করতে থাকা জন্তুটার দিকে। ও লক্ষ্য করলো জাগের ছাগলটাকে ঝুপড়ির মধ্যে ঠেলে দিয়ে সজোরে দরজাটা টেনে দেবার আগে, ছাগলটা একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকালো ওর দিকে।

কি খুঁজছে তা না ভেবেই রান্নাঘরের দেরাজটা টেনে খুললো স্বশান। সুতোর গুটলি, দেশলাই এবং আরও নানান জিনিসের জটলার মধ্যে ঝিকিয়ে উঠলো মাংস-কাটা ছুরির লম্বা ফলাটা। ছুরির হাতলটাকে শক্ত করে চেপে ধরলো ওর আঙুলগুলো।

'কি খুঁজছো?'

দেরাজটা ঠেলে দিয়ে, আলমারিটার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো স্বশান। কিন্তু ততোক্ষণে ওর স্বামী যা দেখার তা দেখে নিয়েছে। ও তখন হাঁ করে দম নিচ্ছে, স্বামীর প্রশ্নের কোনো জবাব ও দিলো না।

'আমি তোমার সঙ্গে কথা কইছি!' এক পা এগিয়ে গেলো হেইন, একটা উদ্বেগের অনুভূতি যেন মুচড়ে উঠছে তার গলার মধ্যে।

'তোমার যে একটা বউ আছে, তোমার ফুর্তির দাম দিতে সে যে ফুলে-ফেঁপে ঢাকা হয়ে উঠেছে তা নিয়ে তোমার কক্ষণো কোনো চিন্তা নেই।'

একরাশ অস্বস্তি নিয়ে চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নিলো মানুষটা, তাকালো

দেয়ালের গায়ে চলন্ত ছায়াগুলোর দিকে। সে অনুভব করছিলো তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আর অসন্তোষ জমে উঠেছে ওই রমণীর বুকে, যা এখন তরঙ্গিত করে তুলেছে ওর বিশাল মাতৃস্তন দুটিকে এবং এখন তা বন্যার মতো ছুটে আসছে তাকে ভাসিয়ে নিতে।

স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়েছিলো সুশান। কিন্তু মানুষটাকে লক্ষ্য করতে করতে ফের ও ভাবছিলো ওর বাচ্চাটার কথা—যার অস্তিত্ব ওদের দুজনকে একাত্ম করে তোলার কথা, ওরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে যার সৃষ্টিই হতো না কোনোদিন। কিন্তু এখন বাচ্চাটা শুধু ওর, ওদের নয়—ও যেমনটি ভেবেছিলো তেমন নয়, অন্য রকম। ওই মানুষটা সব সময়েই বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর সব কিছু লক্ষ্য করছে একটা উত্তাপহীন শিলাময় উচ্চতায় দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ ঝুপড়ি থেকে মদ্দা ছাগলটার আচমকা ডাক শুনতে পেলো সুশান। ও, বুঝতে পারলো, ছাগলটা দরজার একেবারে কাছটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং ওর মনে হলো ছাগলটার চোখ দুটো এখনও একটানা স্থির হয়ে রয়েছে ওর দিকে—ওর কাছে জবাবদিহি চাইছে সে। তারপরেই সুশান আবিষ্কার করলো, ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার ফ্যাকাশে চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও।

'ওখানে কি খুঁজছিলে তুমি?' মানুষটার কণ্ঠস্বর টলমলে।

এক ঝটকায় সুশানকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দেরাজ খুললো মানুষটা। টেবিলের গায়ে ছিটকে পড়লো সুশান, দু হাতে শরীরের ভর রেখে নিজেকে সামলে নিলো ও, তারপর দাঁড়িয়ে রইলো বুকের ওপরে মাথা নামিয়ে। দেরাজ থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে ওর পেছনে এসে দাঁড়ালো মানুষটা, ছুরির ফলাটা উঁচু হয়ে জেগে রইলো তার হাতের মুঠোয়। তারপরেই হাত থেকে খসে পড়লো ছুরিটা।

'ছুরিটা নিয়ে তুমি কি করতে যাচ্ছিলে?'

'ধার দেবো, তাই।'

অন্ধকার বারান্দাটায় পেছিয়ে গিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো মানুষটা। তারপর খানিকটা পুরোনো দিনের মতো তৎপর ভঙ্গিতে উলটো দিকে ঘুরে, দ্রুত পায়ে হোঁচট খেতে খেতে একটা ছায়ামূর্তি হয়ে এগিয়ে গেলো সামনের চত্বরটার দিকে। দূরের অন্ধকারে বিস্তৃত উপসাগর—জেলেদের কুটিরগুলোতে পুরুষমানুষরা এখন চুল্লির সামনে নিজেদের রুটি আর সুরুয়া নিয়ে বসেছে। ওরা যখন তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করছিলো, বলছিলো: 'কবে হচ্ছে? নির্ঘাত ছেলে হবে রে, বুড়ো'—তখন কি আশ্চর্য উষ্ণতা অনুভব করেছিলো সে! আর এখন অনুভব

করছে, শুধু ওই ছুরির ফলাটা—যেন ইতিমধ্যেই রক্তক্ষরণে মরে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সে।

রাত্রে ওরা যখন খেতে বসলো, সুশান ওর একখানা হাত টেবিলে রেখে, খোলা জানলা দিয়ে দু চোখের দৃষ্টি মেলে রাখলো সেই ঝুপড়িটার দিকে। এক টুকরো শক্ত রুটি চিবোবার জন্যে মানুষটা জোরে জোরে চোয়াল নাড়ছিলো। সুশান উঠে দাঁড়াতেই সে নিজের কুর্সিতে একটু নড়েচড়ে উঠলো। কিন্তু সুশান কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে রান্নাঘরের দরজার দিকে বেরিয়ে গেলো। জাগেরের দরজায় টোকা দেবার আগে এক মুহূর্ত একটু অপেক্ষা করলো ও। খাটের মচমচ শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। সপাটে দরজাটা খুলে দিলো সুশান। কনুইতে ভর রেখে নিজের শরীরটাকে উঁচু করে তুলে ধরলো জাগের, সুশানের চোখে উষ্ণ আলোয় ঝিলমিলিয়ে উঠলো তার চোখ দুটো। মেয়েটা ভয় পেয়ে একটা মৃদু আর্তনাদ তুলে জাগেরের বুকে মুখ গুঁজলো।

'কি হচ্ছে এখানে ?'

'আজ্ঞে ?'

লেনা সহসা উঠে বসে বিছানার চাদর দিয়ে নিজের শরীরটাকে জড়িয়ে নিলো।

'আপনি আমাকে ছাড়িয়ে দিতে পারেন, মিসাস—' লেনার মাথাটা পেছন দিকে হেলানো, ছোট্ট একটা কঠিন রেখা কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর ঠোঁটের চতুর্দিকে।

'আমি ওকে তাড়িয়ে দিলে, তুই কি করবি—জাগের ? স্রেফ অন্য একটাকে জুটিয়ে নিবি ?'

'আমি ? না, মিসাস। আমিও ওর সঙ্গে চলে যাবো।'

'তারপর ? এক, দুই, তিন…মজা শেষ !…'

আজ্ঞে ?'

'ওঠ্। উঠে, ছাগলটাকে বের করে নিয়ে আয়।'

'আনছি, মিসাস।'

'তারপর ওটাকে গাছটার সঙ্গে বেঁধে রাখ।'

'আচ্ছা।'

রাতের বাতাসে হিমের ছোঁয়া, আধখানা ক্ষীণ চাঁদ আলো ছড়াচ্ছে নাশপাতি গাছগুলোর সাদা ফুলে ফুলে। শোবার ঘরে ঢুকে সুশান দেখলো, মানুষটা জেগে জেগে শুয়ে রয়েছে। আবছা আলো ধূসর হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বহুব্যবহৃত আসবাব-পত্রগুলোতে। পোশাক ছেড়ে খাটে উঠলো সুশান। মানুষটা পাশ ফিরে বিছানার

অন্য প্রান্তে গিয়ে শুয়ে রইলো। সে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগে স্থশান দেখলো, তার চোখের দীপ্তি ওর দিকেই ফেরানো।

গাছপালার ভেতর দিয়ে একটা দমকা বাতাস ছুটে আসে। বাতাসের শব্দে কিছু শুনতে না পেলেও স্থশান জানে, মদ্দা ছাগলটা অ্যাকাশিয়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বাঁধা অবস্থায়। নিজের শরীরটাকে ও কনুইয়ের ভরে সাবধানে উঁচু করে তুলতেই, মানুষটার অবারিত বুক থেকে কম্বলটা সরে যায়। দাড়িগুলো খোঁচা খোঁচা হয়ে মাথা তুলে থাকে উদ্ধত চিবুক থেকে। সামনের দিকে ঝুঁকে মানুষটার শরীর থেকে কম্বলটাকে টেনে পুরোপুরি সরিয়ে দেয় স্থশান। ফ্যাকাশে আলোয় সম্পূর্ণ অনাবৃত, ঠাণ্ডা, ফর্সা মতো একটা কঠিন শরীর। মানুষটার পেটের নিচের দিকে সঙ্কীর্ণ অংশটাতে আলতো করে একখানা হাত রাখে স্থশান।

'না!' উন্মাদ ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে, বুকের কাছটা চেপে ধরে হেইন। যেন ওখানকার একটা ক্ষতস্থান দিয়ে তার রক্ত ঝরছে। কিন্তু ঘুমের মধ্যেই চিৎকার করে উঠেছিলো সে, তাই শান্ত হয়ে যায় আবার, ঠোঁটের কাছে ফুটে ওঠা করুণ রেখাটা মিলিয়ে যায় একটু একটু করে। সযত্নে মানুষটার গায়ে চাপা দিয়ে খাট থেকে নেমে পড়ে স্থশান।

পাহাড় থেকে ছুটে আসা দমকা বাতাস কিমোনোর পকেটে রাখা ছুরির ঠাণ্ডা ফলাটাকে স্থশানের পেটের সঙ্গে চেপে ধরে।

'এবারে তুই মজাটা বুঝবি, হতভাগা!'

মদ্দা ছাগলটা সচকিত হয়ে ওঠে, যেন বুঝতে পারে কি ঘটতে চলেছে। ছুরিটা পকেট থেকে বের করে জন্তুটার একটা শিঙ চেপে ধরে স্থশান। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা অলস শরীর ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে গাছটার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়।

'কি করছেন, মিসাস?' বুড়ো আঙুল আর মধ্যমার টুসকিতে জ্বলন্ত সিগারেটটাকে দূরে ছুঁড়ে দেয় জাগের। একটা লাল স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে বাগানের দরজার ওধারে গিয়ে পড়ে সিগারেটটা। 'আমি বলতে এসেছিলাম যে আমি লেনাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি।' দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে জাগের বলতে থাকে, 'আমার ধারণা ফুল ফোটার একটা মরশুম আছে, ঝরে পড়ার আর একটা। তবে এখন আমি লেনাকে নিয়েই যাত্রা শুরু করছি।'

একেবারে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো জাগের। এবার চোখ নামিয়ে মদ্দা ছাগলটার দিকে তাকালো সে, তারপর সত্যিকারের দুঃখিত স্বরে বললো, 'কি লজ্জার কথা, ওটাকে দেখতে অবিকল ওই বুড়ো মানুষটার মতো।'

সুশানের শিথিল হয়ে ওঠা মুঠিতে ঝাঁকুনি লাগালো বলিষ্ঠ শিশুটা। হাতের স্পর্শে ছাগলটার রোমগুলোকে হেইনের যৌবনের চুলগুলোর মতো রেশমী আর ঢেউ-দোলানো বলে মনে হলো সুশানের। যেন একটা পুরনো ছবিতে মানুষটাকে স্পষ্ট দেখতে পেলো ও—ভুলে যাওয়া কোনো এক সকালে গোলাপ বাগিচার নরম আলোয় কোদালে ভর রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে…মুখে রহস্যময় অমায়িক হাসি… চোখের দৃষ্টি অকপট, শান্ত, আর শাশ্বত।

ছাগলটা ওর মুঠি থেকে ছাড়া পাবার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। দড়িটা কেটে দিলো সুশান।

আধো-অন্ধকারে সাদা শরীর নিয়ে মদ্দা ছাগলটা পাহাড়ের দিকে চলে যাবার অনেকক্ষণ পরেও সুশান দাঁড়িয়ে রইলো ওখানে। তারপর বাচ্চাটা ওর পেটের মধ্যে নড়াচড়া শুরু করার পর, বাগানের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে হাঁটতে লাগলো আস্তে আস্তে। ওর পেছনের অন্ধকারে পাহাড়ের নিরাপত্তা, সামনে উপসাগর—ও এখানে আসার প্রথম দিনটিতে যেমন ছিলো, ঠিক তেমনি। বাতাস থেমে গেছে, নৈঃশব্দ্যের গান ভেসে আসছে যবনিকা উঠতে থাকা রাত্রির অন্তঃপুর থেকে। চোখ তুলে সাদা বাড়িটার দিকে তাকালো সুশান, যেখানে ওর স্বামী ঘুমিয়ে রয়েছে। তারপর ঝুঁকে দাঁড়ালো গোলাপের ঝোপগুলোকে স্পর্শ করবে বলে।

আগামী গ্রীষ্মে এগুলোতে আর গোলাপ ফুটবে না।